স্বাস্থ্য, শরীর ও নন্দনচেতনা

স্বাস্থ্য, শরীর ও নন্দনচেতনা

SCERT, WB

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

স্বাস্থ্য, শরীর ও নন্দনচেতনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

প্রকাশক :
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ
পশ্চিমবঙ্গ

গ্রন্থস্বত্ব :
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

ISBN : 978-81-939670-0-3

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১৮
পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০২৩

সম্পাদনা :
সংগীত
শম্পা দাঁ (দে)
অ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর
ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন ফর উইমেন, হেস্টিংস হাউস
নাটক
ড. সৌমিত্র বসু
প্রাক্তন অধ্যাপক, নাটক বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
চারুকলা– অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায়, শিল্প শিক্ষক, কৃষ্ণনগর গভ: পি.টি.টি.আই.
স্বাস্থ্য শিক্ষা
ড: উমা দত্ত
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর
গর্ভমেন্ট ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজ ফর উইমেন, হুগলী

সঞ্চালক :
ড. কে. এ. সাদাত ও নীলাঞ্জন বালা

প্রচ্ছদ : তমাল মোহান্ত

মুদ্রক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

মুখবন্ধ

পুরানো আমলের মানুষজন গান বাজনা, নাটক করা, ছবি আঁকা কিংবা খেলাধুলোর সঙ্গে লেখাপড়ার যে কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে তা ভাবতেই পারতেন না। আধুনিক শিক্ষা ভাবনায় কিন্তু এদের জন্যে মর্যাদার জায়গা তৈরি হয়েছে। সংগীত, নাট্য বা চিত্রকলা এখন যেমন আলাদা বিদ্যা হিসেবে স্বীকৃত, পাশাপাশি আবার যে কোনো বিষয় পড়াতে গেলে এদের সাহায্য নিয়ে সে বিষয়গুলো খুব সহজেই ছাত্রদের মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া সম্ভব তাও প্রমাণ হয়ে গেছে। আর শরীরের সঙ্গে মন, মনের গ্রহণ ক্ষমতার সম্পর্ক যে কত গভীর তা তো বলবার দরকার পড়ে না। ফলে, সহ পাঠক্রমিক থেকে এইসব বিদ্যাকে এখন সরাসরি পাঠক্রমের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে।

এই বইয়ে D.EL. Ed-এর পাঠ্যসূচী অনুসারে সংগীত, নাটক, চিত্রকলা এবং শারীরবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হল। সংগীত বিদ্যা বিষয়ক অংশটি লিখেছেন ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন ফর উইমেন, হেস্টিংস হাউস মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শম্পা দাঁ (দে), নাটকের অংশটি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. সৌমিত্র বসু, চিত্রকলার দায়িত্বে ছিলেন নাটাগড় স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সমিতি বিদ্যালয়ের সহশিক্ষক তমাল মোহান্ত এবং শারীরবিদ্যা বিষয়ে আলোচনা করেছেন গভর্ণমেন্ট ফিজিক্যাল এডুকেশন কলেজ ফর উইমেন হুগলি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড. উমা দত্ত। আশাকরি এই বইটি ছাত্রমহলে সমাদর পাবে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এবং জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থার যৌথ গবেষণাধর্মী কাজের ফসল এই পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে নতুন ডি.এল.এড পাঠক্রমে উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের অভাববোধ থেকে এই ডিরেক্টরেট সরকারী নির্দেশনার 712-Edn(Cs) / 8t-17 / 79 তারিখ 21.05.1980 সেকশন (iii), (iv), (viii) ও (x) অনুসারে " Development of Teaching Clarity " নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছিল।

প্রকল্পের শুরুতেই সামগ্রিক পাঠক্রমকে তিনটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলিতে কর্মশালা শুরু করা হয়েছিল। যেমন– (১) ব্যবহারিক বিষয়সমূহ (P-1, P-2, P-3, P-4) ও তার আদান-প্রদান কার্যবিধি–এই নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ডায়েট, দক্ষিণ দিনাজপুরে ১০ই আগষ্ট, ২০১৫ থেকে ১৪ই আগষ্ট,২০১৫। (২) পাঠক্রমের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুসমূহ (Core Curriculum CC-01, CC-02, CC-03, CC-04, CC-05) নিয়ে একইভাবে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ডায়েট, উত্তর চব্বিশ পরগনাতে ২৪ শে আগষ্ট ২০১৫ থেকে ২৮ শে আগষ্ট ২০১৫ পর্যন্ত। (৩) এরপর বিষয়জ্ঞান ও পাঠদান পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়গুলি CPS-1, CPS-2, CPS-3, CPS-4) নিয়ে কর্মশালা হয় ডায়েট, হাওড়াতে ৩১শে আগষ্ট, ২০১৫ থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত।

এই প্রতিটি কর্মশালায় উপস্থিত শিক্ষক প্রশিক্ষকদের মধ্যে থেকে যে কথাগুলি জোরালো ভাবে উঠে এসেছিল, তা হল– "ডি.এল.এডের জন্য সঠিক শিখন-শিক্ষণ সামগ্রী প্রয়োজন"।

এই প্রয়োজনকে মাথায় রেখেই কোনোরকম সময় নষ্ট না করে ডায়েট, বর্ধমানে ২০১৬ সালে জানুয়ারীর ২ তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত শুরু হয়েছিল কাজ, যার নাম ছিল– " Instructional Material Design (Development of Teaching Clarity) for Teacher Preparation "–এই কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ১১ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ডায়েট হুগলীতে। এরপর কাজগুলিকে নিয়ে পর্যালোচনা, সংযোজন, বিয়োজনের কাজ চলে দু-দফায়– ১০ই মার্চ থেকে ১২ই মার্চ পর্যন্ত ডায়েট, পুরুলিয়াতে ও ২১শে এপ্রিল থেকে ২৭শে এপ্রিল ডায়েট, দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে।

এই দীর্ঘ প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে যে ফসল উৎপাদিত হল, তা আদৌ কতটা কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে শিক্ষক- শিক্ষণে তা যাচাই করে দেখা ভীষণ জরুরী ছিল। এই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে এই প্রকল্পের তথা রাজ্য শিক্ষাগবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ ডিরেক্টরের তত্ত্বাবধানে পাইলট টেস্টিং এর কার্যকরী কৃৎকৌশল নির্মানের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ডায়েট, হাওড়াতে ২রা মে ২০১৬ থেকে ৪ঠা মে ২০১৬ তারিখে। এরপর পাইলট টেস্টিং এর অংশ হিসেবে একমাস ধরে রাজ্যে চারটি ডায়েটে– কোচবিহার, পুরুলিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও হাওড়ায় রাজ্যের প্রায় সকল ডায়েটে কর্মরত শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে এই শিখন সামগ্রী শিক্ষার্থীদের কাছে প্রয়োগ করা হয়। এই পাইলট টেস্টিং সার্থকতার সঙ্গে তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ হয় 'State Monitoring Team' দ্বারা।

সবশেষে পরীক্ষিত শিখন সামগ্রী বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীর কাছে চূড়ান্ত পর্যালোচনা ও সম্পাদনার জন্য প্রদান করা হয়। এই পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হয় ডায়েট, হুগলীর তত্ত্বাবধানে ৬ই ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে ১০ই ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশনাকালে প্রকল্পের পক্ষ থেকে যাদের ঋণ স্বীকার করে নিতে হয়, তারা হলেন– শ্রী মিলন কুমার সাহা, অধ্যক্ষ, ডায়েট, দক্ষিণ দিনাজপুর, ডঃ স্বপ্না ঘোষ, অধ্যক্ষা, ডায়েট, উত্তর ২৪ পরগণা, শ্রী তপন কুমার মল্লিক, অধ্যক্ষ, ডায়েট, বর্ধমান, ডঃ সন্ধ্যাদাস বসু, অধ্যক্ষা, ডায়েট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং শ্রী পরিতোষ প্রামাণিক, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ডায়েট, পুরুলিয়া। এছাড়া এই পুস্তকটি রচনায় অবদান রেখেছেন কৌশিকী ভট্টাচার্য এবং নাসরিন।

বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়– অধ্যক্ষ, ডায়েট হুগলি ডঃ কে.এ.সাদাত ও অধ্যক্ষ, ডায়েট, হাওড়া, ডঃ বিশ্বরঞ্জন মান্নাকে– যারা শিখন সামগ্রী প্রনয়ণ ও পাইলট ট্রেনিং এর মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়কে সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে এই প্রকল্পকে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে দিয়েছেন।

সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রী নীলাঞ্জন বালা, রিসার্চ ফেলো, এস.সি.ই.আর.টি-কে –এই প্রকল্প শুরু থেকেই যার পরিকল্পনা, প্রচেষ্টা ও ভাবনায় একটি পর্যায় থেকে পরবর্তী পর্যায়ে বিকশিত হয়ে আজ সার্থকতার পথে অগ্রসর হতে পেরেছে।

ড. ছন্দা রায়

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

সূচিপত্র

বিভাগ - ক :	**সংগীত**	**১-৪১**
অধ্যায় ১	ভারতীয় সংগীত, তার ধারাবাহিকতা এবং বাদ্যযন্ত্র	১-১০
অধ্যায় ২	অনুশীলন থেকে উপস্থাপন	১১-৩৬
অধ্যায় ৩	সংগীতের মাধ্যমে শিক্ষা ও শিখন (প্রকল্প নির্মাণ)	৩৭-৪১
বিভাগ - খ :	**নাটক ও চারুকলা**	৪২-১২১
অধ্যায় ৪	নাটক (নাটকের ধারনা, মঞ্চের প্রকারভেদ, লোকনাটক ও মঞ্চ, একক এবং দলগত অভিনয়, নৃত্যনাট্য এবং মুকাভিনয়)	৪২-৫০
অধ্যায় ৫	চারুকলা	৫১-১০৯
অধ্যায় ৬	কৃৎকলা শিল্পের উপস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষণ এবং শিক্ষা গ্রহণ	১১০-১২০
বিভাগ - গ :	**স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শরীরচর্চা**	১২১-১৫১
অধ্যায় ৭	স্বাস্থ্য শিক্ষা	১২১-১৩৩
অধ্যায় ৮	প্রাথমিক প্রতিবিধান	১৩৪-১৪৬
অধ্যায় ৯	অ্যাথলিটিক্স্, যোগাসন, জিমনাস্টিকস্ এবং আনন্দদায়ক ও ছন্দমূলক খেলা	১৪৭-১৫১

অধ্যায়

১

ভারতীয় সংগীত, তার ধারাবাহিকতা এবং বাদ্যযন্ত্র

ভূমিকা - শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই এই শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। আর সেই প্রয়োজনের তাগিদকে সামনে রেখে শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় থেকে একজন শিশুকে সার্বিক বিকাশ সম্পন্ন করে তুলতে আমরা সচেতন নাগরিক হিসাবে বদ্ধপরিকর। সেই দৃষ্টিভঙ্গীর সুষ্ঠু প্রয়োগ আমরা সংগীত শিক্ষার মাধ্যমে খুঁজে পাই।

এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ভারতীয় সংগীতের প্রাথমিক ধারণা, স্বরলিপির ধারণা এবং বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণাসহ তবলা ও হারমোনিয়াম বাদ্যের অবয়ব।

'সংগীত' বিষয়টির মধ্যে গীত, বাদ্য ও নৃত্য— তিনটি কলা অন্তর্নিহিত আছে। একজন শিশুকে সংগীত শিক্ষা দেওয়ার আগে তাকে একজন পরিপূর্ণ নাগরিক হিসাবে ভারতীয় ঐতিহ্য, রীতিনীতি, জীবনযাত্রা— সবকিছু সম্পর্কেই প্রাথমিক ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। 'সংগীত' আমাদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন স্তরে নিবিড়ভাবে জড়িত। সুতরাং শুধুমাত্র ভারতীয় সংগীতের প্রাথমিক ধারণাই নয়, এই অধ্যায়-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে গানের সুরকে কীভাবে স্বর দিয়ে স্থাপন করে স্বরলিপি তৈরি করা হয় এবং গানের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ভারতীয় যন্ত্রের শ্রেণিবিভাগসহ তালক্রিয়ার প্রয়োগ পদ্ধতি, সংজ্ঞা ও কাঠামোগত ধারণা।

এই বিষয়গুলি অবশ্যই শিক্ষকের মনোবল বৃদ্ধিতে সহযোগী হবে এবং শিক্ষার্থীরাও বিষয়গুলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করবে।

উদ্দেশ্য - এই এককের (Unit) উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১.১ সংগীতের সংজ্ঞা, উৎস ও ক্রমবিকাশ এবং ভারতীয় সংগীতের ধারা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।

১.২ স্বরলিপি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ।

১.৩ বাদ্যযন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ ও প্রাথমিক ধারণা লাভ।

১.৪ হারমোনিয়াম ও তবলার কাঠামোগত ধারণা লাভ।

আলোচ্য বিষয় -

- ভারতীয় সংগীতের প্রাথমিক ধারণা (Preliminary Ideas of Indian Music)
- স্বরলিপির প্রাথমিক ধারণা (Preliminary Ideas of Notation)
- বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান (Preliminary knowledge of Instrument)
- তবলা ও হারমোনিয়াম বাদ্যযন্ত্রের গঠন পরিচিতি (Structure of Tabla, Harmonium)

১.১ সংগীতের সংজ্ঞা, উৎস ও ভারতীয় সংগীতের ক্রমবিবর্তন

- **'সংগীত' কি?**

সংগীত শব্দটির শব্দগত বিশ্লেষণ 'সম্' + গীত অর্থাৎ 'সম' অর্থে সম্পূর্ণ তাই সাধারণ অর্থে সংগীত বলতে বিজ্ঞানসম্মত সম্যক গীতকেই বোঝায়। কিন্তু সংগীতের পরিভাষাগত বিশ্লেষণে বলা যায় যে গীত, বাদ্য এবং নৃত্য— এই তিনটি কলার একত্র সমাবেশকেই বলা হয় 'সংগীত'। আরও সংক্ষেপে স্বর ও তালযুক্ত মনোরঞ্জনমূলক রচনাকে বলা হয় 'সংগীত'।

- **সংগীতের উৎস ও ক্রমবিবর্তন**

মানুষ জন্মের পর থেকেই তার মনের অনুভূতি প্রকাশ করে থাকে হাসি, কান্না প্রভৃতি আচরণ প্রকাশের মাধ্যমে।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে আমরা জানতে পারি যে মানুষ জন্মের অনেক পরে এসে যখন আগুন জ্বালাতে

শিখল তখন থেকে শুরু হল আদিম সভ্যতার। মানুষের আদিম জীবন অবস্থার সময় থেকেই মনের ভাব প্রকাশ করার মাধ্যম হিসেবে একদিকে যেমন ছিল হাসি, কান্না, ক্রোধ প্রভৃতি; তেমনি অন্যদিকে ছিল নাচ ও গান। তবে এখানে মনে রাখা দরকার যে, তখন কোনো 'সংগীত' শব্দের ব্যবহার ছিল না। 'সংগীত' শব্দটি অনেক অনেক যুগ পরে এসেছে। সে যাই হোক, আদিম সমাজব্যবস্থায় মানুষেরা কাঠের গুঁড়িতে আঘাত করে তাল সৃষ্টি করত এবং ঐ তালের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিজেদের মধ্যে গান, নাচ করত। এরও অনেক পরে আদিম মানুষদের এই ধরনের উৎসব-অনুষ্ঠানগুলি বৈদিক যুগের 'যাগযজ্ঞ' অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। তারও অনেক পরে এসে সৃষ্টি হয়েছে **'সামগান'**।

তাই বিভিন্ন শাস্ত্রবিশেষজ্ঞদের মতে, মানুষের প্রথম গান ছিল 'সামগান'। যদিও সামগানের গায়নশৈলীর কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। তথাপি, ঐ সময়ে যে তিন স্বরের ব্যবহার ছিল সেটা জানা যায়। এর পরে অর্থাৎ বৈদিক যুগের শেষের দিকে পাওয়া যায় **'গান্ধর্ব সংগীত'**, যা ছিল গান্ধর্বীয় জাতির দ্বারা সৃষ্ট। এই গান্ধর্বীয় গুণীদের অবদানের সঙ্গে দেশি বা লোকজ ভাবধারার সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছে **'প্রবন্ধ গান'**।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, গান্ধর্ব সংগীত, প্রবন্ধ সংগীত-এসব চর্চার পাশাপাশি **লোকজ দেশি সংগীতের** প্রচলন ছিল। যা আজও বর্তমান।

বর্তমান কালের শাস্ত্রীয় সংগীতের মতো 'গান্ধর্ব' সংগীতও ছিল অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত এবং কঠোর অধ্যবসায় সাপেক্ষ।

তবে আমরা বর্তমান যুগে যেসব ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা দেখতে পাই, সেগুলি সবই গান্ধর্বীয় ভাবধারাকে আশ্রয় করে সৃষ্ট 'প্রবন্ধ' গানেরই পর্যায়ক্রমিক রূপ।

কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, ঐ সময় কালের সংগীতের কোনো গায়ন রূপগত ধারণা পাওয়া যায় না। যা কিছু প্রচলিত আছে সেগুলি প্রবন্ধ গানের পরবর্তী পর্যায়।

- **ভারতীয় সংগীতের ধারা ঃ**

ভারতীয় সংগীতের ধারা আলোচনা করতে গেলে ভারতবর্ষের সাঙ্গীতিক বিবর্তন সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা একান্ত আবশ্যক। একটি সরল ছকের মাধ্যমে এটি বোঝাবার চেষ্টা করা হল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ছকটির সরলীকরণ করা হল এই পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয় অংশটুকু ধরে।

- আদিম গান
  - ধর্মীয় রূপ
    - বৈদিক গান
      - সামগান
  - সামাজিক রূপ
    - লৌকিক গান
      - দেশী লৌকিক
        - প্রবন্ধ গান
      - পল্লীগান (লোকগান/লোকসংগীত)

প্রবন্ধগান (Composed Song)-এর পথ বেয়ে এই দেশী লৌকিক গান থেকেই পরবর্তীকালে মধ্যযুগীয় অভিজাত গীত-এর উদ্ভব হয় বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। যা থেকে পরবর্তীকালে সংগীতের দুটি ধারার সৃষ্টি হয়—

(ক) **হিন্দু প্রভাবিত অভিজাত গীত** এবং

(খ) **মুসলিম প্রভাবিত অভিজাত** গীত।

হিন্দু প্রভাবিত অভিজাত গীত এর পরবর্তীকালে দুটি ধারা—**হিন্দুস্থানী সংগীত ও কর্ণাটকী সংগীত** এর উদ্ভব হয়।

(ক) হিন্দুস্থানী সংগীতের বিভিন্ন ধারার মধ্যে খেয়াল, ধ্রুপদ, ধামার উল্লেখ্য। এগুলির থেকে আবার কিঞ্চিৎ লঘু পর্যায়ের সাংগীতিক ধারার উদ্ভব হয় যেমন—ঠুমরী, টপ্পা, ভজন, গজল ইত্যাদি।

শাস্ত্রীয় সংগীতের বিভিন্ন ধারা ঃ

হিন্দুস্থানী সংগীত

খেয়াল—'খেয়াল' এক ধরনের বিশেষ গীতশৈলীর গান। 'খেয়াল' শব্দটি একটি পারসিক্ শব্দ। এটির অর্থ 'কল্পনা'। এই গায়ন শৈলীর দ্বারা গায়ক নিজস্ব কল্পনাশক্তির মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় স্বর প্রয়োগ দ্বারা শ্রোতার মনোরঞ্জন করে থাকে। এই প্রকার গীতশৈলীর প্রবর্তক ছিলেন আমীর খসরু। এই গান বিলম্বিত ও দ্রুত লয় সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই গানে তবলা সংগত করা হয়। এই শৈলীর গানে ব্যবহৃত তালগুলির মধ্যে আছে – ত্রিতাল, একতাল, ঝাঁপতাল, রূপক, ঝুমরা প্রভৃতি।

ধ্রুপদ—'ধ্রুবপদ' থেকে এই 'ধ্রুপদ' শব্দের আবির্ভাব। এই শৈলীর গান সালগ-সূড় শ্রেণির প্রবন্ধ গানেরই বিবর্তিত রূপ বলেই ইতিহাস থেকে জানা যায়। এই ধরনের গান চারটি তুকে বা ভাগে বিভক্ত থাকে। যেমন স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। এর প্রবর্তক হিসাবে রাজা মান সিংহ তোমরের নাম অগ্রগণ্য। এই গান অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির এবং কঠোর নিয়মের বাঁধনে আবদ্ধ। এই গানে পাখোয়াজ সংগত করা হয়ে থাকে। এই গানে ব্যবহৃত তালগুলির মধ্যে আছে চৌতাল, ঝাঁপতাল, সুরফাঁক তাল প্রভৃতি।

ধামার—'ধামার' গান ধামার তালে গীত এক ধরনের শৈলীর গান। এই গান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক কীর্তির রচনা। এই গানে 'হোরী' শব্দের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। তাই অনেক সময় এই গানকে 'হোরী' গানও বলা হয়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ধামার গীতশৈলীর গান অবশ্যই 'ধামার' তালে আবদ্ধ হবে।

ধারা ঃ

ঠুমরি — 'ঠুমরি' শব্দটি 'ঠমক্' শব্দ থেকে উদ্ভূত। এটি একটি ভাবপ্রধান গান। রাগের শুদ্ধতার তুলনায় ভাবের প্রাধান্য বেশি। ঠুমরি গান বাইজি নাচের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই গানে আদ্ধা, যৎ, ত্রিতাল প্রভৃতি তালের ব্যবহার হয়ে থাকে।

টপ্পা — 'টপ্পা' একটি হিন্দি শব্দ। এটি মূলত পাঞ্জাবের লোকগান। পাঞ্জাবের উষ্ট্রচালকদের ঘর ছেড়ে বেশ কিছুদিনের জন্য বাইরে যাওয়ার সময়ে নিজেদের মনের দুঃখ এই গানে প্রকাশ পায়। পাঞ্জাবি টপ্পার স্রষ্টা হিসাবে শোরী মিঞার নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর আসল নাম গোলাম নবী। পরবর্তীকালে পাঞ্জাবি টপ্পার অনুকরণে বিবর্তিত রূপ হিসাবে আমরা বাংলা টপ্পা গান পেয়েছি। এই গানের স্রষ্টা রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)।

ভজন ও গজল — 'ভজন' ঈশ্বরের ভজনামূলক এক ধরনের বিশিষ্ট রীতির গান। এই গানে ভগবানের গুণগান করা হয়ে থাকে। সাধারণত, হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের দ্বারা এই ধরনের গান রচিত হয়ে থাকে।

'গজল' মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের দ্বারা সৃষ্ট আল্লার গুণগান সম্পন্ন এক ধরনের রচনাবলী। এই গানে আল্লার প্রশংসাসূচক কথা থাকে।

পরবর্তীকালে সংগীতের ধারা আরও লঘু হয়ে এই ধারার সৃষ্টি হয়। এই ধারায় সংযোজিত হয় রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদের গান ইত্যাদি।

অন্যদিকে সমান্তরালভাবে দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটকী সংগীতের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে। কর্ণাটকী সংগীত মূলতঃ মন্দির আশ্রিত ছিল, বর্তমানেও এটি অনেকটাই মন্দিরকেন্দ্রিক হলেও, সমাজের বিভিন্ন স্তরেও এই সাংগীতিক শৈলী আজ সমানভাবে অনুশীলিত ও সমাদৃত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উত্তরভারতীয় হিন্দুস্থানী সংগীতে ১০টি ঠাট্ এবং কর্ণাটকী দক্ষিণভারতীয় কর্ণাটকী সংগীতে ২০টি **মেল**-এর অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

সুতরাং উপরিলিখিত আলোচনা থেকে সহজেই অনুমেয় যে **দেশী লৌকিক গান থেকে লোকসংগীতের** যে উন্মেষ, তা বহু প্রাচীন, তেমনি তার একটি নিজস্বতা, মৌলিকতা বর্তমান। তাছাড়াও এই ধারার একটি বিশেষ প্রবহমানতা বর্তমান, যার সাথে মাটি (অঞ্চল), মানুষ, তার কর্মজীবন, জীবনচর্যার প্রত্যক্ষ সহযোগ বর্তমান।

ভারতীয় মাটিতে লোকসংগীতের বহুপ্রকার বর্তমান—কারণ ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে লোকসংগীতের বিচিত্রতা বিশেষ মাত্রা পেয়ে থাকে।

যেমন, বাংলাদেশে আমরা নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকার লোকসংগীতের সন্ধান পাই। যেমন —ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, ভাদু, টুসু, ঝুমুর, গম্ভীরা, জারি ও সারি গান ইত্যাদি।

ভাওয়াইয়া—এই গান পশ্চিবঙ্গের দিনাজপুর অঞ্চল এবং বর্তমান বাংলা দেশের কিছু কিছু অঞ্চলে প্রচলিত বিশেষ এক ধরনের গান। এই গান গরুর গাড়ি বা মহিষ ও হাতির পিঠে চড়ে মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহের কাজে যাওয়ার সময় তাঁদের মনের নানা সুখ-দুঃখের অনুভূতি প্রকাশ করে গেয়ে থাকে। এই গানে দোতারা বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়।

যেমন ঃ (১) 'তোমরা গ্যাইলে কি আসিবেন
মোর মাহুত বন্ধু রে ....'

(২) ''ওকি গড়িয়াল ভাই
কত রব আমি পান্থের পানে চাইয়া রে.........'' প্রভৃতি

ভাটিয়ালি—পূর্ব বাংলায় প্রচলিত এক বিশেষ ধরনের গান 'ভাটিয়ালি'। এই গান ভাটির টানে মাঝি নৌকা বাইবার সময় গেয়ে থাকে। এই গানের মধ্যে নৌকা, মাঝি, ভাটি প্রভৃতি শব্দ যুক্ত থাকে। এই গানেও দুঃখ-বিরহ প্রভৃতি অনুভূতির প্রকাশ থাকে। গানে একতারা বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়।

যেমন — (ক) ''ও আমার দরদী আগে জানলে
আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না।''

(খ) ''কলকল ছলছল, নদী করে টলমল
ঢেউ ভাঙে ঝড় তুফান রে
নাও বাইও না মাঝি বিষম সৈরাতে.......'' ইত্যাদি

টুসু—অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে নতুন ফসল ঘরে তোলাকে কেন্দ্র করে 'টুসু' দেবীকে পূজা করার উদ্দেশ্যে এই গান গাওয়া হয়ে থাকে। এই গানের গীতি রীতি চটুল প্রকৃতির হয়ে থাকে।

ভাদু—'ভাদর' বা 'ভাদ্র' মাসে বীরভূম, বাঁকুড়া অঞ্চলে 'ভাদু' পূজাকে কেন্দ্র করে এই গান গাওয়া হয়ে থাকে।

ঝুমুর—'ঝুমুর' একটি নৃত্যবহুল আদিরসাত্মক চটুল প্রকৃতির গান। এই গান বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত।

গম্ভীরা—মালদা অঞ্চলে শিবের পূজাকে কেন্দ্র করে এই ধরনের গান রচিত ও গীত হয়ে থাকে। এই গান কখনও কখনও মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মধ্যেও শোনা যায়। বিভিন্ন তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে এই গান লেখা ও গাওয়া হয়ে থাকে।

বাউল — বাউল শব্দটি হিন্দি শব্দ 'বাওড়া' অর্থাৎ পাগল থেকে এসেছে। ঈশ্বর প্রেমে পাগল হয়ে এঁনারা গান করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'বাউল' গান—এই সাংগীতিক ধারাকে অনেকে লোকসংগীতের পর্যায়ভুক্ত করেন। কিন্তু 'বাউল' গান হল মূলতঃ দর্শনী যা 'বাউল' সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের দর্শন—যাঁরা মনে করেন দেহই সর্বস্ব, তার মধ্যেই ঈশ্বরের বাস। তাই 'বাউল গান' মূলতঃ দেহতত্ত্বের গান, সাধনার গান, এই গান দ্ব্যর্থক।

দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটকী সংগীত – ভারতীয় সংগীতের অপর একটি ধারার নাম দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত। সমগ্র দক্ষিণ ভারতীয় অঞ্চল জুড়ে এ সংগীত প্রবহমান। প্রথমদিকে এ সংগীত ছিল মন্দিরাশ্রিত। কিন্তু পরবর্তীকালে এর পরিব্যাপ্তি ঘটেছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে, দক্ষিণ ভারত বলতে বোঝায় কর্ণাটক, মহীশূর, তামিলনাড়ু প্রভৃতি অঞ্চল। এই সব অঞ্চলে প্রচলিত সংগীতের ধারা, উত্তর ভারতীয় সংগীতের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা শৈলীর। দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের ধারার মধ্যে আছে তিল্লানা, কীর্তনম্, ঘট্টম্, পদম্, রাগমালিকা প্রভৃতি।

১.২ স্বরলিপির প্রাথমিক ধারণা (Preliminary Ideas of Notation) ঃ

স্বরলিপির সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

গানের সুরকে স্বরের মাধ্যমে তাল সহযোগে বিজ্ঞানসম্মতভাবে লিপিবন্ধ করার প্রক্রিয়াকে 'স্বরলিপি' বলে।

ভারতীয় সংগীতের স্বরলিপি পদ্ধতি মূলত তিন প্রকার

১. আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি — যার স্রষ্টা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

২. হিন্দুস্থানি বা ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতি — যার স্রষ্টা পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে

৩. দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি — যার স্রষ্টা ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী

এই তিনটির মধ্যে 'আকারমাত্রিক' ও 'হিন্দুস্থানি' পদ্ধতি – এই দুটি বেশি ব্যবহৃত হয়। এখানে মনে রাখা দরকার যে, ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে যে স্বরলিপি পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়, পাশ্চাত্য সংগীতের ক্ষেত্রে সেটা হয় না। পাশ্চাত্য সংগীতে স্বরলিপি পদ্ধতিকে 'Western Notation' বলে। এই Notation পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

১.২.১ পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে কর্তৃক স্বরলিপি পদ্ধতি ঃ

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে প্রবর্তিত স্বরলিপি পদ্ধতি মূলতঃ হিন্দুস্থানী সংগীত/শাস্ত্রীয় সংগীতে ব্যবহৃত হয়। এই স্বরলিপি পদ্ধতির নিয়মাবলী ভাতখণ্ডের ক্রমিক পুস্তকমালিকার সব খণ্ডে লিপিবন্ধ আছে। নিয়মাবলী নিম্নরূপ—

১। মধ্য সপ্তকে এবং শুদ্ধ স্বরের উপরে বা নীচে কোনো চিহ্ন থাকে না। যেমন—মধ্য সপ্তকের শুদ্ধ স্বর—সা রে গ ম প ধ নি। মন্দ্র ও তার সপ্তকের স্বরে যথাক্রমে নীচে ও উপরে বিন্দু বসে। যেমন—

মন্দ্র সপ্তকের স্বর - সা় রে় গ় ম় প় ধ় নি়

তার সপ্তকের স্বর - সাᐧ রেᐧ গᐧ মᐧ পᐧ ধᐧ নিᐧ

তার সপ্তকের ডান দিকের সপ্তককে অতি তার সপ্তক বলে এবং ইহার লিখিত স্বরের উপর দুইটি করিয়া বিন্দু দিতে হয়। যথা—সাঁ রেঁ ইত্যাদি। ইহার বিপরীত মন্দ্র সপ্তকের বাম দিকে যে স্বর সপ্তক আছে তাহাকে অতি মন্দ্র সপ্তক বলে এবং সপ্তকের স্বর বুঝাইতে স্বরের নীচে দুইটি বিন্দু বসিবে। যথা- নি়় ধ়় ইত্যাদি।

২। এক মাত্রায় একটি স্বর থাকিলে তাহাদিগকে পৃথক পৃথক ভাবে লিখিতে হইবে। যথা- সা রে গ ইত্যাদি। একমাত্রায় একাধিক স্বর থাকিলে তাহাদিগকে একত্রে লিখিয়া স্বরের নীচে একটি অর্ধ বৃত্তাকার চিহ্ন দ্বারা ঘিরিয়া দিতে হইবে। যেমন সারে সারেগ ইত্যাদি। একটি স্বরের স্থায়িত্ব একাধিক মাত্রা হইলে, স্বরটি যত মাত্রা দীর্ঘ হইবে স্বরের ডানদিকে ততগুলি ড্যাস চিহ্ন (—) দিতে হইবে। যেমন—সা——— ইত্যাদি। ইহার অর্থ সা স্বরটি মোট ৪ মাত্রা দীর্ঘ হইবে। কোনো স্বর যত মাত্রা দীর্ঘ হইবে ততগুলি গানের অক্ষর থাকিলে স্বরকে ততবার লিখিতে হইবে। যেমন— গ গ গ গ ইত্যাদি।

৩। স্পর্শ স্বর বা কণ্ স্বর মূল স্বরের মাথায় বাম দিকে বা ডান দিকে ছোটো আকারে লেখা হয়। যেমন- স পা বা ধ নি ইত্যাদি।

৪। খট্‌কার কাজ বুঝাইতে স্বরটিকে বক্র বন্ধনীর মধ্যে লিখিতে হয়। যেমন— (সা) ইহার অর্থ 'সা' স্বরটি উচ্চারণ করিবার সময় ওই স্বরের আগের স্বর 'সা' স্বর তাহার পরের স্বর ও পুনরায় 'সা' স্বরটি একমাত্রার মধ্যে দ্রুতভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে। যেমন— (সা) = নিসারেসা ইত্যাদি।

৫। মীড়ের চিহ্ন স্বরের উপর অর্ধ বৃত্তাকার চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন— ম ধ বা সা প ইত্যাদি।

৬। একটি মাত্রাকে দুটি ভাগ করিতে কমা ',' এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হয়। যেমন— সারে, গ ইত্যাদি। ইহার অর্থ একমাত্রাকে সমান দুই ভাগ করিয়া প্রথম ভাগে 'সারে' এবং দ্বিতীয় ভাগে শুধু 'গ' আসিবে।

৭। কোমল স্বর লিখিতে স্বরের নীচে একটি ড্যাস (/) এই চিহ্ন দেওয়া করা হয়। যেমন—/ধ, /নি ইত্যাদি। কড়ি বা তীব্র স্বরকে লিখিতে স্বরের মাথায় একটি লম্ব চিহ্ন দেওয়া হয়। যেমন—মা।

৮। তালের বিভাগ বুঝাইতে দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়। সম-এর জন্য যুক্ত বা গুণীতক এক '+' বা 'x' চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, ফাঁক বা খালি চিহ্ন '০' এবং অন্যান্য বিভাগ ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি সংখ্যার দ্বারা বুঝানো হয়। তালের মাত্রাসমূহকে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন—ত্রিতাল

মাত্রা সংখ্যা ঃ-	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
ঠেকা ঃ-	ধা	ধিন	ধিন	ধা।	ধা	ধিন	ধিন	ধা।	
তাল চিহ্ন ঃ-	x								
মাত্রা সংখ্যা ঃ-	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
	।না	তিন	তিন	তা।	তেটে	ধিন	ধিন	ধা।	ধা
তাল চিহ্ন ঃ-	০				৩				x

১.২.২ রবীন্দ্রসংগীত তো বটেই, এছাড়া নজরুলগীতি ও অন্যান্য সব বাংলা গানেই আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির ব্যবহার বহুল ও গ্রহণযোগ্য। কারণ এটি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও বিশেষভাবে বিশেষিত (Specified) আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি বিশ্বভারতী প্রকাশিত সব স্বরলিপির শেষে মুদ্রিত এবং নিয়মাবলী নিম্নরূপ।

অধিকতর সুনির্দিষ্ট ও অধুনা বিশ্বভারতী - অনুসৃত আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ঃ

১। স র গ ম প ধ ন— সপ্তক। খাদ-সপ্তকের চিহ্ন স্বরের নীচে হসন্ত, যথা—প্‌, ধ্‌, এবং উচ্চ-সপ্তকের চিহ্ন স্বরের মাথায় রেফ, যথা—র্স, র্র।

২। কোমল র—ঋ, কোমল গ—জ্ঞ, কড়ি ম—ক্ষ, কোমল ধ—দ এবং কোমল ন—ণ।

৩। ঋ১—অতিকোমল ঋষভ। অতিকোমল ঋষভের স্থান স ও ঋ স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী। জ্ঞ১, দ১, ণ১ — যথাক্রমে অতিকোমল গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ। ঋ২—অণুকোমল ঋষভ। অণুকোমল ঋষভের স্থান ঋ ও র স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী। জ্ঞ২, দ২, ণ২—যথাক্রমে অণুকোমল গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ।

৪। একমাত্রা—া। অর্ধমাত্রা—ঃ। সিকিমাত্রা—০। দুইটি অর্ধমাত্রা, যথা—সরা। চারিটি সিকিমাত্রা, যথা—সরগমা। দুইটি সিকিমাত্রা, যথা—সরঃ। একটি সিকিমাত্রা, যথা—স০। একটি অর্ধমাত্রা ও দুইটি সিকিমাত্রা মিলিয়া একমাত্রা, যথা—সঃ গরঃ। একটি দেড়মাত্রা ও একটি অর্ধমাত্রা মিলিয়া দুই মাত্রা, যথা—রাঃ গঃ।

৫। কোনো আসল স্বরের পূর্বে যদি কোনো নিমেষ কালস্থায়ী আনুষঙ্গিক স্বর একটু ছুঁইয়া যায় মাত্র, তাহা হইলে সেই স্বরটি ক্ষুদ্র অক্ষরে আসল স্বরের বাম পার্শ্বে লিখিত হয়, যথা—মরা গরা। আসল স্বরের পরে কখনো অন্য স্বরের ঈষৎ রেশ লাগে; তখন ওই স্বর ক্ষুদ্র অক্ষরে দক্ষিণ পার্শ্বে লিখিত হয়, যথা—রাস।

৬। বিরামের চিহ্ন ও মাত্রাসমূহের চিহ্ন একই; হাইফেন-বর্জিত হইলে এবং স্বরাক্ষ-এর গায়ে সংলগ্ন না থাকিলেই সেই মাত্রা, বিরামের মাত্রা বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুরের ক্ষণিক স্তব্ধতাকে বিরাম বলে।

৭। তাল-বিভাগের চিহ্ন -একটি দাঁড়ি (।)। সমে ও সম্ হইতে তালের এক আবর্তন হইয়া গেলে দাঁড়ির স্থলে (I) এরূপ একটি 'দণ্ড' চিহ্ন বসে। প্রায় প্রত্যেক কলির আরম্ভে দুইটি দণ্ড বসে। প্রত্যেক তুকের (স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ) শুরুতে ও শেষে II (জোড় দণ্ড) এবং গানের একদম শেষে II II (যুগল জোড় দণ্ড) বসে।

৮। মাত্রাসমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন গুচ্ছে বিভক্ত, প্রত্যেক গুচ্ছের প্রথম মাত্রার শিরোদেশে ১, ২, ৩, ৪, ০ ইত্যাদি সংখ্যা বিভিন্ন তালাঙ্ক নির্দেশ করে। শূন্য-চিহ্নে (০) ফাঁক ও যে সংখ্যায় রেফ-চিহ্ন থাকে (১´) তাহাতেই সম্ বুঝিতে হইবে।

৯। অস্থায়ীতে প্রত্যাবর্তনের চিহ্নস্বরূপ দুইটি করিয়া দণ্ড বসে। কোনো কলির শেষে (।।) এই যুগল দণ্ড এবং সবশেষে II দুই জোড়া দণ্ড দেখিলেই আস্থায়ীর প্রথমে যেখানে যুগল দণ্ড আছে সেইখান হইতে আবার আরম্ভ করিবে।

১০।স্থায়ীর আরম্ভে,।। এই যুগল দণ্ডের বাহিরে গানের অংশ গান ধরিবার সময় একবার মাত্র গাহিবে; কারণ প্রত্যেক কলির শেষে এই অংশটুকু এইরূপ উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে পুনঃ লিখিত হইয়া থাকে।

১১।অবসানের চিহ্ন, শিরোদেশে যুগল দাঁড়ি, যথা—সা। হয় এইখানে একেবারে থামিবে; নয় এইগানে থামিয়া গানের অন্য কলি ধরিবে।

১২।পুনরাবৃত্তির চিহ্ন { } এই গুম্ফবন্ধনী; এবং পুনরাবৃত্তিকালে কতকগুলি স্বর বাদ দিয়া যাইবার চিহ্ন ( ) এই বক্র বন্ধনী, যথা—{সা রা (গা মা}। মাপা।

১৩।পুনরাবৃত্তিকালে কোনো সুরের পরিবর্তন হইলে, শিরাদেশে [ ] এই সরল বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে পরিবর্তিত স্বরগুলি স্থাপিত হয়; যথা—[রা পা]। কলির শেষে যুগল দণ্ডের মধ্যে ও সবশেষে দুই প্রস্থ যুগল দণ্ডের মধ্যে [ ] এই সরল বন্ধনী থাকিলে, যথা— I [ ] I, II [ ] II, স্থায়ীতে ফিরিয়া পরিবর্তিত সুর গাহিতে হয়।

১৪।কোনো এক স্বর যখন আর-এক স্বরে বিশেষ/রূপে গড়াইয়া যায়, তখন স্বরের নীচে () এইরূপ মাড়-চিহ্ন থাকে; যথা—{মা রা সা পা মা}।

১৫।যখন স্বরের নীচে গানের অক্ষর না থাকে, তখন সেই স্বর বা স্বরগুলির বাম পার্শ্বে হাইফেন (-) বসে এবং গানের পংক্তিতে শূন্য (০) দেওয়া হয়; যথা—সা -া -া -া। অথবা—সা -রা -গা -মা। একই স্বর পৃথক ঝোঁকে

মা ০ ০ ০ মা ০ ০ ০

উচ্চারিত হইলে সেই স্বরের বাম পার্শ্বেও হাইফেন বসে; যথা—

সা -সা -রা -রা। অথবা—সা -সা -রা -রা।

মা ০ ০ ০ গা ০ ০ ন্

১৬।নীচে গানের অক্ষর স্বরান্ত না হইলে উপরে স্বরের বাম পার্শ্বে হাইফেন (-) বসে।

যথা—সা -রা -গা -মা। ।সা -া -া -া। গা ০ ০ ন্ গা ০ ০ ন্

উচ্চারণঃ স্বরলিপির ভিতরে প্রায় সব কথার বানান যথাসাধ্য উচ্চারণ অনুযায়ী বিশ্লেষ করিয়া দেখাইতে যত্ন করা হইয়াছে। ে = এ এবং ে = অ্যা, যেরূপ বেদনা ও বেলা শব্দের প্রথম ব্যঞ্জনাশ্রিত একারের মুদ্রণে করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ‘অবেলায়’ বিশ্লেষিত হইলে ছাপা হয়—অ বে লা য়। ‘মনে’—ম নে।

১.৩ : বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান (Preliminary Knowledge of Instrument) ঃ

বাদ্যযন্ত্র কী ? সংগীতের উপযুক্ত ধ্বনি উৎপাদক যন্ত্রকে এক কথায় বাদ্যযন্ত্র বলে।

ভারতীয় সংগীতে ব্যবহার্য বাদ্যযন্ত্রগুলিকে মূলত চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১. তত্ শ্রেণিভুক্ত – যে বাদ্যযন্ত্রগুলি তার দিয়ে তৈরি, সেগুলিকে বোঝায়। যেমন — তানপুরা, সেতার, সরোদ প্রভৃতি।

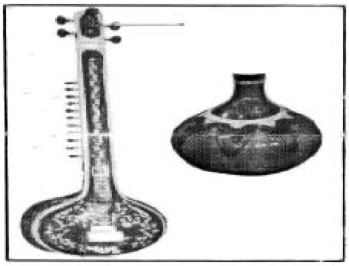
তানপুরা

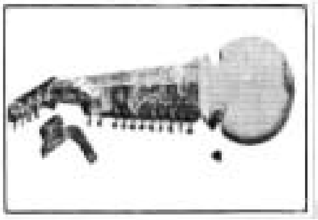
সেতার

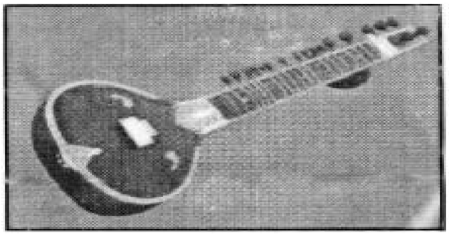
সরোদ

২. অবনদ্ধ শ্রেণিভুক্ত – যে বাদ্যযন্ত্রগুলি চামড়া দ্বারা আচ্ছাদন করা হয়ে থাকে সেগুলিকে বোঝায়। যেমন — তবলা, পাখোয়াজ, খোল প্রভৃতি।

তবলা

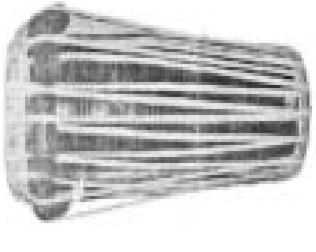
পাখোয়াজ

খোল

৩. সুষির শ্রেণিভুক্ত – যে বাদ্যযন্ত্রসমূহ ফুৎকার সহযোগে অর্থাৎ বায়ু চালনার দ্বারা বাজানো হয়ে থাকে সেগুলিকে বোঝায়। যেমন — হারমোনিয়াম, বাঁশি প্রভৃতি।

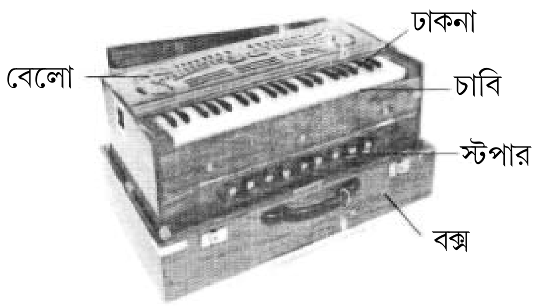

হারমোনিয়াম

বাঁশি

৪. ঘন শ্রেণিভুক্ত – ধাতব পদার্থ দ্বারা নির্মিত বাদ্যযন্ত্রগুলিকে ঘন শ্রেণিভুক্ত বাদ্যযন্ত্র বলে। যেমন — কাঁসর, ঘণ্টা, খঞ্জনি, মন্দিরা প্রভৃতি।

মন্দিরা

১.২.২ উল্লিখিত সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র সংগীতের উপযুক্ত তাল প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ সংগীত পরিবেশন রীতির ক্ষেত্রে অবশ্যই তাল পদ্ধতির প্রয়োজন। প্রত্যেকটি তালের একটি নির্দিষ্ট গতি থাকে। এই গতিকে বলা হয় 'লয়'।

একটি তাল বাদনশৈলীর মাধ্যমে প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে কতকগুলি নিয়ম মানা হয়ে থাকে। নিয়মগুলির মধ্যে আছে সম, তালি, খালি, বিভাগ প্রভৃতি।

সম – তালের সবচেয়ে বড় আঘাতজনিত প্রক্রিয়াকে 'সম' বলে। একটি তালে একটিই 'সম' থাকে। সাধারণত 'সম' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাল-বাজনা শুরু হয়ে থাকে।

তালি – তালের 'সম' ক্রিয়া ছাড়া অন্যান্য যে সশব্দ আঘাত প্রদর্শিত হয় সেগুলিকে বলে 'তালি'। একটি তালে কখনও একটি তালি থাকে আবার কখনও একাধিক তালি থাকতে পারে।

খালি – 'খালি' অর্থে ফাঁক বোঝায়। একটি তাল প্রক্রিয়ার মধ্যে এক বা একাধিক খালি বা ফাঁক থাকতে পারে, যা একটি নিঃশব্দ ক্রিয়া।

মাত্রা ও বিভাগ – তালের একক ভাগকে মাত্রা এবং কয়েকটি মাত্রা নিয়ে এক একটি বিভাগ হয়। তালের বিভাগ কখনও সমান আবার কখনও অসমান হয়। **সমান বিভাগসম্পন্ন** তালকে **সমপদী** এবং **অসমান বিভাগসম্পন্ন** তালকে **অসমপদী** তাল বলে।

ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রগুলির সম্বন্ধে ধারণা পাওয়ার জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে উপরে উল্লিখিত তালের বাদনশৈলী সংক্রান্ত কিছু পরিভাষা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হল। আশা করি, শিক্ষার্থীদের জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে সহযোগী হবে।

১.৪ তবলা ও হারমোনিয়ামের গঠন পরিচিতি (Structure of Tabla and Harmonium) ঃ

১.৪.১ হারমোনিয়াম – এটি একটি সুষির শ্রেণির পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে প্যারিস শহরের আলেকজান্ডার ডিবেইন নামের একজন ব্যক্তি এই যন্ত্রের আবিষ্কারক বলে জানা যায়। সংগীত শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে এই যন্ত্রটি বহুল ব্যবহৃত।

হারমোনিয়াম এর বিশেষত্ব হল এই যে এই বাদ্যযন্ত্রের এক একটি চাবি/() টিপলে একটিই নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের ধ্বনি (স্বর) নির্গত হয়। তাই ভারতীয় সংগীতের শ্রুতির সন্ধান পাওয়া যায় না।

১.৪.২ তবলা-বাঁয়া – এটি অবনদ্ধ শ্রেণিভুক্ত বাদ্যযন্ত্র। এই বাদ্যযন্ত্র দুটিকে একত্রে তবলা-বাঁয়া বলে। এ দুটির মুখ চামড়া দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে থাকে। এই যন্ত্রটির উদ্ভাবক হিসাবে আমরা ইতিহাসে আমীর খসরু'র নাম পেয়ে থাকি। সাধারণত এই তবলা যন্ত্রের যে অংশটি ডান হাত দিয়ে বাজানো হয়, তাকে বলে তবলা বা ডাইনা এবং যে অংশটি বাঁ হাতের সাহায্যে বাজানো হয়, তাকে বলে বাঁয়া।

এই দুটি পৃথক হলেও সংগীতের সভায় সাধারণত একসাথেই বাজানো হয়।

উপসংহার (Conclusion) ঃ

একজন শিক্ষার্থী ভারতীয় সংগীত এবং বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করার মধ্য দিয়ে সংগীতের প্রতি অধিক জ্ঞান লাভে আগ্রহী হয়ে উঠবে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে সংগীত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের দিশা দেখাতে সক্ষম হবে এবং জীবনের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করবে।

বিশেষ শব্দগুচ্ছ (Key Words) ঃ

সম্, গীত, সামগান, গান্ধর্ব সংগীত, প্রবন্ধ গান, হিন্দুস্থানি সংগীত, কর্ণাটকি সংগীত, তত, ঘন, অবনব্ধ, সুষির।

১.৫ অনুশীলনী (Exercise) ঃ

১. সংগীত কী? ভারতীয় সংগীতের ধারা কয়টি ও কী কী?

২. উত্তর ভারতীয় সংগীত পদ্ধতির শ্রেণিবিভাগগুলি কী কী? প্রত্যেকটি শ্রেণির দু'টি করে উদাহরণ দাও।

৩. স্বরলিপির সংজ্ঞা এবং প্রকারভেদসহ প্রবর্তকের নাম লেখ।

৪. বাদ্যযন্ত্রের শ্রেণিবিভাগগুলি কী কী? প্রত্যেকটি শ্রেণিবিভাগের দু'টি করে উদাহরণ দাও।

৫. দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের চারটি গায়নশৈলীর নাম লেখ।

৬. আকারমাত্রিক ও হিন্দুস্থানী স্বরলিপি পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করো।

৭. টীকা লেখ ঃ

বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, গম্ভীরা

১.৬ References

(১) গ্রন্থ — ভারতীয় সংগীত এবং বাদ্যযন্ত্র — (চিত্র সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে)।

(২) সংগীত মূল্যায়ন বক্তৃতামালা/প্রথম খণ্ড/সম্পাদনা ড. উৎপলা গোস্বামী/পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি/অক্টোবর, ১৯৮৯

অধ্যায়
2

অনুশীলন থেকে উপস্থাপন

সূচনা (Introduction)

এই পরিচ্ছেদ-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে প্রার্থনা সংগীত, ঋতুভিত্তিক গান, লোকসংগীত, দেশাত্মবোধক গান ও ছড়া গান। এখানে গানগুলির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি বিভাগের সংজ্ঞা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। ছড়া গানের মধ্যে বেশিরভাগটাই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির দিকে নজর রেখেই গানগুলি বাছাই করা হয়েছে। কারণ এই শ্রেণির শিশুরা ছড়া গান গাইতে আনন্দ পায় এবং সঠিক উচ্চারণ ক্ষমতার দক্ষতা গড়ে ওঠে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে ভবিষ্যতের শিক্ষক হিসাবে নিজেদেরকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং শিক্ষক হিসাবে কর্মক্ষেত্রে দৃঢ় মনোবল নিয়ে কাজ করতে পারে সে জন্য প্রত্যেকটি পর্যায়ভুক্ত গান সংজ্ঞাসহ বর্ণনা করা হয়েছে। আশা করছি এই একক (unit) শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথেষ্ট মনোবল বৃদ্ধি করবে এবং সহজভাবে গানগুলি শেখাতে সমর্থ হবে।

উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ– উল্লিখিত পর্যায়ভুক্ত গানগুলি শেখানোর উদ্দেশ্য হল–

১. প্রার্থনা সংগীতের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জাগ্রত হবে। অন্যদিকে একাগ্রতাও বৃদ্ধি পাবে

২. দেশাত্মবোধক গানগুলির মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম বোধ ও দেশভক্তির মাধ্যমে নিজেকে সুনাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

৩. বিভিন্ন ঋতু পর্যায়ভুক্ত গানগুলি সম্পর্কে জানবে এবং ঋতুবৈশিষ্ট্যগুলো আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করবে।

৪. লোকসংগীতের চর্চার মাধ্যমে বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্পর্কে অবগত হবে।

৫. ছড়া গান গাওয়ার মধ্য দিয়ে সুর ও ছন্দবোধ গড়ে উঠবে এবং পদের অন্তের শব্দের মিলকরণের দক্ষতা তৈরি হবে।

বিষয় (Content)

- **প্রার্থনা সংগীত (Prayer Song) -5**
- **ঋতুভিত্তিক গান (Seasonal Song) -5**
- **দেশাত্মবোধক গান (Patriotic Song) -5**
- **লোকগান (Folk Song) -5**
- **ছড়ার গান (Rhyme Song) -5** প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠপুস্তকের উপর ভিত্তি করে

- **২.১ প্রার্থনা সংগীত ঃ–** ‘প্রার্থনা’ বলতে ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন করাকে বোঝায়। কয়েকটি প্রার্থনামূলক সংগীতের উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হয়। (এখানে গান নির্বাচনের স্বাধীনতা শিক্ষকের রয়েছে–)

১. ‘আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে ....’ রবীন্দ্রসংগীত
২. ‘বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা ....’ রবীন্দ্রসংগীত
৩. ‘আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে ....’ রবীন্দ্রসংগীত
৪. ‘তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে......’ রজনীকান্তের গান
৫. ‘তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে.......’ রবীন্দ্রসংগীত

প্রার্থনা সংগীত

তাল-একতাল

পূজা পর্যায়

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর।।
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে,
বিশ্বজগৎ মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে।।
গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে

করিছে পান, করিছে স্নান, অক্ষয় কিরণে।।
ধরণী'পর ঝরে নির্ঝর, মোহন মধু শোভা
ফুলপল্লব-গীতগন্ধ-সুন্দর-বরণে।।
বহে জীবন রজনীদিন চিরনূতনধারা,
করুণা তব অবিশ্রাম জনমে মরণে।।
স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ,
কত সান্ত্বন করো বর্ষণ সন্তাপহরণে।।
জগতে তব কি মহোৎসব, বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয়শরণে।।

বিঃদ্রঃ- এটি একটি ব্রহ্মসংগীত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার ব্রাহ্ম ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীরা নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যে সব সংগীত রচিত হয়েছে, সেগুলিকে ব্রহ্মসংগীত বলে।

প্রার্থনা সংগীত

পূজা পর্যায় তাল- ঝম্পক

বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।।
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে—
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।।
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা—
তারিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাইবা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পরি এমনি যেন হয়।।
নম্রশিরে সুখের দিনে তোমারি মুখ লইব চিনে—
দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন করি না সংশয়।।

প্রার্থনা সংগীত

পূজা পর্যায় তাল-দাদ্রা

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পূর্ণ করো পূণ্য করো দহন-দানে।।
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার এই দেবালয়ের প্রদীপ করো—
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে।।
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারারাত ফোটাক তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,

যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো–
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে উর্ধ্ব-পানে।।

প্রার্থনা সংগীত

পূজা পর্যায়

তাল–দাদরা

তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে;
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহ কালিমা ঘুচায়ে।।
লক্ষ্য শূন্য লক্ষ্য বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন্ অকূল গরল পাথারে!
প্রভু বিশ্ব বিপদ হন্তা তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা;
তব শ্রীচরণ তলে নিয়ে এস মোর মত্ত বাসনা ঘুচায়ে।।
আছ অনল অনিলে, চির নভোনীলে, ভূধর, সলিলে, গহনে;
আছ বিটপীলতায়, জলদের গায়, শশী তারকায় তপনে।
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া, ব'সে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া;
আমি দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।।

সা সঋ II ঋমা -া মা া মা মপা মজ্ঞা I জ্ঞা -া জ্ঞা । জ্ঞরা রমা জ্ঞা I
তু মি০ নি০ র্ ম ল ক০ র০ ম ঙ্ গ ল০ ক০ রে

I ঋা ঋা সা । সঋা ঋমা মা I জ্ঞরজ্ঞ ঋা সা । -া সা সণ্ I
ম লি ন ম০ ০র্ ম মু০০ ছা য়ে ০ ত ব০

I সা দা দা । পদ দপা -পা I প পণা দা । পা মা -া সা সণ্ I
পু ০ ণ্য কি র০ ণ দি য়ে০ যা ক্ মো র্

I পা পণা ণদা । দপা পমা মপমা I জ্ঞা রা মজ্ঞা । -া ঋা সা I
মো ০০ হ০ কা০ লি০ মা০ ঘু চা য়ে ০ ০ ০

I -া সসা ঋসা । সঋা ঋমা মা I জ্ঞরজ্ঞ ঋা সা । -া সা সঋা II
০ মলি ন০ ম০ ০র্ ম মু০০ ছা য়ে ০ তু মি০

II দা -া মা । দা -া দণা I ণা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা I
ল দ ক্ষ্য শূ ০ ন্য০ ল ০ ক্ষ বা স না

I র্সা র্সঋা ঋা । ঋা ঋর্সা র্সঋা I র্সগা ণর্সা র্সা । -া -া -া I
ছু টি০ ছে গ ভী০ র০ আঁ০ ধা০ রে ০ ০ ০

I র্সা র্সজ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞর্রা জ্ঞা র্রমা I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । ঋা র্সা -া I
জা নি০ না ক খ ০ন্ ডু বে যা বে কো ন্

I ণা ণা ণা । দা দপা পণা I দা দা পা । -া সা সণ্া I
অ কূ ল গ র০ ল০ পা থা রে ০ প্র ভু০

I সা দা দা । দা দা দপা I মপা পমা মা । -া জ্ঞা জ্ঞা I
দাঁ ০ শ্ব বি প দ০ হ০ ০ন্ তা ০ তু মি

I জ্ঞা জ্ঞা মা । ম মপা মপমা I জ্ঞা রা ম্জ্ঞা । -া ঋা সা I
দাঁ ড়া ও রু ধি০ য়া০০ প ন্ থা ০ ত ব

I সা সা সদা । দা দা দপা I পা পণা দা । পা মা -া I
শ্রী চ র০ ণ ত লে০ নি য়ে০ এ স মো র্

I পা পণা ণদা । দপা পমা মপমা I জ্ঞা রা ম্জ্ঞা । -া ঋা সা I
ম লি ম বা০ স০ না০০ ঘু চা য়ে ০ ০ ০

I সা সা ঋা । সঋা ঋমা মা I জ্ঞরজ্ঞা ঋা সা । -া সা সঋা II
ম লি ন ম০ ০র্ ম মু০০ ছা য়ে ০ তু মি০

মা মা II মা মদা দা । দা দ দণা I ণা ণর্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা I
আ ছ অ ন০ ল অ নি লে০ চি র০ ন ভো নী লে

I র্সা র্সর্ঋা র্ঋা । র্ঋা র্ঋর্সা র্সর্ঋা I ণা ণর্সা র্সা । -া র্সা র্সণা I
ভূ ধ০ র স লি০ লে০ গ হ০ নে ০ আ ছো০

I র্সা র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞর্রা র্জ্ঞা র্রর্মা I র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞর্ঋা । র্ঋা র্সা -া I
বি ট০ পী ল০ তা ০য়্ জ ল দে০ র গা য়্

I ণা ণা ণদা । দপা পা পণা I ণদা দপা পা । -া সা সা I
শ শী তা০ র০ কা ০য়্ ত০ প০ নে ০ আ মি

I সা সদা দা । দা দা দপা I মপা পমা মা । -া জ্ঞা জ্ঞা I
ন য়০ নে ব স ন০ বাঁ০ ধি০ য়া ০ ব সে

I জ্ঞা জ্ঞমা মা । মা মপা মপমা I জ্ঞা জ্ঞরা মজ্ঞা । -া ঋা সা I
আঁ ধা০ রে ম রি০ গো০০ কাঁ দি০ য়া০ ০ আ মি

I সা সদা দা । -া দা দপা I পা পণা দা । পা মা মা I
দে খি০ না ই কি ছু বু ঝি০ না ই কি ছু

I পা ণা ণদা । দপা পমা মপমা I জ্ঞা রা ম্জ্ঞা । -া ঋা সা I
দা ও হে০ দে০ খা০ য়ে০০ বু ঝা য়ে ০ ০ ০

I -া সসা সঋা । সঋা ঋমা মা I জ্ঞরজ্ঞা ঋা সা । -া সা সঋা II II
০ মলি ন০ ম০ ০র্ ম মু০০ ছা য়ে ০ 'তু মি০'

একতাল (।৩)

তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমার প্রাণ তোমারি দান, তুমি ধন্য ধন্য হে।।
পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে, জনম দিয়েছ জননীক্রোড়ে,
বেঁধেছ সখার প্রণয়ডোরে, তুমি ধন্য ধন্য হে।।
তোমার বিশাল বিপুল ভুবন করেছ আমার নয়নলোভন—
নদী গিরি বন সরসশোভন, তুমি ধন্য ধন্য হে।।
হৃদয়ে-বাহিরে স্বদেশে-বিদেশে যুগে-যুগান্তে নিমেষে-নিমেষে
জনমে-মরণে শোকে-আনন্দে তুমি ধন্য ধন্য হে।।

১ ২ ০ ৩
II {সা সা সা । গা -া গা । মা মা মা । পা -া ধা I
তো মা রি গে ০ হে পা লি ছ স্নে ০ হে

I র্সা -া ণা । ধা -া মা । পা -ধা মা । গা -া -া} I
তু ০ মি ধ ন্ ন ধ ন্ ন হে ০ ০

I না না না । না -া না । র্সা র্সা র্সা । পা -া ধা I
আ মা র প্র ০ ণ তো মা রি দা ০ ন

I র্সা -া ণা । ধা -া মা । পা ধা মা । গা -া -া র II
তু ০ মি ধ ন্ ন ধ ন্ ন হে ০ ০

II {মা পা পা । না -া না । না র্সা র্সনা । র্রর্সা -া র্সা I
পি তা র বো ক্ খে রে খে ছ০ মো ০ রে

I না না না । র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সার্রা ণা । ধা -া পা} I
জ ন ম দি য়ে ছ জ ন০ নী ক্রো ০ ড়ে

I ধা ধা ধপা । মা গরা গা । মা মা মা । পা -া ধা I
বেঁ ধে ছ০ স খা০ র প্র ণ য় ডো ০ রে

I র্সা -া ণা । ধা -া মা । পা ধা মা । গা -া -া[র] II
তু ০ মি ধ ন্ ন ধ ন্ ন হে ০ ০

II {মা পা পা । না না না । না র্সা র্সনা । [র্]র্সা র্সা র্সা I
তো মা র বি শা ল বি পু ল০ ভু ব ন

I না না না । র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সর্রা ণা । ধা ধা পা} I
আ মা র প্র ০ ণ তো মা রি দা ০ ন

I ধা ধা ধপা । মা গরা গা । মা মা মা । পা পা ধা I
ন দী গি০ রি ব০ ন স র স শো ভ ন

I র্সা -া ণা । ধা -া মা । পা ধা মা । গা -া -া[র] II
তু ০ মি ধ ন্ ন ধ ন্ ন হে ০ ০

II {মা পা পা । না না না । না র্সা র্সনা । [র্]র্সা র্সা র্সা I
হৃ দ য়ে বা হি রে স্ব দে শে০ বি দে শে

I না না না । র্সা -া র্সা । র্সা র্সর্রা ণা । ধা ধা পা I
যু গে যু গা ন্ তে নি মে০ ষে নি নে ষে

I ধা ধা ধপা । মা গরা গা । মা মা মা । পা -া ধা I
জ ন মে০ ম র০ ণে শো কে আ ন ন্ দে

I র্সা -া ণা । ধা -া মা । পা -ধা মা । গা -া -া II II
তু ০ মি ধ ন্ ন ধ ন্ ন হে ০ ০

- **২.২ ঋতুভিত্তিক গান (Seasonal Song)**

বাংলার ছয় ঋতুর বর্ণনা সম্বলিত গানকে ঋতুভিত্তিক গান বলে। কয়েকটি ঋতুভিত্তিক গানের উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হল। (গান নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের স্বাধীনতা রয়েছে।)

১. পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে....... রবীন্দ্রসংগীত (শীত)
২. শীতের হাওয়ার লাগল নাচন.......... রবীন্দ্রসংগীত (শীত)
৩. আজ ধানের ক্ষেতে............ রবীন্দ্রসংগীত (শরৎ)
৪. ওরে গৃহবাসী.......... (বসন্ত)
৫. আজি ঝরঝর মুখর বাদর দিনে........ রবীন্দ্রসংগীত (বর্ষা)
৬. ‘‘শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি....’’ রবীন্দ্রসংগীত (শরৎ)

প্রকৃতি পর্যায়   (শীত ঋতু)

দাদরা(৷২)

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে,
আ য় আ য় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হা য় হা য় হায়।।
হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে   দিগ্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে–
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে,   মরি হা য় হা য় হায়।।
মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল।
ঘরেতে আজ কে রবে গো,   খোলো খোলো দুয়ার খোলো।
আলোর হাসি উঠল জেগে   ধানের শিষে শিশির লেগে–
ধরার খুশি ধরে না গো, ওই-যে উথলে,
মরি হা য় হা য় হায়।।

ˊ ˊ
১ ০ ২‿
II ধা -সা -া । সা সা -রা I গা -পা পা । পা মা -পা I
পো উ ষ্ তো দে র্ ডা ক্ দি য়ে ছে ০

I গা -া [র]সা । রা গা -মা I [র]গা -া -া । রা -া -গরা I
আ য়্ রে চ লে ৭॥ আ ০ য়্ আ ০ ০য়্

I সা -া -া । -া -া -া I [গ]পা পা -া । পা পা -া I
আ ০ ০ ০ ০ য়্ ডা লা ০ যে তা র্

I ক্ষ্মা পা -া । ধা না -া I পা পা -না । ধা ধা -নধা I
ভ রে ০ ছে আ জ্ পা কা ০ ফ স ০০

I পা -ধা -পা । মা গা -[র]সা I সা -া -রা । [র]গা -া -রা I
লে ০ ০ ম রি ০ হা ০ য়্ হা ০ য়

I [র]সা -া -া । -া -া -া II
হা ০ রে ০ ০ য়্

II পা ধা -র্সা । র্সা র্সা -া I র্সা -র্নর্রা -র্সা । র্সা -র্সা -র্রর্সা I
হাও য় র্ নে শা য়্ উ ০ঠ্ ল মে তে ০০

I [র্স]না -া র্সা । [র্স]না ধা -না I পা পা -ধা । ধা না -া I
দি গ্ ব ধূ রা ০ ধা নে র্ ক্ষে তে ০

I -া -া -া । -া -া -া I পা -ধা -া । র্সা না -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ রো দে র্ সো না ০

I ধা পা পা । ধা পা -া I পা পা -না । ধা ধা -নধা I
ছ ড়ি য়ে প রি ০ হা ০ য়্ হা ০ য়্

I সা -া -া । -া -া -া II
হা ০ ০ ০ ০ য়্

II { [গ]পা পা -া । পা পা -া I ক্ষ্মা পা -া । ক্ষ্মা পা -া I
মা ঠে র্ বাঁ শি ০ শু নে ০ শু নে ০

I [প]না না -া । না ধা -না I [ন]ধা পা -া । -া -া -া I
আ কা শ্ খু শি ০ হ ল ০ ০ ০ ০

I পা ধা -া । র্সা না -া I পা -া -ধা । না ধা -না I
ঘ রে ০ তে আ জ্ কে ০ ০ র বে ০

I ধপা -া -া । পা পা -া I [গ]পা পা -া । পা পা -া I
গো০ ০ ০ খো লো ০ খো লো ০ দু য়া র্

I ক্ষ্মা পা -া । ধা না -পা I [প]না না -া । না ধা -না I
খো লো ০ খো লো ০ খো লো ০ দু য়া র্

I [প]ধা পা -া । -া -া -া } I { পা ধা -র্সা । র্সা র্সা -া I
খো লো ০ ০ ০ ০ আ লো র্ হা সি ০

I র্সা -নর্রা র্সা । র্সা র্সা -র্রর্সা I না র্সা -া । না ধা -না I
উ ০ঠ্ ল জে গে ০০ ধা নে র্ শি ষে ০

I পা পা -ধা । ধা না -া I -া -া -া । -া -া -া } I
শি শি র্ লে গে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা ধা -া । র্সা না -া I ধা ধা -না । ধা পা -া I
ধ রা র্ খু শি ০ ধ রে ০ না গো ০

I পা -না না । ধা ধা -না I [ন]পা -ধা -পা । মা গা -রসা I
ও ই যে উ থ ০ লে ০ ০ ম রি ০

I সা -া -রা । (র)গা -া -রা I সা -া -া । -া -া -া II II
হা ০ য়্ হা ০ য়্ হা ০ ০ ০ ০ য়্

প্রকৃতি পর্যায় (বসন্ত ঋতু)

কাহারবা (।২)

ওরে গৃহবাসী, খোল্ দ্বার্ খোল্, লাগল যে দোল।
স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল।
দ্বার্ খোল্, দ্বার্ খোল্।।
রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে,
রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত-আকাশে,
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল।
দ্বার খোল্, দ্বার খোল্।।
বেণুবন মর্মরে দখিন বাতাসে,
প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে।
মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা,
পাখায় বাজায় তার ভিখারির বীণা,
মাধবীবিতানে বায়ু গন্ধে বিভোল।
দ্বার খোল্, দ্বার খোল্।।

সা -রা I গা -রা সা রা । রধা -া পা -া I সা -ধা ধ -া । পা -ধা -না-ধপা I
ও ০ রে ০ গৃ হ বা০ ০ সী ০ খো ল্ দ্বা র্ খো ০ ০ ০ল্

I পা -ধা না না । ধপা -া -া -া I র্সা র্সা না না । ধা ধা পা পা I
লা গ্ ল যে দো০ ০ ০ ল্ স্থ লে জ লে ব ন ত লে

I পধা -া ধা ধা । পা -া পা -মা I গা -া গা -রা । সা -া সা -রা II
লা০ গ্ ল যে দো০ ল্ দ্বা র্ খো ল্ দ্বা র্ খো ল "ও ০"

II পা গা পা পা । পা ধা পা ধা I (ধ)র্সা র্সা র্সা র্সর্না । র্রর্সা -া র্সা -া I
রা ঙা হা সি রা শি রা শি অ শো কে প০ লা০ ০ শে ০

I র্সা র্রা র্গা র্গা । র্রা র্রা র্সা র্সা I নর্রা র্রা র্সা র্সনা । ধনা -া (ধ)পা -া } I
রা ঙা নে শা মে ঘে মে শা প্র০ ভা ত আ০ কা০ ০ শে ০

I র্গা র্গা -া র্রা । র্রা -া র্সা র্সা I সা সা সা -রা । গা -া সা -রা I
ন বী ন্ পা তা য়্ লা গে রা ঙা হি ল্ লো ল্ দ্বা র্

I গা -া গা -রা । সা -া সা -রা II
খো ল্ দ্বা র্ খো ল "ও ০"

প্রকৃতি পর্যায় (শরৎ ঋতু)

কাহারবা (া২)

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই–
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই–
লুকোচুরি খেলা।।
আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে–উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে চখা-চখীর মেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই–
লুকোচুরি খেলা।।
ওরে, যাব না আজ ঘরে রে ভাই, যাব না আজ ঘরে।
ওরে, আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ নেব রে লুট ক'রে–
যাব না আজ ঘরে।
যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকাল বেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই–
লুকোচুরি খেলা।।

প্রকৃতি পর্যায় (শীত ঋতু)

দাদরা (া২)

শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন আম্‌লকির এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শির্‌শিরিয়ে ঝরিয়ে দিল তালে তালে।।
উড়িয়ে দেবার মাতন এসে কাঙাল তারে করল শেষে,
তখন তাহার ফলের বাহার রইল না আর অন্তরালে।।
শূন্য করে ভরে দেওয়া যাহার খেলা তারি লাগি রইনু বসে সকল বেলা।
শীতের পরশ থেকে থেকে যায় বুঝি ওই ডেকে ডেকে,
সব খোওয়াবার সময় আমার হবে কখন কোন্ সকালে।।

- **২.৩ লোকসংগীত (Folk Song)**

'লোকসংগীত' বলতে বোঝায় সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে সম্পৃক্ত স্বতঃস্ফূর্ত মনের গান। লোকগানের মধ্যে লোকজীবনচর্যার পাশাপাশি সেই অঞ্চলের ভূমিরূপও প্রতিভাত হয়।

নিম্নে কয়েকটি লোকসংগীতের উদাহরণ দেওয়া হল। তবে গান নির্বাচনে শিক্ষকের স্বাধীনতা রয়েছে।

১. 'ও আমার দরদি....... ভাটিয়ালি
২. 'ও কি ও বন্ধু কাজল ভোমরা ......ভাওয়াইয়া
৩. 'তোমরা গ্যাইলে কি আসিবেন
মোর মাহুত বন্ধু রে......" ভাওয়াইয়া
৪. ''আমার টুসু ধনে, বিদায় দিব কেমনে....." টুসু গান
৫. ''লালগড়ের লালমাটি যত পালায় বহুবেটি "–ঝুমুর
৬. 'সুজন মাঝি রে......" ভাটিয়ালি

লোকগান

ভাওয়াইয়া

ও-কি ও বন্ধু, কাজল ভোমরা রে
কনদিন আসিবেন বন্ধু, কইয়া যাও–
কইয়া যাও রে।।
যদি বন্ধু যাইবার চাও,
ঘাড়ের গামছা থুইয়া যাও রে,–(২)
বন্ধু কাজল ভোমরা রে
কনদিন আসিবেন বন্ধু কইয়া যাও
কইয়া যাও রে ।।
বটবৃক্ষের ছায়া যেমন রে,–(২)
মোর বন্ধুর কায়া তেমন রে–
বন্ধু কাজল ভোমরা রে ।।।
কনদিন আসিবেন বন্ধু কইয়া যাও–
কইয়া যাও রে ।।

ভাওয়াইয়া ঃ–

তোমরা গেইলে কি আসিবেন
মোর মাহুত বন্ধু রে।।
হস্তির নরান, হস্তির চরাণ, হস্তির গলায় দড়ি
ওরে সত্য কইরে কন্‌রে মাহুত কন্‌বা–
দ্যাশে বাড়ি রে।।
হস্তির নরান হস্তির চরাণ, হস্তির পায়ে বেড়ি,
ওরে, সত্য করিয়া কইলাম কথা গৌরী–পুরে বাড়িরে।।
খাটো-খোড়ো মাহুত রে তোর
গালে চাপা দাঁড়ি,
ওরে, সত্য করিয়া কন্‌রে মাহুত ঘরে–
কয়জন নারী রে।।
হস্তির নরান হস্তির চরাণ চম্পা নদীর পারে,
ওরে সত্য করিয়া কইলাম তোমার বিয়া-ওনা হয় মোরিরে।।

লোকগান

টুসু-

আমার টুসু ধনে
বিদায় দিব কেমনে
মাসাবধি টুসু ধনকে খুঁজেছি যতনে
টুসু ধনে।।
শাঁখা শাড়ি সিঁদুর দিলাম

আলতা দিলাম চরণে
মনের দুঃখ হয় বড়
ফিরে যেতে ভবনে।।
দয়া করে আসবে আবার
থাকে যেন মনে
ভুলো না ভুলো না টুসু
আসবে আমার সনে।।

ঝুমুর—

লাল গড়ের লাল মাটি
যত পালায় বহু বেটি
আর পালায় বনের ভালুক (গো)
ও ভালুক ধুকু ধুকু ধুকু ধুকু,
বাবুর বাপে ধরেছে বন্দুক।।
লাল গড়ের রথের মেলা
রাম গড়ের রথের চূড়া
দুই ঝুড়িতে নাইকো রঙের সাদা
এই ঝাড়গায়েতে ইদে বড় কাদা গো।।
ইদ দেখতে যাইছিলি
বড় কষ্ট পাইছিলি
রাতে ছিলি বাঁশতলাতে
ঠাকুর দিদির ঘরেতে
তাইতো লোকে নিলাজ নিলাজ বলে রে।।

ভাটিয়ালি ঃ—

ও আমার দরদি আগে জানলে
আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না।
ভাঙা নৌকায় চড়তাম না আর
দূরের পাড়ি ধরতাম না,
আমি নবলাখ বাণিজ্যের বেসাত
এই নায়ে বোঝাই করতাম না।।
ছিল সোনার দাঁড় পবনের বৈঠা
ময়ূরপঙ্খী নাওখানা
চন্দ্র-সুরজ গলুই ভরি
ফুল ছড়াতে জোছনা।।
শঁও শঁও শঁও শঁও দারিয়াতে উঠে ঢেউ
এই তুফানেতে কেউ গাঙ পাড়ি দিও না।
ওরে বিষম দইরার পাড়ি দেইখা
ভয়েতে প্রাণ বাঁচে না।।

রচনা — জসিমউদ্দীন

বিঃ দ্রঃ :– বাংলার লোকগানগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আঞ্চলিক শব্দের সংযোজন আছে। তাই লোকগানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ রেখেই শব্দগুলো আঞ্চলিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং, আঞ্চলিকতা নজর রেখেই গানগুলি গাওয়া হলে লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা সম্ভব হবে।

ভাটিয়ালি

সুজন মাঝি রে–
কোন ঘাটে লাগাইবা তোমার নাও।
আমি পারের আশায় বইস্যা আছি
আমায় লইয়া যাও।
এই পারেতে দরদি নাই,
ওই পারেতে যাইবার চাই,
হয় না আমার পারে যাওয়া
চঞ্চলিয়া চলিয়া যাও।
দেহের অঞ্চল আমার উড়ায় না বাতাসে,
উড়ায় অমার বুকের পাষাণ,
কাঁপায় না হুতাশে।
তোমার দেখা পাই না বলে,
নিত্য ভাসি নয়ন জলে,
হয় না আমার তোমায় পাওয়া
চঞ্চলিয়া চলিয়া যাও।

II ন্‌া সা -া । রা জ্ঞা -া I রা -া -া । -া -া -া I রমা -া মা । মা -া মা I
সু জ ন মা ঝি ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ কো ন্ ঘা টে লা ০

I গা -া রা । গা রা সা I সা -া -া । -া -া -া I -া -া -া । -া সা সা I
গ ই বা তো মা র্ না ০ ও ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মি

I রা রা মা । রা মা -া I মা মা -া । -া -া পা I ধা ণা ধা । পধা পা -া I
আ মি ০ পা রে র আ শা য় ব ই স্যা আ ছি ০ ০০ ০ ০

I -া -া -া । -া -া -া I -া -া র্সা । পা পা -া I পা -া পা । ধা পা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ও আ মা য় ল ০ ই য় ০ ০

I মা -া -া । -া গা -া I রা গা রা । -া -া -া I -া -া -া । -া -া -া II
যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ও ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

কোন ঘাটে লাগাইবা তোমার নাও।

II পা -া ধা । মা পা -া I ধা র্সা -া । র্সা র্রা -া I র্সা -া -া । -া -া -া I
এ ই পা রে তে ০ দ র ০ দি না ০ ই ০ ০ ০ ০ ০

I া -া া । া া া I র্সা -া র্রা । র্রা র্রা -া I র্রা র্সা র্সরা । র্গা র্রা র্সা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ও ই পা রে তে ০ যা ই বা০ ০ র ০

I র্সা -া া । া া া I -া -া -া । না র্সা না I ধা ণা ধা । পধা ণধা -া I
চা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ই ০

I পা র্সা র্সা । া র্সা র্রা I র্সা ণা -া । ধা পমা -া I পা ণা ণা । ধা পা মা I
হ য় না ০ আ মার্ পা রে ০ যাওয়া০ ০ চ ন্ চ লি য় ০

I পা -া ণা । ধা পা মা I মা -া -া । -া -া গা I রগা রা -া । -া -া -া II
চ ০ ০ লি য় ০ যা ০ ০ ০ ০ ০ ও০ ০ ০ ০ ০ ০

কোন ঘাটে.........

নাও

II গা গা -া । মা পা {-া I মা জ্ঞা -া । রা সণ্ -া I সা সা মা । জ্ঞা রা জ্ঞা I
দে হে ০ র অ ন্ চ ল ০ আ মা০ র উ ড়া য় না বা ০

I সরা সা া । া া া I মা মা পা । পা পণাধণা I পধা প -া । -া -া -া I
তা০ সে ০ ০ ০ ০ উ ড়া য় আ মা০০০ ০০ ০ র ০ ০ ০

I ধপা মা -া । মা পা -া I পণা ধা -া । পা মা -া I গা রসা -া । গা গা -া I
০০ ০ ০ উ ড়া য় আ মা র বু কে র পা ষা০ ণ কাঁ পা য়

I রা গা রা । সা -া সা I -া -া -া । -া -া -া II
না ০ ছ্ তা ০ সে ০ ০ ০ ০ ০ ০

II পা -া রা । মা পা -া I ধা র্সা -া । র্সা র্রা -া I র্সা -া -া । -া -া -া I
তো মা র দে খা ০ পা ই না ব লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I া -া া । া া া I র্সা -া র্রা । র্রা র্রা -া I র্রা র্সা র্সরা । র্গা র্রা র্সা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ নি ০ ত্য ভা সি ০ ন য় ন০ জ লে ০

I র্সা -া া । া া া I -া -া -া । না র্সা না I ধা ণা ধা । পধা ণধা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০

I পা র্সা র্সা । া র্সা র্রা I র্সা ণা -া । ধা পমা -া I পা ণা ণা । ধা পা মা I

হ য় না ০ আমার্ তোমা য় পওওয়া০ চ নু চ লি য়া ০

I পা -া ণা । ধা পা মা I মা -া -া । -া -া গা I রগা রা -া । -া -া -া IIII
চ ০ ০ লি য়া ০ যা ০ ০ ০ ০ ও ০০ ০ ০ ০ ০ ০

কোন ঘাটে....... নাও।

আদিবাসী ঝুমুর

টাঙ্গিয়া ঝলকায় লাগর
যাছন্ গো
বাইর্লেন কুঁক্ড়ী ডাকে,
সোজা গেলেন কুলীর বাটে গো,
চটিয়া ফুঁকিয়া।
ভাত খাবার বেলা হইল্য,
এখনো লাগর না আইল,
কোন বাটে কেন্দ যাছেন,
মহুল বনে গো।

- **২.৪ দেশাত্মবোধক গান (Patriotic Song)**

দেশভক্তি ও দেশপ্রেম জাগ্রতকরণের জন্য যে সব গান গাওয়া হয় সেগুলিকে দেশাত্মবোধক গান বলা হয়। নিম্নে কয়েকটি দেশাত্মবোধক গানের উদাহরণ দেওয়া হল। গান নির্বাচন করার ক্ষেত্রে শিক্ষকের স্বাধীনতা আছে।

১. ‘‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ ....’’ রবীন্দ্রসংগীত
২. ‘‘জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ....’’ রবীন্দ্রসংগীত
৩. ‘‘আমরা সবাই রাজা .... রবীন্দ্রসংগীত
৪. ‘‘উঠো গো ভারতলক্ষ্মী .... অতুলপ্রসাদের গান
৫. ‘‘ধনধান্য পুষ্প ভরা .... দ্বিজেন্দ্রগীতি

দেশাত্মবোধক গান

।। স্বদেশ পর্যায়।।

কাহারবা (।২)

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।
অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।

জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।
পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী।
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।
ঘোরতিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়,জয় হে।।

দেশাত্মবোধক গান

দাদরা/দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ধন ধান্য পুষ্প ভরা
আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক
সকল দেশের সেরা–
ওসে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ
স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে, আমার জন্মভূমি।।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা,
কোথায় উজল এমন ধারা
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ
এমন কালো মেঘে,
তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি
পাখির ডাকে জেগে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে-যে, আমার জন্মভূমি।।
এত সিগ্ধ নদী কাহার,
কোথায় এমন ধ্রূম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র,
আকাশ তলে মেশে

এমন ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায়, বাতাস কাহার দেশে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে, আমার জন্মভূমি।।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখি
কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি
গুঞ্জরিয়া আসে অলি
কুঞ্জে কুঞ্জে বেয়ে
তারা ফুলের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে
ফুলের মধু খেয়ে।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে, আমার জন্মভূমি।।

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ
কোথায় গেলে পাবে কেহ
ও মা তোমার চরণদুটি,
বক্ষে আমার ধরি
আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি।।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে, আমার জন্মভূমি।।

তাল—কাহারবা

দেশাত্মবোধক গান

।। স্বদেশ পর্যায়।।

অতুলপ্রসাদ সেন

উঠ গো ভারত লক্ষ্মী, উঠ আদি-জগত-জন-পূজ্যা,
দুঃখ দৈন্য সব নাশি করো দূরিত ভারত লজ্জা।
ছাড়ো গো ছাড়ো শোকশয্যা, করো সজ্জা
পুনঃকমল-কনক ধন ধান্যে।।
জননী গো, লহো তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন বাস দেহো তুলে চক্ষে,
কাঁদিছে তব চরণ তলে
ত্রিংশতি কোটি নর-নারী গো।।

কাণ্ডারী নাহিক কমলা, দুখ লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী কাল সাগর কম্পন দর্শে।
তোমার অভয় পদ স্পর্শে নব হর্ষে,
পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে।
জননী গো, লহো তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহো তুলে চক্ষে,
কাঁদিছে তব চরণ তলে
ত্রিংশতি কোটি নর নারী গো।।

ভারত শ্মশান কর পূর্ণ পুনঃ কোকিল কূজিত কুঞ্জে,
দ্বেষ হিংসা করি চূর্ণ করো পূরিত প্রেম অলি গুঞ্জে,
দূরিত করি পাপ-পুঞ্জে তপঃ ভুঞ্জে,
পুনঃ বিমল করো ভারত পূণ্যে।
জননী গো, লহো তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহো তুলে চক্ষে,
কাঁদিছে তব চরণ তলে
ত্রিংশতি কোটি নর নারী গো।

ছবি

দেশাত্মবোধক গান

।। স্বদেশ পর্যায়।।

দাদরা (।২)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা   সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?।
আমরা যা খুশি তাই করি,
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নাই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?
রাজা সবারে দেন মান,
সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো ক'রে রাখেনি কেউ কোনো অসত্যে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?
আমরা   চলব আপন মতে,
শেষে   মিলব তাঁরি পথে,
মোরা   মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?।

০ ১ ০ ১ ০
সা -া সা II র্সা র্সা -া । না না -া I ধা ধা -া । পা পা -া I
আ ম্ রা স বা ই রা জা ০ আ ম ০ দের্ এ ই

I ধা ধা -া । পা গা -া I পা -া -া । -া -া -া I
রা জা র্ রা জ ০ ত্বে ০ ০ ০ ০ ০

I ধা -া ধা । পা পা -া I গা গা -া । রা সা -রা I
ন ই লে মো দে র্ রা জা র্ স নে ০

I গা -া মা । গা রা -া I সা -া -া । সা -া রা I

মি ল্ ব কী স্ব ০ ত্বে ০ ০ আ ম্ রা

I গা গা -া । রা সা -া I -া -া -া । সা -া সা II
স বা ই {রা জা ০ ০ ০ ০ "আ ম্ রা"

II -া -া -া । পা -া পা I পা -া গা । পা পা -ধা I
০ ০ ০ আ ম্ রা যা ০ খু শি তা ই

I ধর্সা র্সা -া । র্সা র্সা -া I র্সা -র্গা র্গা }I র্রা র্রা -া I
ক০ রি ০ ত বু ০ তাঁ র্ খু শি তে ই

I র্সা র্সা -া । র্সা -া র্সা I র্সর্গা -া র্গা । র্রা র্রা -া I
চ রি ০ আ{ ম্ রা নই ০ বাঁ ধা ন ই

I র্সা র্সা -া । না না -া I ধা ধা -া । পা গা -া I
দা সে র্ রা জা র্ ত্রা সে র্ দা স ০

I পা -া -া । -া -া -া I ধা -া ধা । পা পা -া I
ত্বে ০ ০ ০ ০ ০ ন ই লে মো দে র্

I গা গা -া । রা সা -রা I গা -া মা । গা রা -া I
রা জা র্ স নে ০ মি ল্ ব কী স্ব ০

I সা -া -া । সা -া রা I গা গা -া । রা সা -া I
ত্বে ০ ০ আ ম্ রা স বা ই রা জা ০

I -া -া -া । সা -া সা II
০ ঠ ০ "আ ম্ রা"

II -া -া -া । সা সা -া I সা সা -ধা । সা সা -রা I
০ ০ ০ রা জা ০ স বা ০ রে দে ন্

I রা -গা -া । গা গা -রা I গা -া ধা । পা ক্ষ্মা -া I
মা ০ ন্ সে মা ন্ আ প্ নি ফি রে ০
I গা -া -া । গা গা -া I গপা পা -া । ক্ষ্মা পা -া I
পা ০ ন্ মো দে র্ খা০ টো ০ ক রে ০

I ক্ষ্মা পা -া । ক্ষ্মা পা -া I না না -া । ধা পা -ক্ষ্মা I
রা খে ০ নি কে উ কো নো ০ অ স ত্

I গা -া -া । -া -া -া I ধা -া -ধা । পা পা -া I
তে ০ ০ ০ ০ ০ ন ই লে মো দে র্

I গা গা -া । রা সা -রা I গা -া মা । গা রা -া I
রা জা র্ স নে ০ মি ল্ ব কী স্ব ০

I সা -া -া । সা -া রা I গা গা -া । রা সা -া I
ত্বে ০ ০ আ ম্ রা স বা ই রা জা ০

I -া -া -া । পা -া পা I পা -া পা । পা পা -ধা I
০ ০ ০ আ ম্ রা চ ল্ ব আ প ন্

I ধর্সা র্সা -া । র্সা র্সা -া I র্সর্গা -া র্গা । র্রা র্রা -া I
ম০ তে ০ শে ষে ০ মি ল্ ব তাঁ রি ০

I র্সা র্সা -া । র্সা র্সা -া I র্সর্গা -া র্গা । র্রা র্রা -া I
প থে ০ মো রা ০ ম র্ ব না কে উ

I র্সা র্সা -া । না না -া I ধা -া ধা । পা পা -া I
বি ফ ০ ল তা র্ বি ষ ম্ আ ব র্

I পা -া -া । -া -া -া I ধা -া ধা । পা পা -া I
তে ০ ০ ০ ০ ০ ন ই লে মো দে র্

I গা গা -া । রা সা -রা I গা -া মা । গা রা -া I
রা জা র্ স নে ০ মি ল্ ব কী স্ব ০

I সা -া -া । সা -া রা I গা গা -া । রা পা -া I
ত্বে ০ ০ আ ম্ রা স বা ই রা জা ০

I -া -া -া । সা -া সা II II
০ ০ ০ "আ ম্ রা"

দেশাত্মবোধক গান

।। স্বদেশ পর্যায় ।।

দাদরা (।২)

যদি তোর   ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে।।
যদি   কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি   সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়–
তবে পরান খুলে
ও তুই   মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে।।
যদি   সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি   গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়–
তবে পথের কাঁটা
ও তুই   রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে।।
যদি   আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে–
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে।।

		০				১				০				১				০			
ন্া	।	ন্া	ন্া	-া	II	সা	-া	সা	।	রা	রা	-া	I	^{র}পা	-া	-া	।	মা	-া	-া	I
য		দি	তো	র্		ডা	ক্	শু		নে	কে	উ		না	০	০		আ	০	০	

I	গমা	-গা	-া	।	রা	সা	-া	I	রা	-া	গা	।	গা	রা	-গরা	I
	সে০	০	০		ত	বে	০		এ	ক্	লা		চ	লো	০০	
I	(সা	-া	ন্া	।	ন্া	ন্া	-া)	I	সা	-া	-া	।	-া	মা	মা	I
	রে	০	য		দি	তো	র্		রে	০	০		০	ত	বে	
I	মা	-া	পা	।	পা	পা	-া	I	^{ম}পা	-া	পা	।	^{প}ণা	ণা	-ধা	I
	এ	ক্	লা		চ	লো	০		এ	ক্	লা		চ	লো	০	
I	পা	-া	মা	।	গা	^{র}সা	-া	I	রা	-া	গা	।	গা	রা	-গরা	I
	এ	ক্	লা		চ	লো	০		এ	ক্	লা		চ	লো	০০	
I	(সা	-রা	-মা	।	মা	পা	-া)	I	সা	-া	ন্া	।	ন্া	ন্া	-া	II
	রে	০	০		ত	বে	০		রে	০	“য		দি	তো	র্”	

মা মা II মা -া পা । পা ধণা -ধা I পা -া -া । (-া সা সা I
য দি কে উ ক থা না০ ০ ক ০ ০ য়্ ও রে
I রা -মা -া । পা -ধা -ণা I ধা -র্সা ণা । ধা পা -ধপা) I -া পা ধা I
ও ০ ০ রে ০ ০ ও ০ অ ভা গা ০০ য়্ য দি

I ধর্সা -র্সা -া । র্সা র্সা -র্রা I ণর্সা -া ণা । ধা পা -ধপা I
স বা ই থা কে ০ মু খ্ ফি রা য়ে ০০

I মা পা -া । পা ধণা -ধা I পা -া -া । -া সা সা I
স বা ই ক রে০ ০ ভ ০ ০ য়্ য দি

I রা মা -া । পা ধা -ণা I ধা র্সা ণা । ধা পা -ধপা I
স বা ই থা কে ০ মু খ্ ফি রা য়ে ০০

I মা পা -া । পা ধণা -ধা I পা -া -া । -া মা মা I
স বা ই ক রে০ ০ ভ ০ ০ য়্ ত বে

I পা পা -ণা । ধা ণা -া I -া -া -া । ধা পা -মা I
প রা ন্ খু লে ০ ০ ০ ০ ও তু ই

I মা -া পা । ণপা ণা -ধা I পা মা -া । গা রসা -া I
মু খ্ ফু টে তো র্ ম নে র্ ক থা ০

I রা -া গা । গা রা -গরা I (সা -া -া । -া মা মা) I
এ ক্ লা ব লো ০০ রে ০ ০ ০ ও তুই

I সা -া ন্া । ন্া ন্া -া II
রে ০ "য দি তো র্"

মা মা II মা পা -া । পা ধণা -ধা I পা -া -া । (-া সা সা I
য দি স বা ই ফি রে০ ০ যা ০ ০ য়্ ও রে

I রা -মা -া । পা -ধা -ণা I ধা -র্সা ণা । ধা পা -ধপা) I -া পা ধা I
ও ০ ০ রে ০ ০ ও ০ অ ভা গা ০০ য়্ য দি

I মা পা -া । পা ধণা -ধা I পা -া -া । -া সা সা I
স বা ই ক রে০ ০ ভ ০ ০ য়্ য দি

I রা মা -া । পা ধা -ণা I ধা র্সা ণা । ধা পা -ধপা I
গ হ ন্ প থে ০ যা বা র্ কা লে ০০
I মা -া পা । পা ধণা -ধা I পা -া -া । -া মা মা I
কে উ ফি রে না০ ০ চা ০ ০ য়্ ত বে

I পা পা -ণা । ধা ণা -া I -া -া -া । ধা পা -মা I
প থে র্ কাঁ টা ০ ০ ০ ০ ও তু ই

I মা -া পা । ণপা ণা -ধা I পা মা -া । গা রসা -া I
ক ক্ ত মা খা ০ চ র ণ্ ত লে ০

I রা -া গা । গা রা -গরা I (সা -া -া । -া মা মা) I
এ ক্ লা দ লো ০০ রে ০ ০ ০ ও তুই

I সা -া ন্া । ন্া ন্া -া II
রে ০ “য দি তো র্”

মা মা II মা পা -া । পা ধণা -ধা I পা -া -া । (-া সা সা I
য দি আ লো ০ না ০০ ধ রে ০ ০ ০ ও রে

I রা -মা -া । পা -ধা -ণা I ধা -র্সা ণা । ধা পা -ধপা) I -া পা ধা I
ও ০ ০ রে ০ ০ ও ০ অ ভা গা ০০ ০ য দি

I ধর্সা -র্সা -া । র্সা র্সা -র্রা I ণর্সা -া ণা । ধা পা -ধপা I
ঝ ড়্ বা দ লে ০ আঁ০ ধা র্ রা তে ০০

I মা পা -া । পা -ধণা ধা I পা -া -া । -া সা সা I
দু য়া র্ দে ০য়্ ঘ রে ০ ০ ০ য দি

I রা -মা মা । পা -ধা -ণা I ধর্সা ণা -া । ধা পা -ধপা I
ঝ ড়্ বা দ লে ০ আঁ ধা র্ রা তে ০০

I মা পা -া । পা ধণা -ধা I পা -া -া । -া মা মা I
দু য়া র্ দে ০য়্ ঘ রে ০ ০ ০ ত বে

I পা -া ণা । ধা ণা -া I -া -া -া । ধা পা -মা I

ব জ্ জ্রা ন লে ০ ০ ০ ০ আ প ন্

I মা পা -া । [প]ণা ণা -ধা I পা মা মা । গা [র]সা -া I
বু কে র্ পাঁ জ র্ জ্বা লি য়ে নি য়ে ০
I রা -া গা । গা রা -গরা I (সা -া -া । -া মা মা I
এ ক্ লা জ্ব লো ০০ রে ০ ০ ০ আ পন্

I সা -া ন্া । ন্া ন্া -া II II
রে ০ "য দি তো র্"

- **২.৫ ছড়া গান**

বাংলার সর্বপ্রাচীন 'গান' হিসাবে ছড়া গানকেই ধরা হয়ে থাকে। ছন্দযুক্ত ছড়াকে সুর সহযোগে গাওয়া হলে তাকে ছড়া গান বলে।

নিম্নে কয়েকটি ছড়া গানের উদাহরণ দেওয়া হল। তবে শিক্ষক এক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে যে কোনো ছড়াকে সুরদান করতে পারেন।

(ক) "প্রজাপতি! প্রজাপতি কোথায় পেলে ভাই ....." নজরুলগীতি
(খ) "Twinkle twinkle little star"
(গ) "Two little hands......"
(ঘ) "যে যার বাসায় ঐ যে ওরা করছে ডাকাডাকি....." নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
(ঙ) "Flip Flap....."

ছড়া গান

(i) Twinkle, twinkle little star
How I wonder what you are!
Up above the world so high
Like a diamond in the sky.

(ii) Two little hands to clap, clap, clap
Two little feel to tap, tap, tap
Two little eyes are open wide
One little head goes side to side.

(iii) Flip-Flap! Flip-Flap!
Rises my kite,
Up and Up in the sky
Blue and bright.
Flip-Flap! Flip-Flap!
Goes my kite,
Sometimes to my left,.
And sometimes to my right.
Flip-Flap! Flip-Flap!
Flies my kite,
High and high above,

Touching the skies.

(iv) Off to school on Monday
Read a page on Tuesday
Write three lines on Wednesday
Solve five sums on Thursday
Draw and paint on Friday
Sing a song on Saturday
Peny all day on Sunday.

ছড়া গান

প্রজাপতি! প্রজাপতি! কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা।
টুকটুকে লাল নীল ঝিলমিল আঁকাবাঁকা,
কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা।।
তুমি টুলটুলে বনফুলে মধু খাও
মোর বন্ধু হয়ে সেই মধু দাও,
ওই পাখা দাও, সোনালি রূপালি পরাগ মাখা।
কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা।।
মোর মন যেতে চায় না পাঠশালাতে
প্রজাপতি তুমি নিয়ে যাও সাথে করে
তোমার সাথে, প্রজাপতি।।
তুমি হাওয়ায় নেচে নেচে যাও,
আর তোমার মতো মোরে আনন্দ দাও,
এই জামা ভালো লাগে না
দাও জামা ঐ ছবি আঁকা।
কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা।।

—কাজী নজরুল ইসলাম

ছড়া গান

যে যার বাসায় ওই যে ওরা
করছে ডাকাডাকি
ওরাই আমার বাবুই-ফিঙে
শালিক দোয়েল পাখি
সাত সকালে ওরাই এসে
ঘরের জানালায়
খোকন ওঠো বলে আমার
ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী,

বিঃ দ্রঃ— ‘পাখিরা’ কবিতা থেকে গৃহীত।
বিঃ দ্রঃ—ছড়া গানগুলি শিক্ষক তাঁর নিজস্ব সুরে শিক্ষার্থীদের শেখাবেন।

● **উপসংহার** (Conclusion) :– পরিচ্ছেদের এই অংশের আলোচ্য বিষয়গুলি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে,এই অংশে অন্তর্ভুক্ত গানগুলি সঠিকভাবে শিখলে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের গানের ধারণা তৈরি হবে এবং গানগুলি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারবে। এছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুষ্ঠান পরিচালনা করার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।

● **বিশেষ শব্দগুচ্ছ** (Key words):–

প্রার্থনা, ঋতু, দেশাত্মবোধ, ছন্দ, খাড়ো-খোড়ো

● **২.৬ অনুশীলনী** (Exercise)

১. তোমার স্কুলে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে দু'টি গানের তালিকা তৈরি করো।

২. বিদ্যালয়ে বসন্ত উৎসবের উপযুক্ত গানগুলি উল্লেখ করো।

৩. লোকগানের কয়েকটি ধারার নাম উল্লেখ করো।

৪. পছন্দমতো কয়েকটি ছড়ার গান উল্লেখ করো।

● **২.৭ সহায়ক পুস্তক তালিকা** (Further Reading Books)

১. স্বরবিতান (১ থেকে ৬৬ সংখ্যা) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২. দ্বিজেন্দ্রগীতি, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদের স্বরলিপিযুক্ত গানের বইয়ের সংকলন।

৩. সংগীত মূল্যায়ণ বক্তৃতামালা/প্রথম খণ্ড/সম্পাদনা-ড. উৎপলা গোস্বামী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি/অক্টোবর ১৯৮৯

৪. সংগীত মূল্যায়ন বক্তৃতামালা/তৃতীয় খণ্ড/সম্পাদনা- ড. উৎপলা গোস্বামী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি/ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২

অধ্যায়

৩

সংগীতের মাধ্যমে শিক্ষণ ও শিখন (সক্রিয় প্রকল্প নির্মাণ)

সূচনা ঃ

এই পর্যায়ের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে – প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের কিছু বিষয় যেগুলিকে সংগীতের মাধ্যমে সমন্বিত করা হয়েছে। এই ধরনের বিষয়ের পরিব্যাপ্তি ব্যাপক। তাই অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে বর্ণিত হল –

(ক) উল্লিখিত শ্রেণিসমূহের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত কোনো একটি বিষয়কে সংগীতের মাধ্যমে সমন্বিত করা।

(খ) কোনো একটি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত অধ্যায়ের সঙ্গে অন্য একটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত অধ্যায়কে সংগীতের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করা। যেমন – অষ্টম শ্রেণির বাংলা বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত ‘সত্যি সোনা’ গল্পটির সঙ্গে পরিবেশ বিজ্ঞানের কোনো অধ্যায়কে সংগীতের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করা; আবার প্রথম শ্রেণির গণিত বিষয়ের নামতা শিক্ষাকে কেন্দ্র করে এক এক্কে এক – ছড়াটি সুরে সুরে সম্পৃক্ত করা; আবার সপ্তম শ্রেণির বাংলা পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত ‘একুশের তাৎপর্য’ – বিষয়টিকে ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে ইতিহাসের সঙ্গে সংগীত দ্বারা সমন্বিত করা। এখানে ‘নানান দেশের নানান ভাষা’ এই গানটি ব্যবহার করা হয়েছে।

আবার ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ‘শহিদ যতীন্দ্রনাথ দাস’ অধ্যায়টির সঙ্গে ইতিহাস বিষয়ের সমন্বয়সাধন করা হয়েছে ‘‘উঠো গো ভারতলক্ষ্মী’ – এই গানটির মাধ্যমে।

এসব বিষয় নির্বাচন ও গান নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ধারণা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিষয়কে সংগীতের মাধ্যমে সমন্বিত করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই একক (Unit)-এর উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ —

- প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সহজবোধ্য করে তোলা।
- সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল কাজে আত্মনিয়োগ করানো।
- চিন্তন ও মননের কাজে উৎসাহিত করা।
- শিশুর শিখনে প্রেষণা সঞ্চার করে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির হার নিয়ন্ত্রণ করা।
- পুঁথিগত বিদ্যা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে নিজেকে উপস্থাপন করার অভ্যাস তৈরি করা।
- শ্রেণিকক্ষের পঠন পরিবেশের গতানুগতিক একঘেয়েমি দূর করা।
- পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে প্রবেশ করার ধারণা তৈরি করা।
- শিক্ষার্থীদেরকে বিষয়গত সুস্পষ্ট ধারণা দান করা।

বিষয় (Content)

৩.১ সংগীতের সমন্বয়ে পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপস্থাপন

যে-কোনো পাঠক্রমে সহজ ও বোধগম্য করে তোলার জন্য মাধ্যম হিসাবে সংগীতের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমাদের সংগীত পাঠক্রমে এই অধ্যায়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রমের অন্যান্য বিষয়গুলি বলতে বোঝায় — বাংলা, ইংরাজি, গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি। এইসব বিষয়গুলির সঙ্গে সংগীতকে সমন্বয়সাধন করে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও আনন্দদায়ক ও সহজবোধ্য করে তোলাই এই এককের লক্ষ্য।

উদাহরণস্বরূপ – নিম্নে কয়েকটি বিষয়কে সংগীতের মাধ্যমে সমন্বয়সাধন করা হল, — প্রজেক্ট ওয়ার্কের মাধ্যমে।

উদা ঃ 1. ‘‘এক এক্কে এক, দুই এক্কে দুই.....’’ সনৎ সিংহের এই ছড়াগানটি ‘ব্ল্যাকবোর্ড ও চক’ ব্যবহারের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এখানে ছড়াগানের সঙ্গে গণিতের ‘নামতা’ শিক্ষার সমন্বয়সাধন করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে গান ছাড়াও শিক্ষিকা বা শিক্ষক কাজী নজরুল ইসলাম রচিত একটি মজার ছড়া ‘এক একে এক’ ব্যবহার করতে পারেন যা নিম্নরূপ –

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এসে প্রথমে শ্রেণিবিন্যাস ও কুশলাদি বিনিময় করে পাঠ ঘোষণা করবেন। এই সময় শিক্ষক নামতা শেখাবার কথাটি ব্যবহার না করে যদি ছড়াগান শেখাবার কথাটি বলেন, তাহলে শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি উৎসাহিত হবে। তাই শিক্ষক চক এবং ব্ল্যাকবোর্ডের সাহায্যে ছড়ার সুরে সুরে গানটি গাইবেন এবং বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকের সঙ্গে গাইবে। এরপর বোর্ডের লেখা দেখে শিক্ষার্থীরা নিজেদের খাতায় সংখ্যা সহযোগে ‘এক এক্কে এক’ গানটি গেয়ে গেয়ে লিখবে। কয়েকবার পরিষ্কার উচ্চারণের মাধ্যমে ছড়াগানটি শিক্ষকের সহযোগিতায় শিক্ষার্থীরা গাইবে।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ছড়া তৈরি করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব মনোভাব ও কল্পনাশক্তির দ্বারা কিছু ছড়ার লাইন তৈরি করতে পারবে এবং গান করে গাইতে পারবে।

এই ধরনের শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে একদিকে যেমন শিক্ষার্থী সংখ্যা লেখা ও বলার অভ্যাস করতে পারবে তেমনি অন্যদিকে নিজের চেষ্টায় সৃষ্টিশীল কাজে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হবে।

উদা ঃ 2. তৃতীয় শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকে সংযোজিত ‘‘সত্যি সোনা’’ নামক প্রচলিত গল্পটিকে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। উল্লিখিত গল্পটি সম্পূর্ণ চাষাবাদ সংক্রান্ত ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং, এই গল্পটি পাঠের মাধ্যমে **বাংলা বিষয়ের সঙ্গে পরিবেশ** বিষয়ক ধারণার সমন্বয়সাধন করা সম্ভব। এই সমন্বয়সাধনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত আমরা ‘‘চাষ করি আনন্দে’’ গানটিকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এখানে ‘চার্ট সহযোগে চিত্রায়ন’ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলা বিষয়ভুক্ত গল্পটির সঙ্গে পরিবেশ বিজ্ঞানকে সংযুক্ত করা হয়েছে। যেমন — প্রথমে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শ্রেণিবিন্যাস ও কুশলাদি বিনিময়ের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের জড়তা দূর করবেন। তারপর পাঠ ঘোষণা করে কিছু ছোটো ছোটো প্রশ্ন করবেন। যেমন —

১. কোথায় চাষ করা হয়?

২. চাষের সময় কী কী ব্যবহার করা হয়? ইত্যাদি।

এরপর শিক্ষক কয়েকটি জমি চাষ বাসের ছবিযুক্ত বড়ো চার্ট শিক্ষার্থীদের দেখাবেন ও পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করে কিছু মৌখিক আলোচনা করবেন এবং শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনবে। এরপর শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘আমরা চাষ করি আনন্দে’ – এই গানটির উল্লেখ করে শেখবার কথা বলবেন। শিক্ষক গানটি গেয়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে গানটি কয়েকবার গাইবে।

এরপর শিক্ষক চাষাবাদ সংক্রান্ত অন্য কোনো গান সম্পর্কে জানতে চাইবেন এবং উক্ত বিষয়ের সঙ্গে মিল করে অন্য আরও গানের কথা ভাবতে ও লিখতে বলবেন। শিক্ষার্থীকে নতুন ভাবনাযুক্ত গান লিখতে ও গাইতে শিক্ষক সহযোগিতা করবেন।

এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার ফলে শিক্ষার্থীরা গানের মাধ্যমে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হবে এবং নতুন গান ও কবিতা সৃষ্টির কাজে উৎসাহিত হবে।

উদা ঃ 3. এবার দেখা যাক, **ইতিহাস** বিষয়টির সাথে সংগীতকে কীভাবে সংযোগ স্থাপন করা যায় –

এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত ‘অতীত ও ঐতিহ্য’ নামক গ্রন্থটির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এই গ্রন্থে উল্লিখিত ঐতিহাসিক নানা মুহূর্তের ঘটনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন – ‘মাৎস্যন্যায়’ যুগের ঘটনা, পাল ও সেন বংশের রাজাদের শাসনকাল ইত্যাদি। এ সমস্ত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আমরা পাই রাজাদের শাসনকাল, বিভিন্ন আন্দোলনের ঘটনাসমূহ। এসব বিষয়গুলি সংগীতের মাধ্যমে সমন্বয়সাধন করে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে, – ‘‘আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে’’, ‘‘চল রে চল সবে

ভারত সন্তান" ....প্রভৃতি গান ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার, বাংলা বিষয়ের কোনো ঐতিহাসিক তথ্যকে অবলম্বন করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংগীতের প্রয়োগ করতে পারি 'Power Point Presentation'-এর মাধ্যমে।

উদা : 4. সপ্তম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত 'একুশের তাৎপর্য' এই অধ্যায়ের আলোচনার সঙ্গে **মাতৃভাষা আন্দোলনের** প্রেক্ষাপট জড়িয়ে আছে। সারা বিশ্বের নানা ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির মধ্যে এই আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছিল। কারণ 1952 সালে সংগঠিত বর্তমান বাংলাদেশের সমগ্র ছাত্রসমাজে তাঁদের মাতৃভাষা "বাংলা"-কে রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করার দাবিতে এই আন্দোলন গড়ে তুলেছিল এবং সফল হয়েছিল। সমগ্র ছাত্রসমাজ তাদের জীবনের বিনিময়ে আদায় করে নিয়েছিল মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার। দিনটি ছিল 1952 সালের 21 শে ফেব্রুয়ারি। পরবর্তীকালে দিনটি "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসাবে স্বীকৃতি দেয় 1999-এর 17 ই নভেম্বর UNESCO। 21 শে ফেব্রুয়ারি তখন থেকে সারা বিশ্বের কাছে দিনটি অন্যভাবে সমাদৃত।

এখানে বাংলা পাঠ্যপুস্তকের এই অধ্যায়টিকে ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে 'নানান দেশে নানান ভাষা' – রামনিধি গুপ্ত রচিত এই গানটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

● এছাড়া মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বোধ তৈরি করার জন্য 'মোদের গরব, মোদের আশা' গানটি শিক্ষিকা গেয়ে বা বাজিয়ে শোনাতে পারেন।

ভাষা আন্দোলন কে আরও স্পষ্টভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপনের জন্য 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো গানটিও ব্যবহার করা যেতে পারে। উল্লিখিত ভাষা আন্দোলনের বিষয়টি 'Power Point Presentation'-এর মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করা যেতে পারে। সেটি নিম্নরূপ –

শিক্ষকের কাজ – এই ধরনের উপস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রথমে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শ্রেণিবিন্যাস ও কুশলাদি বিনিময় করে নেবেন। তারপর পাঠ্যবিষয়ে মনঃসংযোগ করানোর জন্য বিষয়বস্তু সংক্রান্ত ছোটো ছোটো প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠ ঘোষণা করবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে প্রাথমিক ধারণা দেবেন। যেমন –

ভারতবর্ষে সংগঠিত কোন্ কোন্ ধরনের আন্দোলনের কথা জানো?

ভাষা আন্দোলনের সম্পর্কে তোমরা কী জানো? .... ইত্যাদি

এসব প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে কিছু তথ্য আলোচিত হবে। এরপর শিক্ষক ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নিয়ে শিক্ষার্থীদের গল্প আকারে বলবেন এবং সাথে সাথে Power Point Presentation-এর মাধ্যমে কিছু পোস্টার, স্লোগান, মিছিলের ছবি দেখাবেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই পোস্টারগুলি বা স্লোগানের ভাষা 'মাতৃভাষা আন্দোলন' সংক্রান্ত হতে হবে। উক্ত বিষয়ে ছবি প্রদর্শনের পর শিক্ষক মাতৃভাষা সংক্রান্ত কিছু গানের কথা শিক্ষার্থীদেরকে জানাবেন এবং 'নানান দেশের নানান ভাষা' এই গানটি শেখাবেন।

এবার শিক্ষার্থীদের Project work হিসাবে যেগুলি দেওয়া যেতে পারে—

- ভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত পোস্টার প্রস্তুতি, যেটিকে তথ্যপঞ্জী হিসাবে ব্যবহার করা যায়।
- ভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত স্লোগান নির্মাণ।
- ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক গান, কবিতা, নাটকের তালিকা প্রস্তুত।
- ভাষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছবি ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতির সম্বলিত চার্ট।

পূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'প্রজেক্ট ওয়ার্ক' তৈরি করা ও শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করা ছাড়াও আরও কিছু তথ্য শিক্ষার্থীদের চিন্তন প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করার জন্য যুক্ত করা হল —

উদা : 5. ষষ্ঠ শ্রেণির 'আমাদের পৃথিবী' পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত 'ভারতীয় জলবায়ু' অধ্যায়ের অন্তর্গত 'মৌসুমি বায়ুর প্রভাব' – ঋতু বৈচিত্র্যের ধারণা প্রসঙ্গে আমরা গরমকাল, বর্ষাকাল, শরৎকাল ও শীতকাল – এসব ঋতুর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানতে আমরা সংগীতের ব্যবহার করতে পারি। যেমন – গরমকালের গানের ক্ষেত্রে –

“দারুণ অগ্নি বাণে রে ....” — রবীন্দ্রসংগীত

বর্ষাকালের ক্ষেত্রে

“আকাশতলে দলে দলে.......” — রবীন্দ্রসংগীত

শরৎকালের ক্ষেত্রে

“মেঘের কোলে রোদ হেসেছে........” — রবীন্দ্রসংগীত

হেমন্তকালের ক্ষেত্রে

‘হিমের রাতের ওই গগনের’

শীতকালের ক্ষেত্রে

“এল সে শীতের বেলা........” — রবীন্দ্রসংগীত ইত্যাদি।

বসন্তকালের ক্ষেত্রে—

‘নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন’

এই গানগুলির মধ্যে শিক্ষার্থী যে-কোনো একটিকে প্রজেক্ট ওয়ার্কের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।

উদা : 6.অষ্টম শ্রেণির ‘পরিবেশ ও বিজ্ঞান’ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত ‘অন্তক্ষরা তন্ত্র ও বয়ঃসন্ধি’ – এই অধ্যায়টি পড়ানোর জন্য বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যগুলিকে আলোকপাত করার ক্ষেত্রে সংগীতের ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন –

“মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্যাম...........” – কাজী নজরুল ইসলাম

“আমরা নূতন যৌবনেরই দূত ....” – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব

এই গানদুটির মধ্যে যে-কোনো একটি গান শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে প্রজেক্ট ওয়ার্কের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।

উদা : 7. পঞ্চম শ্রেণির ‘আমাদের পরিবেশ’ নামক পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত ‘মানবাধিকার ও মূল্যবোধ’ অধ্যায়টিতে আমরা মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্য সংগীতের প্রয়োগ করতে পারি। যেমন –

“মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ..........” রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার্থীরা Project Work-এর মাধ্যমে এই গানটিকে উপস্থাপন করবে।

উদা : 8. পঞ্চম শ্রেণির ‘আমাদের পরিবেশ’ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত ‘পরিবেশ ও সম্পদ’ অধ্যায়টিতে ‘স্মরণীয় যাঁরা’ বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বরেণ্য ব্যক্তিদের স্মরণ করার জন্য সংগীতের ব্যবহার করতে পারি। যেমন –

বন্দেমাতরম্ .... বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হে নূতন .... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মোদের গরব .... অতুলপ্রসাদ সেন

উদা : 9.ষষ্ঠ শ্রেণির ইংরাজি পাঠক্রমের ‘Santiniketan’ অধ্যায়টি পড়াবার সময় শিক্ষিকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘আমাদের শান্তিনিকেতন’ গানটি শিক্ষার্থীদের প্রথমেই শুনিয়ে মনযোগ আকর্ষণ প্রেষণা সঞ্চারের পাশাপাশি তথ্য ও ধারণা গঠনের প্রদীপন হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে Direct Method of Teaching English বর্তমান পাঠক্রমের নির্দেশিত হলেও এই গানটি ব্যবহার করা যেতে পারে এই কারণে যে এই গানটির মাধ্যমে উপরিলিখিত শিখনের অনেকগুলি দিক সুন্দর, সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহার করা যায়।

উদা : 10. ষষ্ঠ শ্রেণির ‘আমাদের পৃথিবী’, অর্থাৎ **ভূগোল বিষয়ের** ‘আমাদের দেশ ভারত’ পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ প্রেষণা সঞ্চার, তথ্য ও ধারণা গঠনের জন্য শিক্ষিকা ‘অয়ি ভুবনমনমোহিনী’ গানটি ব্যবহার করতে পারেন—এই গানে সুন্দরভাবে ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক অবস্থান বিবৃত।

উদা : 11. সপ্তম শ্রেণির ‘জাতের বজ্জাতি’ গানটির প্রেষিত ও মূল্যায়ণের জন্য কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ‘মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম’ — এই গানটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

উদা : 12. প্রথম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের অ, আ পাঠের সময় Teaching Aid হিসাবে কিশোর কুমার গীত ‘অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে’...এই গানটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

উদা : 13. আবার বিভিন্ন বিষয়ে দিবস পালনের ক্ষেত্রে আমরা যেসব সংগীত ব্যবহার করতে পারি, তা নিম্নরূপ —

‘মুক্তির মন্দির সোপানতলে’ .... মোহিনী চৌধুরী (স্বাধীনতা দিবস)

‘হও ধরমেতে ধীর’ .... অতুলপ্রসাদ সেন (স্বাধীনতা দিবস)

‘চল চল চল’ .... কাজী নজরুল ইসলাম (স্বাধীনতা দিবস)

‘মোদের গরব মোদের আশা’ .... অতুলপ্রসাদ সেন (ভাষা দিবস)

‘আমি বাংলায় গান গাই’ .... কথা ও সুর ঃ প্রতুল মুখোপাধ্যায় (ভাষা দিবস)

‘তোমার আসন শূণ্য আজি’ .... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (নেতাজী জন্মদিবস)

এসব সংগীতগুলি গীতিআলেখ্য রচনা করেও শিক্ষার্থীরা প্রজেক্ট ওয়ার্কের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।

উপসংহার (Conclusion) – এই অধ্যায়ে বিষয়ভুক্ত প্রজেক্ট ওয়ার্ক প্রক্রিয়ায় শিক্ষাগ্রহণের ফলে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীরা পরিপূর্ণ শিক্ষা লাভ করবে, অন্যদিকে সংগীত সৃষ্টির ক্ষেত্রেও চিন্তাশক্তির ব্যবহার করে সৃষ্টিশীল কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবে। এছাড়াও সমাজের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক কর্মে অংশগ্রহণ করে সফলতা অর্জন করবে।

৩.২ অনুশীলনী (Exercise) –

১. যে-কোনো শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকের যে-কোনো একটি অধ্যায়কে সংগীতের সঙ্গে সংযোগসাধন করো।

২. গণিতের যে-কোনো ধারণাকে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে সহায়ক হিসাবে ছড়ার গানকে সমন্বিত করো।

৩. ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত ‘‘শহীদ যতীন্দ্রনাথ দাশ’’ অধ্যায়টি কীভাবে ইতিহাসের সঙ্গে সংগীতের মাধ্যমে সমন্বয় করবে?

অধ্যায়

৪

নাটকের মাধ্যমে লেখাপড়া

সূচনা ঃ

গোটা পৃথিবী জুড়েই দীর্ঘকাল ধরে পড়াশোনাকে কী ভাবে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তাই নিয়ে ভাবনা চিন্তা হচ্ছে। পণ্ডিত মানুষেরা প্রায় একবাক্যে বলেছেন, পড়াশোনার সঙ্গে দুটি বিষয়ের সংযোগ তৈরি করা জরুরি, এক জীবন আর দুই আনন্দ। অর্থাৎ, ছাত্রটি যা পড়ল, তার সঙ্গে যদি তার জীবন থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতার কোনো সম্পর্ক না থাকে, তাহলে সেই পড়াশোনা বাইরের পলেস্তারা হয়েই থেকে যাবে, নিজের জীবনকে, নিজের চারপাশকে বোঝার ক্ষেত্রে কোনো সাহায্য করবে না। ঠিক তেমনি, পড়াশোনা কোনো নীরস ব্যাপার নয়, তার ভেতর থেকেও আনন্দ পাওয়া সম্ভব, এই কথা ছাত্র বা ছাত্রীটিকে বোঝাতে হবে। কাজটা সহজ নয়। পড়াশোনা আসলে বাধ্যতা, নম্বর পাওয়া বা পাস করবার তেতো বড়ি— অনেক বছর ধরে, পুরুষানুক্রমে এই বিশ্বাস আমাদের সংস্কারের মধ্যে ঢুকে আছে। তার বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের বার করে নিয়ে আসতে গেলে পালটাতে হবে ছাত্র-শিক্ষকের সেই সম্পর্ক, যেখানে মাস্টারমশাই উঁচুতলা থেকে ছাত্রের দিকে জ্ঞান ছুঁড়ে দেন, ছাত্রটি তার অঞ্জলি পেতে সে জ্ঞান গ্রহণ করে। কতটা নিতে পারল তার ওপর নির্ভর করে সে ভালো ছাত্র না খারাপ তার মূল্যায়ন। ভাবা হচ্ছে, ছাত্রটিকেও সক্রিয় (active) করে তুলতে হবে, সে যাতে নিজের মতো করে শিক্ষার বিষয় থেকে আনন্দ পেতে পারে এবং সে যেন তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার পড়াশোনাকে মিলিয়ে দিতে পারে। এই চিন্তা থেকেই থিয়েটারের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার পরিকল্পনা।

উদ্দেশ্য ঃ

যাকে বলি নাট্য, তার মধ্যে একসঙ্গে মিশেছে সাহিত্য, নানা ধরনের শিল্পকলা, চারপাশের পৃথিবীকে অনুভব করার এবং ব্যাখ্যা করার বিবিধ উপকরণ। এইসব উপকরণের সমবায় দিয়ে যদি ক্লাসরুমে ছাত্রছাত্রীদের মুখোমুখি হওয়া যায়, তবে পাঠ্য বিষয় তাদের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। সে কাজ করতে গেলে ভাবী শিক্ষককে পরিচিত হতে হবে নাট্যের ভাষার সঙ্গে, অন্তত প্রাথমিকভাবে। এই পরিচিতিটুকু ঘটানোই এ আলোচনার উদ্দেশ্য।

১.১ নাটক আর মঞ্চ সম্পর্কে ধারণা

এবার অল্প কথায় বুঝে নেওয়া যাক থিয়েটার বা নাট্য কাকে বলে, লেখাপড়ার সঙ্গে তার সম্পর্কই বা আমরা গড়ে তুলব কী ভাবে। সারা পৃথিবীর নাটকের ছাত্ররা যাঁর নামে মাথা নিচু করে সেই বিখ্যাত পরিচালক এবং নাট্যতত্ত্ববিদ্ পিটার ব্রুকের একটি বিখ্যাত কথা হল, I can take any empty space and call it a bare stage. A man walks accross this empty space whilst someone else is watching him, and this is all that is needed for an act of theatre to be engaged. তাহলে বলতে পারি, থিয়েটার করতে আর কিছু লাগে না, শুধু কমপক্ষে একজন আর বেশি পক্ষে কয়েকজন অভিনেতা লাগে, যাঁরা কোনো একটা জায়গায় (ইংরেজিতে যাকে বলা যেতে পারে Theatre Space) কিছু করবেন আর একজন বা কয়েকজন দর্শক তা দেখবেন। ভেবে দেখুন, এই জায়গাটা হতে পারে অ্যাকাডেমি, মধুসূদন মঞ্চ, গিরিশমঞ্চের মতো জায়গা, আবার হতে পারে গ্রামের আটচালা, রাস্তার মোড়, ক্লাসরুমই বা নয় কেন? সেখানে শিক্ষক নিজে অভিনয় করে ছাত্রদের দেখাতে পারেন, আবার কয়েকজন ছাত্রকে দিয়ে অভিনয় করিয়ে বাকিদের দেখাতে পারেন। ক্লাসের সব কজন ছাত্র অভিনয় করল আর দেখলেন স্কুলের অন্য মাস্টারমশাই বা ছাত্রদের তাতেও আপত্তি নেই। অভিনয় করানো যেতে পারে পাঠ্য বিষয়ের থেকে বেছে নিয়ে। অভিনয় দেখতে দেখতে, করতে করতে ক্লাসের পড়া আর তার কাছে নীরস থাকবে না, যদি ইতিহাসের পড়া নিয়ে নাটক হয়, তাহলে সেই ছাত্র বা ছাত্রীটি হয়ে উঠবে ইতিহাসের বিশেষ ঘটনার একটা অংশ। সেই বিশেষ চরিত্র বা অন্য চরিত্রগুলোকে সে কল্পনা করতে পারবে, বুঝতে পারবে তার অনুভব দিয়ে, কেবলমাত্র মুখস্ত বিদ্যা দিয়ে নয়। এর জন্যে যে নানা আয়োজনের দরকার আছে এমন ভাববার কোনো কারণ নেই।

নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হল, নাটক একটা ধরে নেওয়ার জগৎ তৈরি করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *রঙ্গমঞ্চ* প্রবন্ধে বলেছিলেন, ''বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হইবে...এইরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতি বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।'' তাই ক্লাসরুমের চেয়ারটাই হয়ে যেতে পারে ময়ূর সিংহাসন, বেঞ্চিগুলোকে সার সার খাড়া দাঁড় করিয়ে দিলে জঙ্গল বা নগর বোঝাতে কোনো অসুবিধা হয় না। ওড়নার দু প্রান্ত দুজনে ধরে দোলালে চমৎকার নদী হয়ে বয়ে যাওয়া সম্ভব। বড়োরাও এইসব সিংহাসন, জঙ্গল বা নদীকে বিশ্বাস করবেন, ছোটোরা তো করবেই। তাদের বিশ্বাস করার ক্ষমতা যে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি তা তো তাদের পুতুলের বিয়ে দেওয়া দেখেই বুঝতে পারা যায়। সে বিশ্বাস করার ক্ষমতা বা কল্পনাশক্তিকে বাড়িয়ে তোলাও কি শিক্ষক হিসেবে আমাদের প্রধান দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না?

অভিনয়ের জন্যে অবশ্য ছোটোখাটো জিনিসপত্র কিছু লাগতেই পারে। যেমন তরোয়াল, মুকুট, আরো নানা এটা সেটা। আবার, গানের সুর, নাচের ভঙ্গিও তো অভিনয়ের কাজে লাগে। সেগুলোও ছাত্রদের যার যেমন ইচ্ছে তেমনি করে বানাতে পারে, নিজেরা কিছু তৈরি করবার আনন্দ পাবে ছেলেমেয়েরা, সেই পথে অভিনয়ের বাইরেও নানা ধরনের সৃজনক্ষমতা বাড়বে। থিয়েটারের মাধ্যমে লেখাপড়া শেখানোর আরো একটি সামাজিক সুবিধা আছে। শিশুরা অনেকেই আসে ছোটো পরিবার থেকে, একা একা বড়ো হয়। এর ফলে যে তারা অনেক সময়েই আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর হয়ে ওঠে তা আমরা সকলেই দেখতে পাচ্ছি। থিয়েটারের মতো যৌথ শিল্পের প্রয়োজন এই সমাজে তাই অত্যন্ত বেশি, যেখানে সমবয়সী অনেকে মিলে নাটক দেখা বা করার মধ্যে দিয়ে তাদের সামাজিকীকরণ সহজ হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নাটক কাকে বলে? সোজা কথায়, অভিনয় করবার জন্য যে সাহিত্য রচিত হয় তাকে বলে নাটক। নাটক লিখিত সাহিত্য হতে পারে, যেমন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক নাটক লিখেছেন। আবার নাটক মুখে মুখেও তৈরি হতে পারে। লোকনাট্যে এমন অনেক নাটকের উদাহরণ পাওয়া যাবে। ক্লাসরুমে যে নাটক করা হবে, তা নিশ্চয় কেউ আগে থাকতে বানিয়ে তার মহলা দিয়ে তৈরি করতে পারেন, আবার সে নাটক ছাত্র মাস্টারমশাই সবাই মিলে তাৎক্ষণিকভাবে গড়ে তুললেন এমনটাও অসম্ভব নয়। সে সব কায়দা নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে, আপাতত নাটকের ইতিহাস বিষয়ে খুব ওপর ওপর দু-একটা কথা একটু বলে নেওয়া যাক।

নাটকের শুরু কবে? বলা খুব কঠিন আদিম যুগে মানুষ থাকত গুহায়, সবাই মিলে শিকার করে খেত। এমনটা তো খুবই সম্ভব, শিকার করে ফিরে এসে তারা কেমন করে জন্তুটাকে মারল তার বিবরণ দিত গুহায় বসে থাকা বৃদ্ধ নারী আর শিশুদের কাছে। এখন, বর্ণনা দিতে দিতে মানুষ তো একটু অভিনয় করেই ফেলে, কেমন করে বল্লম ছুঁড়লাম বলতে গিয়ে হাতটা বল্লম ছোঁড়ার ভঙ্গি করে, জন্তুটা কেমন আর্ত চিৎকার করে পড়ে গেল সেটা বোঝাতে গিয়ে হয়ত সত্যি সত্যি আর্ত চিৎকার করে পড়ে যেতে পারে। পণ্ডিতেরা বলেন এখান থেকেই নাটক অভিনয়ের শুরু। রীতিমতো নাটক বলতে যা বোঝায় তার ইতিহাস বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়, আমরা শুধু সংক্ষেপে লাফ দিয়ে দিয়ে দরকারি পর্বগুলোকে সামনে আনবার চেষ্টা করি।

প্রথম অভিনয়ের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে ইজিপ্টে, খ্রিষ্টপূর্ব ২৪০০-২৩০০ সাল নাগাদ। খ্রিষ্ট জন্মাবার সাড়ে পাঁচশো থেকে সাড়ে তিনশো বছর আগে গ্রিসে নাট্যাভিনয়ের চল ছিল, বিশ্বসাহিত্যের খুব বড়ো বড়ো মাপের নাটক লেখা হয়েছে এস্কাইলাস, ইউরিপিডিস সফোক্লিস ও অ্যারিস্টোফিনিসদের হাতে। শস্য আর ফসলের দেবতা ডায়নিসাস-এর পুজো উপলক্ষে রীতিমত নাটকের প্রতিযোগিতা হত। পাহাড় কেটে গ্যালারি করে তার নিচের চত্বরে অভিনয় হত, দেখত প্রায় সতেরো থেকে কুড়ি হাজার দর্শক। বোঝাই যাচ্ছে চিৎকার করে অভিনয় করতে হত, দূর থেকে যাতে দেখা যায় তার জন্যে অভিনেতারা পরতেন লম্বা ঝুলের আলখাল্লা আর হাঁটু পর্যন্ত জুতো, মুখে লাগানো থাকত কৃত্রিম উপায়ে আওয়াজ বাড়াবার যন্ত্র। মূল মঞ্চটা ছিল আয়তক্ষেত্রের মতো। তাকে বলত স্কেন (Skene)। পরে এটা সামনের দিকে একটু বাড়িয়ে দেওয়া হল, সেই জায়গাটার নাম দেওয়া হল Proskenion। তার সামনে একটা গোল জায়গাকে বলা হত অর্কেস্ট্রা (Orchestra)। অর্কেস্ট্রা বললেই গান বাজনার কথা মনে পড়ে, গ্রিক নাটকের অর্কেস্ট্রাতে বসে বা দাঁড়িয়ে কোরাসের লোকেরা একসঙ্গে গান গাইত, সকলে মিলে একসঙ্গে অভিনয় করত।

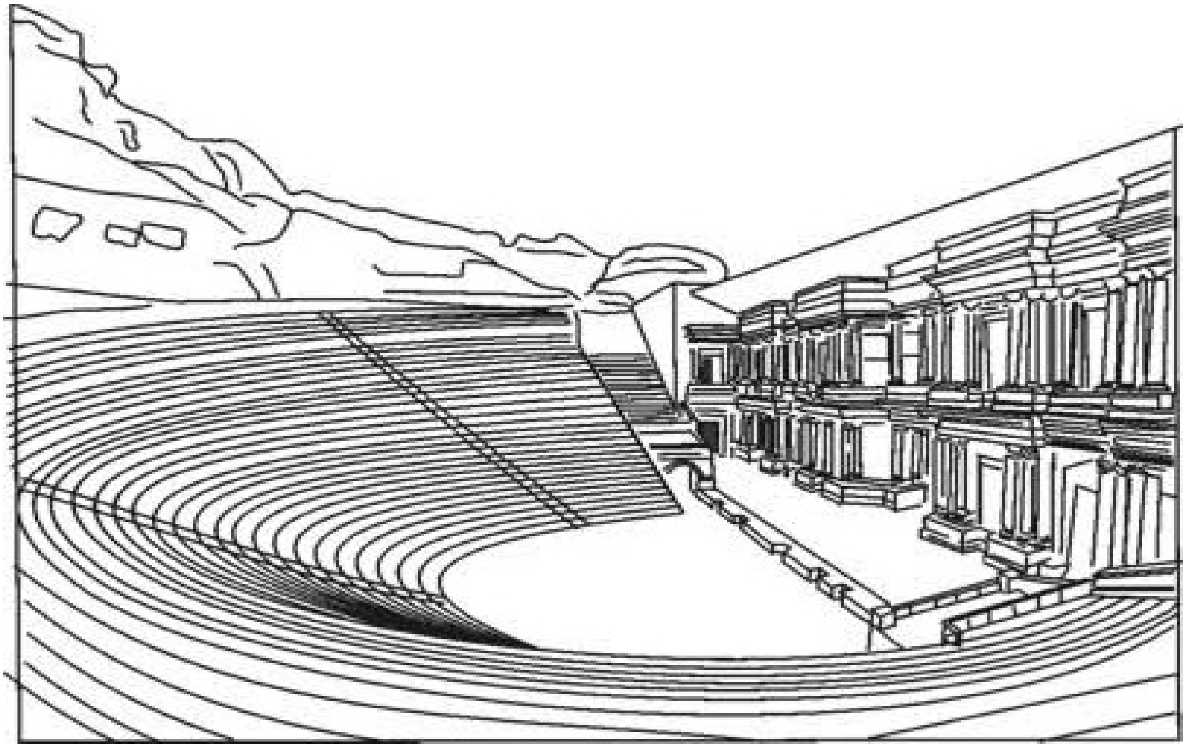

প্রাচীন গ্রীক মঞ্চের ছবি

এরপরে এল রোমান থিয়েটারের যুগ। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় থেকে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত রোমে বা ইতালির অন্য সব বড়ো শহরে নাটক অভিনীত হত। এর ধরনটা ছিল কিছুটা গ্রিক মঞ্চের মতই, তবে সেই স্কেন আর অর্কেস্ট্রা মিশে গিয়ে নাম হল prosenium। শব্দটা জেনে রাখা জরুরি, কারণ এখন আমরা সাধারণত যে সব নাটক দেখি, অ্যাকাডেমি, শিশির মঞ্চ, গিরিশ মঞ্চ ইত্যাদিতে, সেগুলো হল এই প্রসিনিয়ম থিয়েটার। যাক গে, ইতিহাসের কথায় আসি। মঞ্চের পেছনে থাকত সাজঘর, সেখান থেকে নানা রাস্তা ধরে মঞ্চে আসা-যাওয়া করতে হত। অভিনয় হত দিনের আলোয়। দর্শক হত হাজার তিনেকের মতো। এরপর লম্বা একটা সময় পার হয়ে আমরা চলে আসি শেক্সপীয়রের আমলে, অর্থাৎ মোটের ওপর ষোড়শ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে। সেখানে টেম্স নদীর ধারে গড়ে উঠেছিল বেশ কিছু প্রেক্ষাগৃহ, গ্লোব থিয়েটার, ফরচুন থিয়েটার এইরকম সব ছিল থিয়েটার বাড়ির নাম। গ্রিক বা রোমান প্রসেনিয়ম এখন চেহারায় বড়ো হয়ে গেছে। মঞ্চের পেছন দিকে একটা দোতলা বারান্দা থাকত, সেখানেও অভিনয় হত। রোমিও জুলিয়েটের ব্যালকনি দৃশ্য খুব বিখ্যাত, সেখানে এই দোতলার বারান্দাটা ব্যবহার করা হত। সেই দোতলার বারান্দার থাম নিচে নেমে আসত মঞ্চের ওপরে। মূল মঞ্চের সামনের একটা অংশ লম্বা হয়ে চলে আসত দর্শকের মধ্যে। দর্শকের সংখ্যা অনেকটাই কমে গেছে, তাই অভিনয় অনেক স্বাভাবিক হয়ে এল, রূপসজ্জাতেও এল স্বাভাবিকত্ব। এই পথ ধরেই আজ পর্যন্ত থিয়েটার নানা ধারায় এগিয়ে চলেছে।

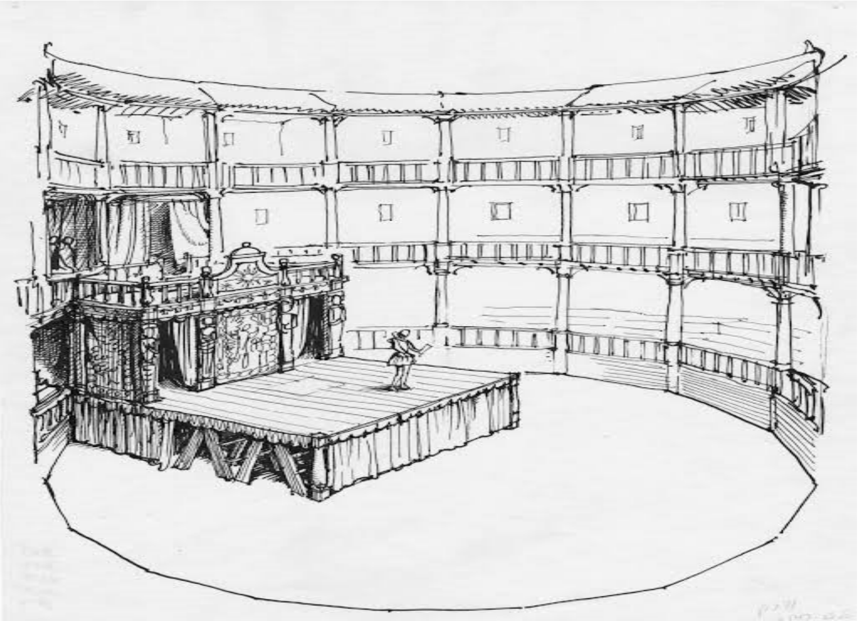

শেক্সপীয়ারের সমকালীন মঞ্চের ছবি

এতক্ষণ য়ুরোপের মঞ্চ নিয়ে কথা বলা হল, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের দেশে, এই ভারতবর্ষেও কিন্তু থিয়েটারের চল ছিল। যে প্রথম ভারতীয় নাট্যকারের লেখা নাটক আমাদের হাতে এসেছে তাঁর নাম ভাস। পণ্ডিতেরা অনুসন্ধান করে দেখেছেন, তিনি খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মানুষ, অর্থাৎ প্রাচীন গ্রিক নাট্যকারদের সমবয়সী। তিনি ছাড়াও কালিদাস, দণ্ডী, বিশাখদত্ত, শূদ্রক প্রমুখ বহু নাট্যকারের নাম করা যায়। নাটক আর অভিনয়ের তত্ত্ব নিয়ে ভরতমুনির একটি বই আছে 'নাট্যশাস্ত্র' নামে। সেখানে প্রাচীনকালে এ দেশে কেমন থিয়েটারবাড়ি তৈরি হত তার বিবরণ পাওয়া যায়।

তিন রকমের নাট্যগৃহের কথা বলা আছে সেখানে। একটা বর্গক্ষেত্র, মানে চারদিকটা সমান মাপের, তার নাম ছিল চতুরস্র; আয়তক্ষেত্র, মানে লম্বাটা যত বড়ো চওড়াটা তার অর্ধেক, তার নাম বিকৃষ্ট আর ত্রস্র মানে ত্রিভুজের মতো। এই তিন ধরনের প্রেক্ষাগৃহ আবার তিন রকম মাপের হত। সবচেয়ে বড়ো বা বিকৃষ্টজ্যেষ্ঠ চতুরস্র হল ১০৮×১০৮ হাত, তার চেয়ে ছোটো, মানে মধ্য চতুরস্র হল ৬৪×৬৪ হাত, আর সবচেয়ে ছোটো বা চতুরাস্রের মাপ ৩২×৩২ হাত। অন্য ধরনের প্রেক্ষাগৃহ গুলোও এই হিসেবেই তিন রকম মাপের হত। যেমন বিকৃষ্ট হত ১০৮×৬৪ হাত, তার চেয়ে ছোটোটা ১০৮×৩২ হাত, আর সবচেয়ে ছোটোটা ৬৪×৩২ হাত। ত্রস্র-য় আবার তিনটে বাহু ১০৮ হাত করে, নাম এস্রা জ্যেষ্ঠ, তার চেয়ে ছোটটা ৬৪ হাত করে, আর তাকে বলা হত এশ্রমধ্য আর সবচেয়ে ছোটোটার এশ্রায়ব তিনটে বাহুই ৩২ হাত করে।

আমরা যে থিয়েটারের কথা এতক্ষণ ধরে বললাম, লক্ষ্য করে দেখুন, সেখানে নাটকটা হচ্ছে দর্শকের সামনে, ছবির ফ্রেমের মতো একটা আয়তাকার জায়গায়। তাই এই ধরনের থিয়েটারকে যেমন Proscenium Stage বলা হয়, তেমনি আবার Picture Framed Stage-ও বলে। এর বাইরে আরো কিছু কিছু মঞ্চের কথা বলতে পারি। তার মধ্যে একটা হল Thrust theatre stage সেখানে তিনদিকে দর্শক বসে, মঞ্চটা যেন দর্শকদের মধ্যে খানিকটা এগিয়ে এসেছে। End Stage বলতে বোঝায় যে মঞ্চে কোনো উইং থাকে না, পেছনে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। Arena Stage-এ অভিনয় স্থানের চারদিকেই দর্শক বসতে পারেন। এমনটাও হতে পারে, পাটাতন সরিয়ে নিয়ে মঞ্চটা ইচ্ছেমতো তৈরি করে নেওয়া যায়, তাকে বলে Black Box বা Flexible Theatre। এছাড়াও আছে যেখানে দর্শক বসে অভিনেতার দু ধারে, হিসেব মতো তাদের অভিনেতাকে পাশ থেকে দেখার কথা। এর নাম Profile Theatre Stage। সুতরাং বলা যেতে পারে, যে কোনো জায়গাকেই কোনো না কোনো মঞ্চে পরিণত করা যায়। সুবিধে অনুযায়ী শিক্ষক মহাশয়ও ক্লাসঘরের ভেতরে বা বাইরে পাওয়া জায়গা অনুযায়ী তাই করতে পারেন।

১.২ লোকনাট্য ও মঞ্চ

যে কোনো শিল্প, তার মধ্যে সাহিত্য পড়তে পারে, নাটক পড়তে পারে, গান বাজনা ছবি আঁকা সবই পড়তে পারে, তাদের দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। একটা ভাগের নাম দিতে পারি প্রাতিষ্ঠানিক শিল্প, আর একটাকে বলা যেতে পারে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প। যদি থিয়েটারের উদাহরণ দিয়ে বুঝতে চাই, একটা ধরনের থিয়েটার হতে পারে যা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি হয়ে ওঠে, আর একটা ধরন তার বাইরে। এখন প্রশ্ন হল প্রতিষ্ঠান কি? যখন সমাজের বেশ কিছু ক্ষমতাশালী মানুষ, যাদের কথা আরো বহু মানুষ মেনে চলে, কিছু নিয়ম কানুন ঠিক করে দেয় এবং অন্যদের সেগুলো মানতে বাধ্য করে, তখন সেটা হয়ে ওঠে একটা প্রতিষ্ঠান। যেমন ধরুন, হাতের কাছেই উদাহরণ আছে, আমাদের এই শিক্ষাব্যবস্থা—এটাকে বলা যেতে পারে একটা প্রতিষ্ঠান। ঠিক তেমনি আইন হল প্রতিষ্ঠান, সরকার হল প্রতিষ্ঠান, ধর্ম হল প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ইত্যাদি। আর কোনো কোনো শিল্প তৈরি হতে পারে নিজেদের মনের খেয়ালে, ওই রকম সব প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম বিধির তোয়াক্কা না করে। এই নাম দুটো একটু অচেনা যদি মনে হয়, তাহলে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পের নাম হতে পারে নাগরিক বা পরিশীলিত শিল্প, আর অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পের নাম দেওয়া হল লোকশিল্প। নাগরিক শিল্পের পেছনে যেহেতু সমাজ বলুন, রাষ্ট্র বলুন এমন সব ক্ষমতাবানেরা আছেন, তাই সেই শিল্পের চর্চা যাঁরা করেন তাঁদের আমরা নাম বললেই চিনতে পারি, সোজা কথায় সমাজে তাঁদের নির্দিষ্ট ব্যক্তি পরিচয় আছে। এর উল্টোদিকে আছে লোকনাট্য। এইবার সে সম্পর্কে সামান্য দু-একটা কথা বলা দরকার।

লোক মানে কি সেটা আগে বুঝে নিই। লোকসাহিত্যকে ইংরেজিতে বলে Folk Literature, লোক নাট্যকে বলে Folk Theatre। Folk কথাটার অর্থ কী? অভিধান খুললে দেখা যাবে সাধারণ মানুষ, সামান্য মানুষ, যাদের আলাদা করে কোনো নিজস্ব পরিচয় নেই তাদের বলে Folk। শঙ্করাচার্য তো সোজাসুজি তাঁদের ইতর জন বলেছেন। আমরা নিশ্চয় অমন শব্দ ব্যবহার করব না, বরং এইভাবে বলতে পারি, এক একটি অঞ্চলে সংহত হয়ে থাকা সেই সব মানুষজন, সাধারণত নিরক্ষর, বাইরের বড়ো পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞান আবিষ্কার উদ্ভাবনের খবর তাঁদের কাছে খুব বেশি পৌঁছায় না। তাঁরা বেঁচে থাকেন তাঁদের নিজেদের গণ্ডিটুকুর মধ্যে, যুগ যুগ ধরে যে সব নিয়ম প্রথা বয়ে চলেছে তাতে মেনে নিয়ে। তাহলে, তাঁদের থিয়েটারে যুগ যুগ ধরে বয়ে আসা সেই সব নিয়ম প্রথার আধিপত্য চলবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অর্থাৎ, লোকসাধারণের দ্বারা অনুষ্ঠিত, লোকসাধারণের উপভোগের জন্য তৈরি এবং লোক জীবনের আখ্যান নিয়ে মৌখিক ভাবে গড়ে ওঠা নাটককে লোকনাট্য বলা যেতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক নাটক অভিনয়ের কিছু নির্দিষ্ট স্থান আছে। তা হতে পারে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের জন্যে তৈরি মঞ্চ, হতে পারে রাষ্ট্রের উদ্যোগে করা গ্রিক নাট্যাভিনয়ের উপযুক্ত অ্যামফিথিয়েটার। লোকনাটক কিন্তু যে কোনো জায়গাতেই অভিনীত হতে পারে, এমন কি নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে অভিনয় করতেও কোনো আপত্তি নেই। বস্তুত, বেশ কিছু লোকনাট্যের মধ্যে শোভাযাত্রা একটা বড়ো জায়গা জুড়ে থাকে, দর্শকও অভিনেতাদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। তার একটা বড়ো কারণ, লোকনাট্যের জন্ম হয়েছে কোনো না কোনো লোকদেবতার পুজো থেকে, আর এইসব পুজোর একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য শোভাযাত্রা। তাছাড়াও এই ধরনের নাট্যে বিবিধ প্রকার কৃত্য বা ritual মেনে চলার প্রবণতা দেখা যায়। প্রাতিষ্ঠানিক বা নাগরিক নাট্যের মতো এর রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। তার অন্যতম একটা কারণ হল, লোকনাট্য সাধারণত একজন মানুষের রচনা হয় না, অনেকের রচনা জুড়ে তৈরি হয়ে ওঠে। এমন কি, মঞ্চের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে অভিনেতারা নাটকের সংলাপ বা ঘটনা বানাতে থাকেন, আর এমনই সপ্রতিভ তাঁরা, একজনের আচমকা কোনো সংলাপ বা আচরণকে বুঝে নিয়ে তক্ষুনি তার সূত্র ধরে ঘটনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কোনো অসুবিধে হয় না। অবশ্য এ কথাও মনে রাখতে হবে, প্রাতিষ্ঠানিক বা পরিশীলিত নাটকের তুলনায় লোকনাটকের গড়ন অনেক ঢিলেঢালা, গল্পকে নিশ্ছিদ্র করে বাঁধতে হবে এমন দাবি তাঁদের দর্শক করেন না। অভিনয় করতে করতে দর্শকের সঙ্গে একটু কথা বলে নেওয়া যায় সেখানে, কখনো আবার সারা বছর কেমন কেটেছে তার বিবরণ ঢুকে যায় পালায়, গান থাকে খুব বেশি, যাতে নাটকের কথাগুলো সুরে ভর করে দর্শকের মনের মধ্যে সহজে ঢুকে যেতে পারে। নাগরিক নাটকের কিছু নির্দিষ্ট গঠনরীতি আছে, লোকনাট্য সে দিক থেকে অনেকটা স্বাধীন। কোনো দৃশ্যপট ব্যবহার করা হয় না, পোশাক অথবা রূপসজ্জাও হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে তৈরি হয়। মেয়েদের চরিত্রে ছেলেরা অভিনয় করে। কোনো কোনো লোকনাট্যে মুখোশ ব্যবহার করা হয়।

বলা বাহুল্য, সারা পৃথিবীতে অজস্র রকমের লোকনাট্য আছে। আমাদের পশ্চিমবাংলার কয়েকটি বিখ্যাত লোকনাট্য হল গম্ভীরা, আলকাপ, রায়বেঁশে, ভাঁড়যাত্রা, চোর চুন্নি পালা ইত্যাদি।

১.৩ একক অভিনয় আর সমবেত অভিনয়

‘নাটক আর মঞ্চ সম্পর্কে’ ধারণা দিতে গিয়ে ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছিল, এখন একটু বিস্তারিত করে বলে নেওয়া যাক অভিনয় কাকে বলে। একটা খুব চালু সংজ্ঞা আছে অভিনয়ের—A, B সেজে কিছু একটা করছে, আর C সেটা দেখছে। বোঝাই যাচ্ছে, এটা একেবারে প্রাথমিক সংজ্ঞা, কিন্তু আমাদের কাজ এতেই চলে যাবে। একজন মানুষ অন্য মানুষ সেজে তার মতো হাবভাব করে যখন কাউকে দেখায়, তখন তাকে আমরা অভিনয় বলতে পারি। ভেবে দেখুন, তাহলে কি আমরা সকলেই দিন রাত্তির অভিনয় করছি না? ক্লাসে গিয়ে ছাত্রের সামনে আমি যা, হেডমাস্টারমশাইয়ের সামনে ঠিক তা নই। আবার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ঠাট্টা মস্করার মেজাজে আমি যেমন, বাবা মা বা গুরুজনের সামনে তার থেকে কতই না আলাদা। চাকরির ইন্টারভিউ দেবার সময় যা যা করি, রাত্তিরবেলা টিভি দেখতে দেখতে কি তাই করি? ‘As You Like It’ নাটকে শেক্সপীয়রের বিখ্যাত কথা মনে পড়ে যায়, All the world is a stage, and all the men and women are merely players. সামাজিক মানুষ হয়ে ওঠবার একটা অন্যতম শর্ত হল ব্যক্তিগত জীবনেও এইরকম অভিনয় করতে পারা। ইংরেজিতে একে বলে Role Playing।

এর বাইরে আর একটা জরুরি কথা বলবার আছে। সেলিম আল দীন নামে বাংলাদেশের এক নাট্যকার এবং তাত্ত্বিক দাবি করেছেন, ছাপাখানা আবিষ্কৃত হওয়ার আগে যা কিছু সাহিত্য রচিত হয়েছে, তার সবটাই আসলে নাটক। এমন দাবির কারণ কী? সেলিম বলছেন, তখন যেহেতু পুঁথি পড়ে নয়, সাহিত্য বা কাব্য মানুষ উপভোগ করত মুখ্যত কথকের মুখ থেকে, উপস্থাপনা বা Performance-এর মধ্যে দিয়ে, আর সেই উপস্থাপনা মানেই হল নাটক। এর জবাবে তর্ক তোলা যায়, যে কোনো উপস্থাপনাই কি নাটক? কথক ঠাকুর দাঁড়িয়ে বা বসে যে পাঁচালি গান করছেন, সে তো বর্ণনা মাত্র, অভিনয় কোথায়? এর জবাবে বলা যেতে পারে, কোনো বর্ণনাই তো নৈর্ব্যক্তিক হয় না কখনো, তার মধ্যে কমবেশি অভিনয় এসে মিশেই যায়। পাঁচালী পড়তে পড়তে কি নানা চরিত্রের মতো হয়ে ওঠে না কথক ঠাকুরের কণ্ঠস্বর বা হাবভাব? তাহলে তাকে অভিনয় বলব না কেন? কথকের কথা বাদ দিয়ে ক্লাসে পড়ানোর কথাই ধরুন। পড়াতে পড়াতে গলার স্বর উঠছে নামছে, হাত পা নড়ছে, চোখ গোলগোল বা ছোটো হয়ে যাচ্ছে, এইসব কিছু দিয়েই তো পাঠ্য বিষয়টাকে নিছক বিবরণের চেয়ে বেশি কিছু করে তোলার চেষ্টা করছেন মাস্টারমশাই বা দিদিমণি। সেই বেশি কিছুটা কী? বিজ্ঞানই বলুন, ইতিহাসই বলুন আর সাহিত্যই বলুন, মনে হয় না, ভালো শিক্ষক যেন আবিষ্কার করছেন তাঁর নিজেরই বলা কথাগুলো? আসলে তিনি চাইছেন বিষয়টা যেন ছাত্র-ছাত্রীর অভিজ্ঞতা বা অনুভবের সঙ্গে জুড়ে যেতে পারে, শুধু তথ্যটুকু হয়ে না থাকে। এর সঙ্গে অভিনয়ের দূরত্ব খুব বেশি নয়।

ক্লাসে পড়াবার সময় অভিনয় ক্ষমতা কীভাবে কাজে লাগানো হয় তাই নিয়ে আপনাদের আর বেশি কিছু বলা সাজে না, আমরা বরং চলে যাই সেই প্রসঙ্গে, শিক্ষককে যদি একা অভিনয় করতে হয় ছাত্রদের সামনে, কেমন করে সে অভিনয়কে তিনি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবেন? এই বিশ্বাসযোগ্য শব্দটার সুবাদেই একজনের কথা বলি আপনাদের। ভদ্রলোকের নাম কনস্তানতিন সের্গেইভিচ স্তানিস্লাভস্কি, জন্ম ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দু বছরের ছোটো তিনি। থিয়েটারের অধিকাংশ মানুষজন তাঁকে মহাগুরু বলে মনে করেন। কেমন করে ভালো অভিনয় করতে হবে, চরিত্রকে মঞ্চে সত্য করে তুলতে হবে, তাই নিয়ে তাঁর নানা রকম দামি পরামর্শ আছে, তার মধ্যে দুটো কথা খুব জরুরি— (১) স্তানিস্লাভস্কি বলেন, অভিনেতা বা শিল্পীর মধ্যে সত্য আর বিশ্বাসের একটা লড়াই থাকে। সত্য হল আপনি অমুক জায়গায় থাকেন, আপনার বাবার নাম অমুক, আপনি অমুক ইস্কুলে পড়ান। কিন্তু অভিনয়ের সময় বিশ্বাস করতে হবে আপনি হলেন আদি প্রস্তরযুগের মানুষ, পাথর দিয়ে আপনার দলবলের সঙ্গে একটা বিশাল বাইসনকে মারছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। (২) স্তানিস্লাভস্কি বলেছেন একটা জাদুকরী যদি বা Magic if-এর কথা। তার মানে হল, আপনি যদি ধরে নিতে পারেন আপনি সেই আদিম মানুষ, ওইটা হল বাইসন, আপনার হাতে সত্যি একটা পাথর, ওই সে বাইসন আপনার পাথরের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, তাহলে দর্শক আপনার মতই পুরো ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে থাকবে। এর মধ্যে আরো কিছু জটিল মনস্তত্ত্বের প্যাঁচ আছে, আমরা সে আলোচনা শিকেয় তুলে রাখি।

যখন একা অভিনয় করছেন, তখন যে ঘটনা ঘটছে তা সত্যি না হলেও তাতেই আপনাকে বিশ্বাস রাখতে হবে। পড়ানোর ক্ষেত্রেও যে তাই তা তো আপনারা জানেনেই। যা পড়াচ্ছেন সেটা যদি ঠিক বুঝে থাকেন, তাহলে সেই বোঝার আনন্দটুকু খুব আন্তরিকভাবে প্রকাশ করুন, তার বাইরে ছাত্রদের মন ভোলানোর জন্যে হাত পা ছোঁড়া, আরো সব এটা ওটা করে লাভ নেই, বরং

তাতে দর্শক বলুন ছাত্র বলুন সকলেই বুঝে যায় মন ভোলানোর চেষ্টা হচ্ছে। অভিনয়ের বেলাও নিয়মটা তাই। আমরা বলি না, অমুক বড্ড অতি অভিনয় করছে, তার মানেই হল, সে সত্য রূপটাকে প্রকাশ না করে বাইরের ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলাতে চাইছে। একক অভিনয়ে অনেক সময় একজনকেই অনেকগুলো চরিত্রে অভিনয় করতে হয়। আলাদা আলাদা মানুষ, তাদের আলাদা আলাদা গলার আওয়াজ, হাঁটাচলার ভঙ্গি। কারুর কারুর একক অভিনয় দেখে দর্শক বলে, কত রকম গলা করল দেখেছিস, বা কত রকম করে হাঁটল রে বাবা। আপনি শুনে খুশি হলেন। একবার ভাবলেনও না, নাটকটা, ক্লাসে পড়ানোর ক্ষেত্রে বিষয়টা ছাপিয়ে তারা আপনার কায়দা কানুনকেই মনে রেখে দিল। এটাই আপনি চেয়েছিলেন? কোনো শিল্পী বা শিক্ষক কি এটাই চান?

আর যদি কোনো ছাত্র বা ছাত্রীকে দিয়ে একক অভিনয় করাতে চান? তাকে চরিত্রগুলো বুঝিয়ে দেবেন অনুভব করতে শেখাবেন, কিন্তু হাতে ধরে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না করলেই ভালো। বরং সে অগাধ জলে সাঁতার কেটে কেটে নিজের মতো করে ঘটনা বা চরিত্রকে অনুভব করতে শিখুক। তাকে ভালো অভিনেতা তৈরি করা তো আপনার দায় নয়, তার মনের ভেতরে পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে কৌতূহল আনন্দ আর অনুভব জাগিয়ে তোলাটাই আপনার কাজ।

১.৪ নৃত্যনাট্য

নৃত্যনাট্য নিয়ে হবে আমাদের আলোচনা, তার আগে একটা ছোট্ট কাজ আছে। নাটক কাকে বলে তা আগেই বলা হয়ে গেছে, নাচ বলতে কী বোঝায় সেটা পরিষ্কার হয়ে যাক। ইংরেজিতে dance শব্দটার মোটামুটি মানে বলা যেতে পারে, তালে তালে শরীরকে নাড়ানো। কথাটা এসেছে জার্মান শব্দ danson থেকে, যার মানে শরীরকে ছড়িয়ে দেওয়া, আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে আমরা যা করি। নৃত্য শব্দের সংস্কৃত বা বাংলা মানেও তাই, তাল মানের সঙ্গে আনন্দ করে গাত্রবিক্ষেপ। সংস্কৃতে কিন্তু আর একটা কাছাকাছি শব্দ আছে—নৃত্ত। তার সঙ্গে নৃত্যের তফাৎ হল, নৃত্ত বলতে বোঝায় শুধু তালে তালে শরীর নাড়া, যারা নতুন নাচ শিখছে তারা যেমন এক দুই তিন চার গুনতে গুনতে তাল রাখে সেই রকম আর কি। যেই বানান পালটে হল নৃত্য, অমনি তার সঙ্গে জুড়ে গেল অভিব্যক্তি, নেহাৎ হাত পা ছোঁড়ার থেকে তা আরো বড়ো জায়গায় চলে গেল।

নৃত্যের কথাটা বলে নিলাম, জেনে রাখা ভালো বলে। আমাদের আসল লক্ষ্য হল, নাট্য আর নৃত্যের মধ্যে মিল আর তফাৎগুলো বার করা। এক নম্বর মিল, দুটোতেই শিল্পী শারীরিকভাবে মঞ্চে উপস্থিত থাকেন, তাঁদের উপস্থাপনা (Performance) দিয়েই তৈরি হয় শিল্প। আর তফাতের দিকটা হল, নৃত্যে যেখানে জোর দেওয়া হয় শরীরের নানা অঙ্গভঙ্গির ওপর, নাটকে সেখানে সংলাপ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু তাই নয়, নাচের মধ্যে একটা অতিরেক বা বাড়াবাড়ি আছে, অর্থাৎ রোজকার জীবনে আমরা যেমন করে হাঁটি, যেমন করে তাকাই, যেমন করে হাঁটাচলা করি, নাচে ঠিক তেমনটি করা হয় না, সেটাকেই আরো সুন্দর করে বাড়িয়ে দেখানো হয়। সে বাড়িয়ে দেখানো নাটকেও হয়, কিন্তু নাচের মতো এতটা বেশি অতিরেক সেখানে সাধারণত থাকে না।

সাধারণত কথাটা ব্যবহার করলাম, কারণ সত্যি সত্যি কতটা নাটকের এলাকা আর কোথা থেকেই বা নাচের শুরু, তার সীমানা বলে দেওয়া শক্ত। মনে পড়ে, চার অধ্যায় নাটকে শম্ভু মিত্রের অভিনয় দেখে উদয়শঙ্করের মনে হয়েছিল, তিনি নাচ দেখছেন। নিশ্চয় তাঁর মতো শিল্পী শম্ভু মিত্রের মধ্যে সেই শৈল্পিক অতিরেক দেখেছিলেন। যাঁদের নাচ আর অভিনয় দেখার অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা নিশ্চয় মনে করতে পারবেন, এ দুটো শিল্প দু দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে না অনেক সময়েই, খুব কাছাকাছি চলে আসে, কখনো সখনো একাকারও হয়ে যায়।

বাংলা নাটকের সূচনা হয়েছিল বহু আগে, সে কত বছর তা বলা প্রায় অসম্ভব। এইটুকু বলতে পারি, বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন যে চর্যাপদ, সেখানেও বুদ্ধ নাটকের কথা বলা আছে। প্রাচীন আর মধ্যযুগে বাংলায় যে নাটক হত তা ভরা থাকত নাচে আর গানে। লোকনাট্যের মধ্যেও সাধারণত প্রচুর নাচ আর গান থাকে। শুধু আমাদের বাংলায় নয়, গোটা পৃথিবীতেই নাচ আর গান দিয়ে নাটক তৈরি হয়ে এসেছে। কিন্তু তখনো পর্যন্ত নাটকের একটা আলাদা ধরন হিসেবে নৃত্যনাট্য শব্দের ব্যবহার হয়নি। এ বাংলায় সে ব্যবহার প্রথম করলেন রবীন্দ্রনাথ। এখনো পর্যন্ত নৃত্যনাট্য বলতে তাঁর কিছু রচনাকেই বোঝা হয়।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রচুর গান ব্যবহার করা হত। তার বাইরে, প্রথম জীবনে তিনি কয়েকটি গীতিনাট্য লিখেছিলেন, যেখানে গানই হল সংলাপ, আলাদা করে কোনো গদ্যে লেখা সংলাপ সেখানে নেই। কথার সঙ্গে আমরা হাত পা নাড়ি, কিন্তু গানের সঙ্গে

শারীরিক অভিনয় কেমন হবে? গানের মধ্যে একটা অতিরেক আছে, রোজকার জীবনে আমরা যেমন ভাবে কথা বলি গানে তা কম বেশি বাড়িয়ে শোনানো হয়। সেই বাড়ানোর একটা উপায় হিসেবেই হয়তো, গানের মধ্যে প্রায় সময়েই থাকে তাল, থাকে ছন্দ। সেই অতিরেকের মাপে যে অঙ্গভঙ্গি করা হবে, তার মধ্যেও থাকতে হবে সেই তাল ছন্দ, আর তাই হল নাচ।

গানের শরীরি ভাষা হিসেবে নাচকে ব্যবহার করার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ খুব বেশি করে পেয়েছিলেন উনিশশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে। জাভা, বালি, শ্যামদেশে ভ্রমণ করবার সময় তিনি দেখেন রামায়ণ মহাভারতের আখ্যানকে অবলম্বন করে ওখানকার নাচ, দেখে মুগ্ধ হন। জাভা যাত্রীর পত্রে এই মুগ্ধতার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন তিনি। জীবনের শেষ পর্বে এসে বেশ কয়েকটা নৃত্যনাট্য লেখেন, যেমন চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, শ্যামা। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে এই নৃত্যনাট্যগুলির বেশ কিছু অভিনয় হয়েছে এবং এখনো যে হয়ে থাকে তা আমরা সকলেই জানি।

মাস্টারমশাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির অভিনয় করাতে পারেন। এই সূত্রে তারা পরিচিত হতে পারবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। কিন্তু তার বাইরেও, পাঠ্যের ভেতর থেকে অথবা বাইরে থেকেও কোনো গল্প তৈরি করে তাকে নৃত্যনাট্যের চেহারা দেওয়া যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা নাচ গানের মধ্যে দিয়ে গল্পটাকে জীবন্ত করে তুলবে। এর মধ্যে দিয়েও আনন্দময় শিক্ষার ক্ষেত্র তৈরির সুযোগ পাওয়া সম্ভব।

১.৫ মূকাভিনয়

মূকাভিনয় কাকে বলে তা তো শব্দটাকে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায়। মূক মানে নীরব, কথা না বলা। তার সঙ্গে অভিনয় শব্দটা জুড়লে দাঁড়াচ্ছে কথা না বলে অভিনয় করা। সেটা কেমন করে সম্ভব? আমরা যখন কথা বলি, খেয়াল করে দেখেছেন কি, তার সঙ্গে কত রকম ভাবে শরীর নিয়ে নড়াচড়া করি? নাট্যপণ্ডিতদের ভাষায়, কথা ছাড়া আরো তিনটে উপায়ে নীরব থেকেও মানুষ মনের ভাব বোঝাতে পারে। ইংরেজিতে এরা হল gesture, expression আর movement. শব্দগুলো আমাদের চেনা, এদের প্রয়োগও প্রত্যেক মুহূর্তে এন্তার করে থাকি, কিন্তু আমরা কি জানি, কোন্ শব্দটার ঠিক ঠিক মানে কী? যেমন ধরুন gesture-এর আভিধানিক মানে হল, শরীরের যে কোনো অংশ, সাধারণত হাত এবং মাথা নেড়ে মনের ভাব প্রকাশ করা। ক্লাসে পড়াতে গিয়ে পৃথিবী যে গোল এইটা বোঝাবার জন্যে আপনি যখন দু হাত ছড়িয়ে হাওয়ায় একটা গোল দেখান, সেটা হল gesture, Expression কথার মানে তো জানাই আছে, মুখ দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করা। টিফিনের সময় দুটো দল করে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে, আউট হওয়া না হওয়া নিয়ে চলছে তুমুল হট্টগোল, চোট্টামির অভিযোগ উঠছে ঘনঘন, আপনি জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছেন, হয়তো ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে মুখে এক চিলতে হাসি লেগে গেছে। এই হাসিমুখটা হল আপনার expression. আর movement কথাটার মানে তো সহজ, এসেছে move বা হাঁটাচলা থেকে। মোদ্দা কথাটা দাঁড়াল, হাত পা নাড়া, মুখের ভাব আর হাঁটাচলা, কথা ছাড়াও এ সব দিয়ে আমরা অন্যের সঙ্গে নিজের ভাব ভাগ করে নিতে পারি।

Mime বা মূকাভিনয়ের একটা লম্বা ইতিহাস আছে। যেখানে যাবার আগে মনে রাখবেন, mime হল এই অভিনয় রীতির ডাক নাম, পুরো নামটা হল Pantomime, তার থেকে আমরা ছোটো করে নিয়েছি। প্রাচীন গ্রিক থিয়েটারের কথা বলেছিলাম আপনাদের, এর জন্ম সেই সময়ে। গ্রিক ভাষায় ‘mimos’ কথাটার মানে ছিল যে নকল করে, অভিনেতা। তখন একজন লোক মুখোশ পরে নাচত, তাকে বলা হত Pantomimus. সে অনুষ্ঠানটা অবশ্য পুরোটাই মূক হত এমনটা নয়। মধ্যযুগের য়ুরোপে এই ধরনের কিছু মূক অভিনয়ের ধারা তৈরি হয়েছিল, যেমন Mummer plays বা Dumbshows ইত্যাদি। এর পুরো ইতিহাস বলবার দরকার নেই, তবে এটুকু মনে রাখতেই হবে, আধুনিক কালের বেশ কিছু শিল্পী মনে করেছেন, অনেক সময় কথা না বলেই বোঝানো, এবং তার চেয়েও বড়ো কথা অনুভব করানো যায় বহুগুণে বেশি। এঁদের মধ্যে দুজনের নাম না করলে পাপ হবে। একজনকে আপনারা সবাই জানেন, চার্লি চ্যাপলিন। ভাগ্যিস তিনি এসেছিলেন নির্বাক যুগের চলচ্চিত্রে, কথা বলবার উপায় ছিল না, তাই তো অমন অবিস্মরণীয় সব ছবিতে অমন অবিস্মরণীয় সব অভিনয় আমাদের সারা জীবনের সম্পদ হয়ে রইল। দ্বিতীয় জনের নাম হয়তো জানেন না, কারণ তিনি মঞ্চের মানুষ, তাঁর অভিনয় দেখার সুযোগ ঘটা মুশকিল। কলকাতায় এসেছিলেন বহুদিন আগে, সারা পৃথিবীতেই তাঁকে শ্রদ্ধা করা হয়। ফ্রান্সের মানুষ, নাম মার্সাল মার্সো (Marcel Marceau)। নীরব থেকেও কী করে গভীর সব কথা বলা যায়, তার উদাহরণ হিসেবে মার্সোর একটা বিখ্যাত কাজের কথা বলি আপনাদের।

একজন মানুষ সামনে অনেকগুলো মুখোশ নিয়ে বসে আছে (বলা বাহুল্য, সত্যি সত্যি কোনো মুখোশ নেই, সবটাই মূকাভিনয়)। মার্সো একটার পর একটা মুখোশ পরছেন আর খুলে রাখছেন। নানা রকম অভিব্যক্তি সেই মুখোশগুলোয়, কোনটা রাগের, কোনাটা দুঃখের, কোনটা অন্য কিছুর। যে মুখোশটা পরছেন, মুখটা সেই রকম হয়ে যাচ্ছে। একটা হাসিমুখের মুখোশ পরলেন, আর তার পরেই ঘটল বিপত্তি। মুখোশটা কিছুতেই খুলছে না। টানছেন, ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছেন, সমস্ত শরীর দিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন, মুখোশ খুলছে না। কল্পনা করুন, মার্সোর সারা শরীরে মরিয়া ভাব, আঙুলগুলো শক্ত, মুখে কিন্তু মুখোশের হাসি, মুখোশের অভিব্যক্তি তো আর পাল্টাচ্ছে না। যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বলেন, অভিনয়টা দেখতে দেখতে নাকি দম বন্ধ হয়ে আসে। বলুন তো, মুখোশ খুলতে চাওয়ার এই গল্পটা কি নিছকই একটা মজার গল্প, এর ভেতর দিয়ে কোথাও জীবনের খুব ভেতরের একটা সংকটের মুখোমুখি হই না আমরা?

মূকাভিনয়ের বিদ্যে লেখাপড়া শেখানোয় কোন্ কাজে লাগবে? আমাদের ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ তো থাকে, যারা ভালো করে শুনতে পায় না, কেউ আবার কথা বলতেই পারে না। শুনতে পায় না বলে ভাষা শিক্ষা হয় নি, তাই বলতে পারে না এমন ছাত্র-ছাত্রীও তো আছে। মাস্টারমশাই হিসেবে আমরা সবাই জানি, এই সব শারীরিক সমস্যার জন্যে অনেক সময়েই তারা মরমে মরে থাকে। অথচ, তাদের মধ্যে ক্ষমতা কম নেই, কে বলতে পারে, ঠিক ঠিক পরিচর্যা পেলে তারা কেউ ভবিষ্যতে হেলেন কেলার হয়ে উঠবে কিনা। তাদের জন্যে নিজেকে প্রকাশ করার রাস্তা খুলে দেওয়াও তো আমাদের কাজ। সেই কাজটা হতে পারে এই মূকাভিনয়ের মধ্যে দিয়ে। মাস্টারমশাই নিজে তাকে কথা না বলে পড়া বা অন্য কিছু বোঝাবার চেষ্টা তো করেই থাকেন, সেটা নাটকের মধ্যে দিয়ে করতেই বা দোষ কি? আবার উল্টোদিকে, তাকে দিয়ে নাটক করাতে পারেন, পাঠ্য বিষয়ের কোনো অংশ নাটক করে বুঝিয়ে দেবার কথা বলতে পারেন। শরীরের কোনো একটি অঙ্গের সমস্যা থাকলে অন্য অঙ্গগুলো বেশি তৎপর হয়ে উঠে ওই অঙ্গের অভাব পূরণ করে দেবার চেষ্টা করে। আপনি যদি সুযোগ করে দেন, তাহলে সে নিজের ভেতরের লুকোনো একটা ক্ষমতাকে আবিষ্কার করতে পারবে, আত্মবিশ্বাস এক লাফে হয়তো অনেকটা বেড়ে যাবে তার।

কিন্তু এমনটা কিছুতেই নয়, যাদের বলতে বা শুনতে অসুবিধে হয় তাদের জন্যেই এই মূকাভিনয়ের আয়োজন। এটা করলে বিপদের সম্ভাবনা, সেই ছেলেটি বা মেয়েটি নিজেকে অপাংক্তেয় ভাবতে পারে, দলছুট ভেবে কষ্ট পেতে পারে। কথা না বলে কিছু বোঝানোর এই খেলাটা ক্লাসের সবাইকে নিয়ে খেলুন না। এমন তো হতে পারে, কোথাও গিয়ে দেখা গেল সেখানকার মানুষ আমার ভাষা বুঝতেই পারছে না। তখন তো এই মূকাভিনয়ের সাহায্যই নিতে হয় আমাদের। তার চেয়েও বড়ো কথা, ছেলেমেয়েরা দেখুক, তাদের ভেতরে সংযোগ তৈরি করবার কত রকম সব অসাধারণ সম্ভাবনা ঘুমিয়ে আছে। কথার ওপর নির্ভরতা সরিয়ে ঘুমন্ত সেই শক্তিকে জাগিয়ে তোলার কাজটাও তো আমাদেরই করতে হবে।

অধ্যায়
৫

চারুকলা

সূচনা (Introduction)ঃ

"অন্ধকার গুহাগুলির মধ্যে কী প্রয়োজনে এবং কী কারণে চিত্র রচনায় আদিমানব অনুপ্রাণিত হয়েছিল, বর্তমান যুগের সভ্য মানুষের মনে এই প্রশ্ন উদিত হলেও এখন পর্যন্ত তার কোনো কারণ নির্ধারিত হয়নি। চর্বির মশাল জ্বেলে মানুষের দৃষ্টি ও নাগালের বাইরে কোনো কোনো সময় বহু ঊর্ধ্বে দল বেঁধে বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদেই আদিমানবরা চিত্র রচনা করেছিল। চিত্রের উপকরণরূপে তারা ব্যবহার করেছে কাঠকয়লা, রক্তবর্ণ, হলুদ, সবুজ বর্ণের প্রস্তর, খড়িমাটি ও নানা প্রকার স্থানীয় মৃত্তিকা ও বর্ণপ্রস্তর। ওই সকল রঙের সঙ্গে জন্তুর চর্বি মিশিয়ে, দাঁতনকাঠির মতো ভোঁতা ছোবড়াযুক্ত কোনো তুলিকার সাহায্যে প্রস্তরপ্রাচীরের উপর ঘর্ষণ করে বর্ণ প্রয়োগ করেছে। এই পদ্ধতিতে বর্ণ প্রয়োগ করায় চর্বিযুক্ত রং অসমতল প্রস্তরগাত্রে উচ্চাবচভাবে প্রবেশ করায় সহস্র সহস্র বৎসর বা ততোধিক সময়েও উহা বিনষ্ট হয়নি। অপরপক্ষ বলেন, আধ্যাত্মিক শক্তি কামনায় গুহামানব শুদ্ধ মনোভাব নিয়ে বশীকরণ বিদ্যার অনুশীলন করেছিল। এই সকল চিত্র শুদ্ধ কর্মানুষ্ঠানেরই নিদর্শন।" (শিল্প ও শিল্পী—প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণলাল দাস, গভঃ কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্ট, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলকাতা)

আদিমানব জীবন ধারণের জন্য এক বিশেষ উপায় রূপে শিল্পকে হাতিয়ার করেছিল। হাজার হাজার বছর ধরে ক্রমান্বয়ে কঠোর শ্রম, অনুশীলন, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আজ সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছেছে। জলে, স্থলে, আকাশে অবাধ বিচরণ সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন উপলব্ধির মধ্য দিয়ে জীবনের বিকাশলাভ সমর্থ হয়েছে। এখন মানুষ প্রকৃতিকে ভয় করে না, বরং মানুষই প্রকৃতির ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে। তখন শিল্প জীবিকার উপায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, জীবন বিকাশের উপায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। শিক্ষাবিদ্রা স্বীকার করেন যে, ব্যক্তি ভবিষ্যৎ জীবনে যে পেশাই গ্রহণ করুক না কেন; শৈশবাবস্থায় কিছু না কিছু গানবাজনা, ছবি আঁকার চর্চা করা উচিত নচেৎ ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়।

শিক্ষা বলতে বোঝায়— পড়তে, লিখতে ও অঙ্কে পারদর্শিতা লাভ এবং শিল্প ছিল এক বিশেষ সম্প্রদায়ের বৃত্তিগত শিক্ষা, যার সঙ্গে শিক্ষার কোনো সম্পর্ক ছিল না। পরবর্তীকালে দর্শনেন্দ্রিয়, স্পর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতি শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সৌন্দর্যশিক্ষায় নামাঙ্কিত হল। শিক্ষাবিদ্রা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিলেন যে সৌন্দর্য শিক্ষার শিক্ষার্থীর সংবেদন, অন্তর্দৃষ্টি, কল্পনা, আবেগ, অনুভূতি ও চিন্তাশক্তির উন্নয়ন ঘটিয়ে শিক্ষার্থীকে এক অখণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে গড়ে তোলা যায়। এতদিন ধরে শিক্ষা ও শিল্পের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ছিল তা অপসারিত হয়ে শিল্প ও শিক্ষা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা হল— 'Art is an expression, science is an explanation of the same reality' অর্থাৎ শিক্ষা হল নিয়ামক পদ্ধতি।

শিল্প কোনো সময় স্থির থাকে না। অতীতের শিল্প বর্তমানকে প্রভাবিত করে। বর্তমানের শিল্প ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করবে। শিল্প কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও পরোক্ষ, কখনও মূর্ত আবার কখনও বিমূর্ত। যখন আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারি, চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি—তখন তা মূর্ত। আর যখন তা উপলব্ধিতে চলে আসে তখন তা বিমূর্ত। চিত্র শিল্প যেমন ভাস্কর্যকে প্রভাবিত করে, ভাস্কর্যও তেমনি চিত্র শিল্পকে প্রভাবিত করে। শিল্প আবার ইন্দ্রিয়জাত উদ্দীপনা। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় স্বতন্ত্র হলেও একে অন্যের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক যুক্ত। যেমন Design craft-এর সঙ্গে সম্পর্কিত, Dance-Drama-র সঙ্গে জড়িত। রূপকল্পে তৃপ্ত হয় সংবেদন (Sensation) ফলে দর্শনেন্দ্রিয় ও স্পর্শনেন্দ্রিয় শিক্ষার প্রয়োজন। সংগীতে অন্তর্দৃষ্টি (Intution) যার জন্য প্রয়োজন শ্রবণেন্দ্রিয় শিক্ষার। নাটকে অনুভূতি ও আবেগ (Feeling) এবং কারুশিল্পে চিন্তাশক্তির (Thinking) উন্নয়ন ঘটে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করেছে সবই প্রয়োজনের তাগিদে। এই প্রয়োজন দু'ভাবে — এক, বিশুদ্ধ জ্ঞানের জন্য কর্ম। দুই, অভ্যাসজনিত কর্ম। এই অভ্যাসজনিত কর্মের একটি হল চারু ও অপরটি কারু। সৌন্দর্যবোধের প্রয়োজনে চারুশিল্প ও কারুশিল্প একই সূত্রে মিলিত হয়েছে। যেমন ভাস পেন্টিং, মাটীর পাত্রের গায়ে অলংকরণ ইত্যাদি। এইসব একদিকে চারু ও অপর দিকে কারু একাকার হয়ে শিল্প নামে অভিহিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা আসে বিভিন্ন বিষয় পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যে। প্রতিটি বিষয় পাঠের স্বতন্ত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। একক উদ্দেশ্য থেকে সামগ্রিক উদ্দেশ্য সফল হলে শিক্ষার্থীরা অখণ্ড জ্ঞানের অধিকারী হয়। যেমন ইতিহাস পাঠের এর উদ্দেশ্য নিছক ইতিহাসবিদ গড়ে তোলা নয়, সেই সময়কার ঐতিহাসিক পটভূমি, রাজনৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, ধর্ম, সংগীত, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা ইত্যাদি। ঠিক তেমনি শিল্প শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে দক্ষ শিল্পী গড়ে তোলা নয় বরং তার সুপ্ত শিল্পসত্তাকে জাগিয়ে তুলে তার সর্বাঙ্গীন বিকাশকে সহায়তা করা সম্ভব করে তোলা। শিল্প শিক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ও পরোক্ষ উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। (এক) প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে হাতে-কলমে শিক্ষাদানের ফলে তার দৈহিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও সামাজিক দিকগুলির বিকাশ সাধন করে তোলা। (দুই) পরোক্ষ উদ্দেশ্য হল স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের স্ফুরণ ও সুস্থ স্বাভাবিক মনের অধিকারী করে গড়ে তোলা। সামান্য সৃষ্টির মধ্যে অসামান্য আনন্দলাভ। (তিন) সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্যচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের নিত্য ব্যবহারিক জিনিসগুলিকে কিভাবে সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখতে হয় তার শিক্ষা এই শিল্পের মাধ্যমেই হয়।

শিল্প শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঃ

১। **বৌদ্ধিক বিকাশ (Intellectual Growth) ঃ**

বৈচিত্র্যময় বিশ্ব প্রকৃতিতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও বর্ণ আমাদের মনে শিহরন জাগায়। কিন্তু সব রূপ বর্ণ আমাদের স্পর্শ করতে পারে না। যেগুলো আমাদের মনের গভীরে স্পর্শ করে যায়, সেগুলিকে আমরা সুন্দর বলি। শিশুর জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই অবাক বিস্ময়ে এই প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকে। সে যখন কোন রঙিন ফুল বা প্রজাপতি দেখে তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়, তার মনটিও সক্রিয় হয়ে ওঠে। তখন তার মনের মধ্যে সৌন্দর্যের বোধ জন্মায়। এই সৌন্দর্যবোধ থেকে অনুরূপ সৃষ্টি করার আগ্রহ তৈরি হয়। ফলে রং ও রেখায় এক শিল্পবোধ তৈরি হয়ে তার প্রকাশ পায়। তার চিত্রের মধ্যে প্রকাশ করার জন্য পর্যবেক্ষণ (observation) করার মধ্যে দিয়ে বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির বিকাশ (memory) হয়। প্রকৃতিতে যা সুন্দর দেখায় তা আঁকা হয় না, নিজের কল্পনায় (imagination) নতুন করে আঁকা হয়। ফলে কল্পনাশক্তির বিকাশ হয়। এই চিত্র রচনার জন্য একাগ্রতা (concentration) বৃদ্ধি পায় এবং পরিমিতিবোধ ও যুক্তি দিয়ে (Logic) বিশ্লেষণ করতে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শিশু সৌন্দর্যবোধ থেকে সৃজন স্পৃহাকে জাগিয়ে সৃষ্টি করার পর আনন্দে বিভোর হয়ে যায়। এতে তার বৌদ্ধিক বিকাশ হয়।

২। **নৈতিক বিকাশ (Moral Growth) ঃ**

শিশু যখন কোনো শিল্প কাজে অগ্রসর হয় তখন তাকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সে তখন আপন বুদ্ধিবলে সব সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয়। পরিচিত পারিপার্শ্বিক দিক থেকে সে তার শিল্পকর্মের রসদ সংগ্রহ করে ও কাজটি সম্পন্ন করে। নিজেই নিজের কাজের সমালোচক হয়ে ওঠে। খারাপ বা ভালো বিশ্লেষণ করতে শেখে। অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সংবেদনশীলতা, কল্পনাশক্তি, অন্তর্দৃষ্টি, আবেগ ও অনুভূতির বিকাশ হয়। ক্রমান্বয়ে শিল্পচর্চার মধ্যে দিয়ে স্বনির্ভরতা আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। পরবর্তীকালে তার নৈতিক চরিত্র দৃঢ় করে তোলে। নমস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৌন্দর্যের চর্চা, গুনীজনকে কিভাবে সাবধান করতে হয় অথবা সৌন্দর্য সাধনার মধ্য দিয়ে গুণীজনের সম্বর্ধনা এগুলি শিক্ষার্থির তথা শিশুর নৈতিক দিককেই বিকাশিত করে।

৩। **দৈহিক বিকাশ (Physical Growth) ঃ**

শিল্প শিক্ষায় যেমন কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, মাটির কাজ, ভাস্কর্যের কাজ, বাগান পরিচর্যা প্রভৃতি অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথাযথ সঞ্চালন হয় এবং শিক্ষার্থী দৈহিক নিপুণতা অর্জন করে। জাপানি চিত্রকরকে অসি চালনার শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়। কারণ চিত্রে তুলি চালনায় অসি চালনার মতো গতিতে নিপুণভাবে অঙ্কন করতে সমর্থ হয়। দৈহিক সামর্থ শিল্প সৃষ্টির জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়। ভার্স্কর্যের কাজ, কারুশিল্পের বিভিন্ন কাজ কিংবা চিত্রশিল্প প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন ও তার বিকাশ সম্ভব।

৪। **সামাজিক বিকাশ (Social Growth) ঃ**

শিশুকে পরিপূর্ণভাবে সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন। তার মধ্যে বিদ্যালয় অন্যতম। বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয় শুধুমাত্র বিষয় পঠন-পাঠন-এর জন্য নয়, শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ সৎ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুনাগরিক গড়ে তোলার এক মন্দির। যা সমাজের, দেশের ও বিশ্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে মানবসম্পদ সৃষ্টি করে।

শিল্পশিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর কতকগুলি আদর্শ গুনাবলীর সৃষ্টি হয় যেগুলি হল—

১। সুন্দরকে দেখতে, চিনতে ও উপলব্ধি করতে শেখায় যা পরবর্তীকালে জীবনচর্চা ও সমাজ জীবনে প্রতিফলিত হয়।

২। নৈতিকতা ও আদর্শ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করে, দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করা।

৩। পরিবেশ সচেতনতা ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় যা গৃহ পরিবেশ ও সমাজের পরিবেশকে সুন্দর করে তোলে।

৪। সুন্দর আচার-আচরণের মধ্যে দিয়ে পরিশীলিত, পরিমার্জিত ও পরিশোধন করে।

শিল্পকলার অনুশীলন ! দৃশ্যকলার বিভিন্ন ফর্ম
(Arts in Practice : Different forms of Visual Arts)

- **শিল্প কী ? অথবা শিল্প কাকে বলে ? অথবা শিল্পকলা কী ?**

শিল্পকলা বা শিল্প হল—সুকুমার চিত্ত-বৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত ভাব প্রকাশে সৃষ্ট রসসমৃদ্ধ নান্দনিক দৃশ্যরূপ, ব্যবহার্য বস্তুরূপ এবং ভাবরূপ।

দৃশ্যরূপ হল—রঙে রেখায় বা অন্যভাবে চিত্রিত ছবি, অসাধারণ স্থাপত্য, ভাস্কর্য বা শুধুই রস উপভোগের।

ব্যবহার্য বস্তুরূপ হল—ব্যবহার্য নান্দনিক শিল্পবস্তু অর্থাৎ কারুশিল্প।

ভাবরূপ হল—যে রূপসৃষ্টির মাধ্যমে শুধুমাত্র ভাবরস আস্বাদন করা হয়, যেমন সংগীতের ভাবরস আস্বাদন। সাহিত্যের ভাবরস আস্বাদন।

সৃষ্টিধর্মী ভাব প্রকাশের প্রেরণায় বা মানসে সৃষ্টি সমৃদ্ধ যে ভাবরূপ, দৃশ্যরূপ বা বস্তুরূপ তা সমস্তই হল কলা বা শিল্প।

শাস্ত্রোক্ত “শৈবতন্ত্র” অনুসারে চারুশিল্প বা সুকুমার শিল্প (Fine Arts), সংগীত, অভিনয় ইত্যাদি সবই চৌষট্টি কলার অন্তর্গত। নবরসের (৯টি) কোনো না কোনো রসের প্রকাশ ঘটে এই কলার মাধ্যমে।

এককথায় শিল্পের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। শিল্পের প্রসঙ্গে বিভিন্ন দার্শনিক, পন্ডিতগণ বিভিন্নভাবে শিল্পের ব্যাখ্যা করেছেন। কারও মতে শিল্প শুধুই কল্পনার প্রকাশ। অর্থাৎ শিল্প হল বিশুদ্ধ কল্পনা।

আবার কারও মতে, শিল্পীর বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত, চিন্তাপ্রসূত নান্দনিক ভাবের প্রকাশই হল শিল্প।

বিভিন্ন মতামতের ভিত্তিতে বলা যায়, শিল্প শুধুমাত্র বিশুদ্ধ কল্পনা নয়। আবার শুধুমাত্র বস্তুজগতের অভিজ্ঞতালব্ধ ভাবের প্রকাশ নয়। দুয়ে মিলে যে সম্পূর্ণ ভাব, চেতনা—তারই প্রকাশ হয় শিল্পে নানান আঙ্গিকে, বিভিন্ন মাধ্যমে। শিল্পের সাধনা মানুষকে আধ্যাত্মিকতার উচ্চমার্গে পৌঁছে দেয়। পরম চৈতন্যলাভের দেয় সন্ধান। দেশ-কাল-জাতিভেদে মুখের ভাষার সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু, **শিল্প তথা শিল্পের ভাষা দেশ কাল জাতির সীমা পেরিয়ে সর্বজনীন। শিল্পীও তাই দেশ কাল জাতিধর্মের ঊর্ধ্বে সকলের। Visual Art, শিল্প, কলা, কলা-শিল্প, শিল্প-কলা—সবই সমার্থক শব্দ। কলা এবং শিল্প—দুটি শব্দ সমার্থক হলেও কলাশব্দটির ব্যাপকতা অনেক বেশি। ব্যাপক অর্থে কলা বলতে চারুকলা, সংগীতকলা, নৃত্যকলা, অভিনয় ইত্যাদি সমস্ত কলাকেই বোঝায়। শিল্প বলতে সাধারণভাবে চারুকলা, কারুশিল্প, ললিতকলা বা ফাইন আর্টস বোঝায়। এছাড়া ভাস্কর্য, স্থাপত্য শিল্পও বোঝায়। সাধারণভাবে কলা, কলাশিল্প, শিল্পকলা বলতে চারুশিল্পকেই বোঝায়।**

কার্যকারিতার বিচারে শিল্পকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

(১) **চারুশিল্প (Fine Arts)**

(২) **কারুশিল্প (Craft)**

(৩) এছাড়া, **লোকশিল্প ঃ** চারুশিল্প বা ললিত কলার (Art বা Fine Art—একই অর্থবোধক) পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগে তৈরি সহজ সরল শিল্পও আমরা পাই—যা হল লোকশিল্প।

বলা চলে, শিল্পের শুরুতেই এটি তার সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারায় বিকাশের পথে এগিয়েছে।

এই লোকশিল্পের যেহেতু শিল্প-শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে চলার দায় নেই, তাই সাধারণ মানুষ তাদের নিজস্ব শিল্পভাবনা নিয়ে নির্ভয় স্বতঃস্ফূর্ত এবং দ্বিধাহীনভাবে সামান্য উপকরণের সাহায্যে এই শিল্পধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছেন।

(৪) **ফলিত শিল্প বা ব্যবসায়িক শিল্প Applied Art বা Commerical Art ঃ**

বাণিজ্যিক পণ্যের প্রচারের জন্য, সাধারণের সহজ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যে কোনো মাধ্যমে এই শিল্পের ব্যবহার। বইয়ের ঝকঝকে প্রচ্ছদ, বিভিন্ন পোস্টার, সুদৃশ্য ক্যালেন্ডার, নানাবিধ চিত্রিত বিজ্ঞাপন ছাপা হচ্ছে বিভিন্ন পদ্ধতিতে। অফসেট, সিল্ক স্ক্রিন, গ্রাফিক্স ও অত্যাধুনিক ছাপার কৌশল এর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। **এই প্রসঙ্গে অবশ্যই বলতে হবে Design বা নকশার কথা।**

বিভিন্ন Design এবং Designer-এর চাহিদা খুবই। একজন নকশাশিল্পীরও অবশ্যই সৃজনশীল স্বাধীন চিন্তাভাবনা থাকবে। মানুষের রুচির সম্বন্ধে ধারণা থাকবে। আর থাকবে দক্ষতা ও কৌশল। মাটি, কাঠ, ধাতু, পাথর সব কিছুতেই এর ব্যবহার। বিপণন ও বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও এর ক্রমবর্ধমান চাহিদা। ডিজাইন বা নকশা ছাড়াও যে কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে অতি উৎকৃষ্ট মানের এই Commercial Art বা ব্যবসায়িক শিল্প হচ্ছে। ইংল্যান্ডের উনিশ শতকের শেষের দিকে প্রসার লাভ করে Decorative Art তারই বিভিন্ন ধারা বেয়ে Applied Art বা ব্যবহারিক শিল্প উৎকর্ষতা লাভ করেছে।

চারুশিল্প কাকে বলে?

সৃষ্টিধর্মী ভাবপ্রকাশের প্রেরণায় রসসমৃদ্ধ এবং রস উপভোগ্য অভিনব ও নান্দনিক যে শিল্পরূপের সৃষ্টি তাই হল চারুশিল্প বা চারুকলা। চিত্র, ভাস্কর্য—এ সবই চারুকলা।

ব্যক্তি স্বতন্ত্রতা, আবিষ্কারধর্মিতা, উদ্ভাবনী ও অভিনব চিন্তার প্রকাশ, পরম চেতনার বিকাশ—চারুশিল্পের বৈশিষ্ট্য। জীবনের বহুবিচিত্র সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং তার থেকে উৎসারিত বিভিন্ন ভাব-কল্পনা যে কোনো রূপের মাধ্যমে প্রকাশের পথ খোঁজে। শিল্পী তাঁর বিশেষ মানসিক অবস্থায় কল্পিত ভাবরূপটি রেখায় রঙে রসে অথবা পাথরের গায়ে খোদাই করে ফুটিয়ে তোলেন। এ সমস্তই হল Art।

চারুশিল্পের চিত্রশিল্প প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রাচ্যদেশের চিত্রশিল্পে রেখাই হল চিত্রের প্রাণ। রঙের ছোঁয়ায় সেই প্রাণের প্রকাশ। ভাবের মধ্য দিয়ে হয় চৈতন্যময় অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের প্রকাশ।

ভালোবাসাই জন্ম দেয় ভাবের। ভাবের প্রকাশ করতেই রসের সৃষ্টি। ভালোবাসা, ভাব আর রসের একাত্মতায় গড়ে ওঠে শিল্পরূপ। **এর শিল্পরস শুধুই উপভোগের, অন্তরলোকের শুধুই আস্বাদনের**। এর কিছু থাকে ব্যক্ত, কিছু থাকে অব্যক্ত। কিছু বলা আর কিছু না-বলা বাণীর রহস্য খুঁজতেই রসিকজন বার বার ছুটে আসেন চিত্রের সামনে। রহস্যের আবরণ কোনোদিনই উন্মোচিত হয় না। বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে তার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। আর এখানেই শিল্পের সার্থকতা। শিল্প হল চিরকালের, চির-অমর। লিওনার্দ দ্য ভিঞ্চির আঁকা 'মোনালিসা'র মুখের মৃদু হাসির রহস্য নানাজন নানাভাবে ব্যাখ্যা করে চলেছেন আজও। অজন্তার সপ্তদশ গুহার সর্বশ্রেষ্ঠ গুহাচিত্রটি—ভিক্ষাপাত্র হাতে বিশালায়তন মহামানব বুদ্ধদেবের সামনে দুটি ক্ষুদ্র প্রাণী, ভিক্ষাদানরতা মা ও শিশুপুত্র—গোপা ও রাহুল। মন্দভাগিনী যশোধরার (গোপা) চোখের তারায়, দুটি হাতের মুদ্রায়—তার অব্যক্ত যন্ত্রণার, বিস্ময়ের, আত্মসমর্পণের অনেক অনেক কথাই যেন প্রকাশ পেতে চাইছে। এ তো নির্বাক চিত্রমাত্র নয়। এর অব্যক্ত ভাবের রহস্য চিরকালের।

অজন্তার গুহাচিত্র, ইলোরার চিত্র সম্ভার, অজন্তা-ইলোরার অনুপম ভাস্কর্য, রাজপুত, মুঘল, কাংড়া, বাসোলি পেন্টিংস, জৈন চিত্রমাল্য, আরও অসংখ্য শিল্পরাজি আমাদের চারুশিল্পের গৌরব।

বর্তমান যুগের রাজা রবিবর্মার আঁকা, আচার্য অবনীন্দ্রনাথ, আচার্য নন্দলাল বসু, শিল্পী যামিনী রায়, শিল্পী অতুল বসু, শিল্পী বসন্ত গাঙ্গুলী, শিল্পী গোপাল ঘোষ এবং আরও বহু বিশিষ্ট শিল্পীর আঁকা ছবি—অসাধারণ চিত্রশিল্পের নিদর্শন।

ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে—ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ভাস্কর প্রমথনাথ মল্লিক, সুনীল পাল, ভাস্কর সোমনাথ হোড়, ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য অনেকেরই ভাস্কর্য শিল্প উল্লেখযোগ্য। ব্যারাকপুরে গান্ধিঘাটে, সুনীল পালের অসামান্য রিলিফ প্যানেল, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর গান্ধিমূর্তি (ময়দানে), প্রদোষ দাশগুপ্তের নেতাজি মূর্তি ভাস্কর্যের অসাধারণ নিদর্শন। শান্তিনিকেতনের রামকিঙ্কর বেইজ এর 'সাঁওতাল পরিবার' অসামান্য ভাস্কর্যের নিদর্শন (তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত)।

ছবি কাকে বলে ঃ সৃষ্টিধর্মী ভাবপ্রকাশের চেষ্টায় কাগজ, ক্যানভাস, বোর্ডের ওপর বা দেওয়ালের গায়ে তুলি দিয়ে রেখা ও রং এর সাহায্যে যে চিত্ররূপের সৃষ্টি করা হয় তাই হল ছবি বা চিত্র। ছবির মধ্যে অবশ্যই থাকবে রেখা ও রঙের ছন্দ, থাকবে ভারসাম্য, সামঞ্জস্য, ভাব-লাবণ্যের মাধুর্যময় প্রকাশ। ছবি হল দ্বিমাত্রিক বিশিষ্ট চিত্ররূপ।

- **ভাস্কর্য কী?**

ছেনি, বাটালি, হাতুড়ির সাহায্যে কাঠ, পাথর কেটে বা খোদাই করে অথবা ঢালাই করে যে মূর্তি তৈরি হয় তাই হল ভাস্কর্য। ভাস্কর্য অবশ্যই ত্রিমাত্রিক বিশিষ্ট রূপ যা স্পর্শ দ্বারা অনুভব করা যায়। রিলিফ মূর্তি, নকশা, দৃশ্য—সবই ভাস্কর্যের মাধ্যমে করা হয়। ধাতু, সিমেন্ট, প্লাস্টার, মাটি—এসব দিয়ে ভাস্কর্য রূপ সৃষ্টি করা যায়।

চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যের পার্থক্য

চিত্র এবং ভাস্কর্য ঃ ধ্রুপদি শিল্পের বা চারুশিল্পের দুই ধারা

চিত্রশিল্প	ভাস্কর্য
(১) কাগজ, ক্যানভাস, বোর্ড, দেয়ালের গায়ে রং-তুলির সাহায্যে চিত্ররূপ সৃষ্টি হয়।	(১) হাতুড়ি, ছেনি, বাটালি ইত্যাদির সাহায্যে কাঠ, পাথর কেটে অথবা মাটির মূর্তি পুড়িয়ে, প্লাস্টার অব প্যারিসের ছাঁদে গলানো ধাতু ঢেলে। (মোল্ডিং এবং কাস্টিং করে) ভাস্কর্য নির্মিত হয়। প্লাস্টার এবং সিমেন্টেও মূর্তি তৈরি হয়।
(২) দ্বিমাত্রিক তলের উপর 'টোনের' এবং আলোছায়ার তারতম্য ঘটিয়ে ত্রিমাত্রিক ধারণা দেওয়া হয়।	(২) ভাস্কর্য স্বভাবতই ত্রিমাত্রিক। স্পর্শ দ্বারাই অনুভব করা যায়।
(৩) পরিপ্রেক্ষিতের বিষয়টি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।	(৩) পরিপ্রেক্ষিতের প্রায়শ কোনো ব্যাপার নেই।
(৪) ভাস্কর্যের তুলনায় স্থায়িত্ব অনেক কম। দীর্ঘকাল পরে রং নষ্ট হয়ে যায়। ঔজ্জ্বল্যও থাকে না।	(৪) দীর্ঘ স্থায়িত্ব এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
(৫) গাম্ভীর্য এর কোনো বৈশিষ্ট্য নয়।	(৫) আয়তন, ওজন এবং গাম্ভীর্য এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।
(৬) চিত্র সৃষ্টিতে তুলনায় কম সময় লাগে। তুলনায় শ্রমও কম লাগে।	(৬) ভাস্কর্য নির্মাণে দীর্ঘ সময়, যথেষ্ট শ্রম লাগে।
(৭) উন্মুক্ত স্থানের রোদ-বৃষ্টি বাঁচিয়ে পর্যাপ্ত আলোয় গৃহাভ্যন্তরে উপযুক্ত স্থানে চিত্র রাখা হয়।	(৭) উন্মুক্ত স্থানে উঁচু বেদির ওপর pedestal ভাস্কর্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দির গাত্রের রিলিফ মূর্তিও উন্মুক্ত স্থানে থাকে।
(৮) ভুল হলে রঙের সাহায্যে শোধরানোর উপায় আছে।	(৮) পাথর, কাঠ কেটে মূর্তি গড়তে অথবা ধাতুর মূর্তি তৈরির ঢালাইতে ভুল হলে সমস্ত কাজ নষ্ট হয়ে যায়।

ভাস্কর্য (Sculpture) ঃ

ভাস্কর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি প্রাচীন শিল্পমাধ্যম। ভাস্কর্য যেহেতু মাধ্যম হিসেবে অনেক বেশি স্থায়ী, তাই আদিমতম শিল্পভাস্কর্য হিসেবে অনেক বেশি পাওয়া গেছে। প্রাচীন যুগ থেকে নানা ধরনের উপকরণ ভাস্কর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যবহার করার রেওয়াজ রয়েছে। পোড়ামাটি, কাঠ, পাথর, ধাতু, সিমেন্ট ইত্যাদি উপকরণও ব্যবহার করা হত। আধুনিককালে ওইসব উপকরণের পাশাপাশি plastic, fibre glass, paper, plastic clay ইত্যাদি নানাধরনের উপকরণ ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভাস্কর্যকলার নিজস্ব একটি পরম্পরা আছে। ভারতবর্ষের ভাস্কর্যগুলি দেখলে দেখা যায় যে এখানে একটি শৈলী প্রাচীনকাল থেকে প্রবহমান। আবার উপকরণের দিক দিয়ে কোথাও পোড়ামাটি বা টেরাকোটার কাজ বেশি হয়েছে, কোথাও পাথর, কোথাও ধাতু বা কোথাও কাঠের ভাস্কর্য বেশি দেখা যায়। তবে এটা নির্ভর করছে যেখানে উপকরণ সহজলভ্য তা দিয়ে ভাস্কর্য করা হয়েছে।

তবে Style বা শৈলী এবং উপকরণের ফারাক সত্ত্বেও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে কিছু মৌলনীতি মেনে চলা হয়। যেমন—Volume, Dimension, Structural Volume Space, Balance, Rhythm, Plasticity, Compactness, Harmony ইত্যাদি। ভাস্কর্যের উপকরণ বা সাইজ অনুযায়ী ভাস্কর্যের কলাকৌশল ব্যবহার করা হয়। পাথর হলে তা কেটে ভাস্কর্য তৈরি করতে হবে। আবার

পোড়ামাটি হলে সরাসরি মাটি দিয়ে অবয়ব তৈরি করে পোড়াতে হবে। ধাতু হলে ছাঁচ তৈরি করে বা মোমের মূর্তি করে ধাতু গলিয়ে ভাস্কর্য করতে হবে। ছোটো ভাস্কর্য হলে একরকম টেকনিক, আবার বড়ো হলে আর একরকম টেকনিক ব্যবহার করতে হবে।

ভাস্কর্য একটি ত্রিমাত্রিক বস্তু। চিত্র অপেক্ষা শ্রমসাধ্য সৃষ্টিকর্ম হলেও একটি ভাস্কর্য অনেক বেশি Concrete Imagery এবং দর্শক মনে বস্তু সদৃশ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম। ভাস্কর্য দৃশ্যত চিত্র অপেক্ষা গতিশীল। স্থায়িত্ব অনেকগুণ বেশি, চিত্রের আকর্ষণ একদিকে, ভাস্কর্যের আকর্ষণ ও শিল্পগুণ চতুর্দিক থেকে। ভাস্কর্যের ত্রিমাত্রিকতা, Surface Values, বস্তুর গঠন ও গড়ন, Plasticity, বস্তুসদৃশ Textural Quality, প্রাণবন্ততা চিত্র অপেক্ষা বেশি।

স্থাপত্য (Architecture) ঃ

সভ্যতার বিকাশে স্থাপত্যকলা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। দীর্ঘদিন ধরে স্থাপত্য শিল্পের অন্যান্য মাধ্যম অর্থাৎ চিত্র ও ভাস্কর্য থেকে আলাদা ছিল না। যারা চিত্রকর বা ভাস্কর ছিলেন, তারাই স্থপতি হিসেবে কাজ করতেন। স্থাপত্যে মূলত দুটি স্তর আছে। একটি তার নকশার (design) দিক এবং অন্যটি তার নির্মাণ (execution)-এর দিক। স্থপতির কাছে একটি Building অর্থে combination of three dimensional forms in relation to particular location or atmosphere অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশ বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পূর্ণ সংগতি রেখে কার্যকরী ও প্রয়োজন উপযোগী ত্রিমাত্রিক রূপ সৃষ্টি করা। ঐতিহ্য, সমাজব্যবস্থা, যুগ সচেতনতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও রুচিবোধের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্থাপত্যকলা পরিবর্তিত হয়। এককথায় স্থাপত্যকলাকে বলা হয় 'The art of science is building'। আধুনিক সমাজজীবনে স্থাপত্যকলা বিলাসিতা নয়, একটি অতি প্রয়োজনীয় শিল্পকলা।

রঙের প্রাথমিক ধারণা
(Basic concept of Colours)

রং (Colour) ঃ

অনেক বছর আগে থেকে মানুষ রঙের ব্যবহার শুরু করে। গুহাবাসী মানুষ যে রং ব্যবহার করত তা আমরা বিভিন্ন গুহাচিত্রে পাই। রঙের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরদিনের। ইউরোপে রেনেসাঁর সময় উষ্ণ রং ও ঠাণ্ডা রং ব্যবহার করে ছবির বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তোলা হত। বিজ্ঞানীরা Colour Harmony বা রঙের ঐক্য নিয়ে রেনেসাঁর সময় থেকে গবেষণা করেছিলেন। 1838 খ্রিস্টাব্দে শেভরিউল নামে একজন ফরাসি ভদ্রলোক 'The principles of Harmony and contrast of colours' নামে ফরাসি ভাষায় বই লেখেন। এই বইয়ে প্রভাবিত হয়ে 'ইমপ্রেসিনিস্ট' শিল্পীরা রং নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। সুরাত, মাতিস প্রমুখ শিল্পী রং নিয়ে নানান ইজম তৈরি করেছিলেন। এই সময়ই সাদা-কালো কোনো রং নয়—এ তত্ত্বের শুরু হয়।

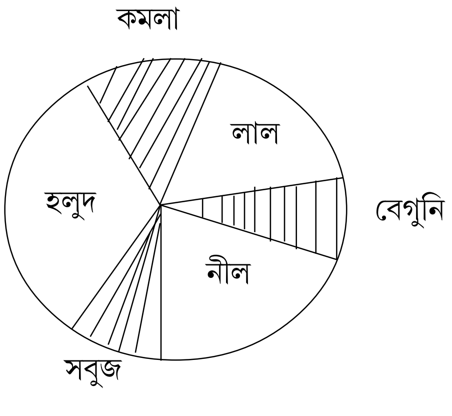

মৌলিক রং (Primary Colours)

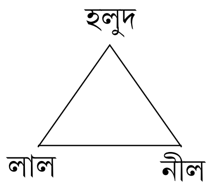

যৌগিক রং (Secondary Colours)

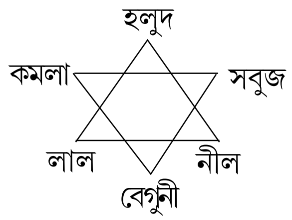

মিশ্র রং (Tertiary Colours)

স্বাভাবিকভাবে যত বস্তু দেখি তার একটা না একটা রং আছে। রং ছাড়া কোনো বস্তুর রূপের ধারণা হয় না। যা কিছু রং আমরা দেখতে পাই তা প্রাথমিক বা মৌলিক রং এবং মিশ্র বা যৌগিক রঙে ভাগ করা হয় অর্থাৎ রং তিন-প্রকারের, যেমন—(1) প্রাথমিক বা মৌলিক রং (2) যৌগিক (3) মিশ্র।

১। প্রাথমিক রং ঃ যে রং অন্য কোনো রঙের দ্বারা প্রভাবিত নয় এবং নিজস্বতা আছে, তাকে প্রাথমিক রং বা মৌলিক রং বা শুদ্ধ রং বলে। প্রাথমিক রং তিনটি—লাল, নীল, হলুদ।

২। যৌগিক রং ঃ প্রাথমিক রঙের পরস্পর মিশ্রণে যে রং তৈরি হয় তাকে যৌগিক রং বলা হয়। যেমন—কমলা, সবুজ, বেগুনি ইত্যাদি।

৩। মিশ্র রং ঃ Tertiary colours মিশ্র রং প্রাথমিক ও যৌগিক রঙের মিশ্রণে যে রং তৈরি হয় তাকে মিশ্র রং বলে।

বর্ণচক্রে তিনটি প্রাথমিক রং লাল, নীল ও হলুদ-এর সংমিশ্রণে মিশ্র রংগুলি তৈরি হয়েছে। নীচে মিশ্র রঙের একটি তালিকা দেওয়া হল।

মিশ্র রং

হলুদ + নীল = সবুজ	লাল + নীল = বেগুনি
লাল + হলুদ = কমলা	নীল + সাদা = আকাশি
লাল + সাদা = গোলাপি	লাল + কালো = খয়েরি
কালো + সাদা = ধূসর	নীল + কালো = কালচে নীল
নীল + সবুজ = গাঢ় সবুজ	নীল + খয়েরি = বাদামি

এইভাবে রংগুলির সঙ্গে সাদা মেশানো হালকা এবং কালো মেশানো গাঢ় রং পাওয়া যায়।

পরিপূরক রং বা বিপরীত রং (Complementary Colour) ঃ

বর্ণচক্রে দুটি প্রাথমিক রঙের সংমিশ্রণে একটি মিশ্র রং উৎপন্ন হচ্ছে। ওই দুটি প্রাথমিক রং বাদে তৃতীয় প্রাথমিক রংটি উৎপন্ন রঙের পরিপূরক বা বিপরীত রং। যেমন— হলুদ রং এর পরিপুরক রং হল বেগুনী যা নীল ও লাল রং এর মিশ্রনে তৈরী হয়।

মিশ্র রং — বিপরীত রং

সবুজ — লাল

বেগুনি — হলুদ

কমলা — নীল

উষ্ণ রং (Warm colour)

যে রংগুলি উজ্জ্বল এবং চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক সেগুলিকে উষ্ণ রং বলা হয়। যেমন—লাল, কমলা, হলুদ ইত্যাদি রং।

শীতল রং (Cool colour)

যে রংগুলি অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল এবং চোখের পক্ষে আরামদায়ক সেগুলিকে শীতল রং বলা হয়। যেমন—নীল, সবুজ ইত্যাদি রং।

রংগুলির বর্তমান নাম ঃ

আমরা যেসব রং বাজারে পাই, তার বিভিন্ন নাম আছে। যেমন—শুধু লাল বললে আট-দশরকম লাল রং পাওয়া যায়। তাই ঠিক নামগুলি না জানলে সঠিক রং পাওয়া সম্ভব নয়। এইসব রঙের নাম ধাতু, পাথর বা যেখান থেকে পাওয়া গেছে সেই অনুযায়ী হয়েছে। বিভিন্ন রঙের নাম নীচে দেওয়া হল।

লাল	ভারমিলিয়ন, স্কারলেট, ক্রিমসন, রোজ ম্যাটার, পোস্টার রেড, কারমাইন, অ্যালিজারিন রেড ইত্যাদি।
নীল	ইন্ডিগো, কোবাল্ট ব্লু, আলট্রামেরিন ব্লু, প্রুশিয়ান ব্লু, সেরুলিয়ন ব্লু, টার্কিশ ব্লু, ম্যাঙ্গানিজ ব্লু।
হলুদ	লেমন ইয়েলো, ক্রোম ইয়েলো, ক্যাডমিয়াম ইয়েলো, ইয়েলো অকার, নেপেলস্ ইয়েলো, গ্যামবোজ, কোবাল্ট ইয়েলো।
সবুজ	ভিরিডিয়াম গ্রিন, স্যাপ গ্রিন, হুকারস্ গ্রিন, ক্রোম গ্রিন, টেরাভার্ট।
খয়েরি	বার্ন আম্বার, র আম্বার, বার্ন সিয়েনা, র সিয়েনা, ইন্ডিয়ান রেড, লাইট রেড, সিপিয়া।
বেগুনি	কোবাল্ট ভায়োলেট, ম্যাঙ্গানিজ ভায়োলেট, মার্স ভায়োলেট।
সাদা	জিঙ্ক হোয়াইট, ফ্লেক হোয়াইট, টিটেনিয়াম হোয়াইট, চাইনিজ হোয়াইট।
কালো	আইভরি ব্ল্যাক, মার্স ব্ল্যাক, ল্যাম্প ব্ল্যাক।

রঙের উৎস (Indigenous sources of colours) ঃ

বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন রকম রং কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্বে শিল্পীরা মাটি, পাথর, গাছপালা থেকে এইসব রং সংগ্রহ করে নিত। এই সংগ্রহ করা রং (pigment) আঠার সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হত। বর্তমানে মৃৎশিল্পী, পটুয়া, কারুশিল্পীরা কেউ কেউ এভাবে কাজ করে চলেছেন। রঙের pigment দু-রকমভাবে পাওয়া যায়।

রং (pigment)

- প্রাকৃতিক (Natural)
  - জৈব (Organic)
  - অজৈব (Inorganic)
- কৃত্রিম (Artificial)

জৈব রং ঃ জীবজন্তু, গাছপালা প্রভৃতি থেকে যে রং পাওয়া যায় তাকেই organic বা জৈব রং বলে। যেমন—ইন্ডিগো, স্যাপ গ্রিন, গ্যামবোজ প্রভৃতি গাছপালা থেকে পাওয়া রং। আবার কারমাইন, সিপিয়া প্রভৃতি জীবজন্তু থেকে পাওয়া রং।

অজৈব রং ঃ প্রকৃতি থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় যে খনিজ রং পাওয়া যায়, তাকেই অজৈব রং বলে। সেগুলি হল ইয়েলো অকার, রেড অক্সাইড, লাইট রেড, সিয়েনা ও আম্বার শ্রেণিভুক্ত রং, ব্ল্যাক অক্সাইড, টেরাভার্ট ল্যাপিসল্যাজুলি প্রভৃতি। খনিজ রঙের মধ্যে যেগুলি পোড়ানো হয়, তা অনেক বেশি স্থায়ী হয়।

কৃত্রিম রং ঃ কৃত্রিম উপায়ে যেসব রং তৈরি হয়, সেসব রংকে কৃত্রিম রং বলে। যেমন—প্রুশিয়ান ব্লু, আলজেরাইন শ্রেণিভুক্ত রং। সাধারণত, অজৈব ও কৃত্রিম রং অনেক বেশি স্থায়ী হয়।

প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত রঙের উৎসগুলি নীচে দেওয়া হল—

সবুজ — বিভিন্ন গাছের পাতা থেকে পাই, টেরাভার্ট পাথর

হলুদ — কাঁচা হলুদ, ফুল, এলামাটি

নীল — ল্যাপিসল্যাজুলি পাথর, নীল গাছ

সাদা — খড়িমাটি, চক

খয়েরি — হরীতকী

লাল — গেরি মাটি, আলতা, লাক্ষা কাঠি

কালো — ভুষা কালি, গাছের ডাল পুড়িয়ে

প্রকৃতি থেকে যেসব রং আমরা সংগ্রহ করি তা সরাসরি ছবি আঁকার জন্য ব্যবহার করা যায় না। বিভিন্নভাবে এই রংকে তৈরি করে নিতে হয়। একটি জৈব রং ও একটি অজৈব রং তৈরির পদ্ধতি নীচে দেওয়া হল।

অজৈব রং তৈরির পদ্ধতি ঃ

পাথর, মাটি প্রভৃতি থেকে অজৈব রং সংগ্রহ করা হয়। যদি পাথর হয় তাহলে তা শিলে জল দিয়ে ধীরে ধীরে ঘষে রং বার করতে হবে। শিলটি চালু করে সামনে পাততে হবে আর শিলের নীচের দিকে রং ধরবার জন্যে একটি চওড়া মুখের গামলা রাখতে হবে। কাদা-কাদা ঘষা রং গামলায় জমবে। গামলায় রং ভরে গেলে তুলে অন্য পাত্রে রাখতে হবে। এবার একটা পাত্রে পরিমাণমতো জল নিতে হবে। ঘষা রং পরিষ্কার সুতির কাপড়ে ছেঁকে পাত্রের জলের মধ্যে গুলে নিতে হবে। 10 থেকে 15 সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর প্রথম পাত্রের রং গোলা জল আর একটি নতুন পাত্রের মধ্যে ঢালতে হবে। রং গোলা জল ঢালবার সময় প্রথম পাত্রের নীচের রং কোনোমতেই নেওয়া চলবে না। এরপর নতুন পাত্রটির গোলা রং থিতিয়ে গেলে উপরের জলটা ফেলে দিতে হবে। এই পদ্ধতিকে রঙের পলি পড়ানো বলা হয়। পলি পড়ানো রং খুবই মোলায়েম হয়। আরও মোলায়েম রঙের প্রয়োজন হলে এইরকম দুই থেকে তিনবার জলে গুলে রঙে পলি পড়াতে হবে। প্রথম পাত্রের তলায় পড়ে থাকা রং এবং রঙের বড়ো দানাগুলো ফেলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এগুলি শিলনোড়ায় আবার বেটে নিয়ে ও পরে পলি পড়িয়ে আরও মোলায়েম রং তৈরি করে নেওয়া যাবে।

রং তৈরি হয়ে গেলে পরিমাণমতো গঁদের আঠা মিশিয়ে ছোটো ছোটো রঙের লেচি বা কেক বানিয়ে রাখা চলে। অথবা পাউডার বা চূর্ণ আকারেও রাখা যেতে পারে। কিন্তু কাচের পাত্রে পরিষ্কার জল মিশিয়ে শুকনো রাখার চেয়ে ভালো। মাঝে মাঝে পুরাতন জল ফেলে দিয়ে পরিষ্কার নতুন জল দিয়ে ভালো করে গুলিয়ে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে পরিস্রুত বৃষ্টির জল হলেই ভালো। এই থিতানো রঙের উপরিভাগে খুব মেলায়েম মিহি রঙের একটি স্তর থাকে। সেটি সূক্ষ্ম কাজের পক্ষে খুব উপযোগী।

এলামাটি, গেরিমাটি, খড়িমাটি প্রভৃতি খনিজ রং শিলে ঘষার প্রয়োজন নেই। এগুলি জলে গুলে উপরোক্ত পদ্ধতিতে তৈরি করে নিতে হবে।

আকার ও আকৃতি

Shapes and Forms

আকার আকৃতির সংজ্ঞা ঃ কোনো কিছুর গড়ন বা গঠনের বাহ্যিক রূপটি হল তার আকার আকৃতি। বস্তুর বাহ্যিক রূপের প্রকাশ হয়, রং ছাড়াও তার আকার আকৃতির মাধ্যমে। সেইমতো কোনো বস্তু চ্যাপ্টাকৃতি, কেউ লম্বাকৃতি, কেউ খর্বাকৃতি, কেউ গোলাকৃতি বা গোলাকার, কেউ সিলিন্ডার আকৃতি, কেউ শঙ্কু আকৃতি, কেউ পিরামিডাকৃতি ইত্যাদি। আকার আকৃতি প্রায় সমার্থক শব্দ। আম গাছের পাতা চ্যাপ্টা এবং লম্বাকৃতি। আয়তক্ষেত্রাকার একটি কাগজ চ্যাপ্টাকৃতি; তার আকারটিও সেই সঙ্গে বলা হল—আয়তক্ষেত্রাকার। **আকার আকৃতি এবং ঘনত্ব নিয়েই হল বস্তুর গঠন বা গড়ন। অর্থাৎ তার বাহ্যিক রূপের আয়তন**।

মাত্রার ধারণা ঃ মাত্রার সাহায্যে বস্তুর বিশিষ্টতা, পরিমাপ বা পরিচয় প্রকাশ পায়। শিল্পের ক্ষেত্রে মাত্রা বা Dimension হল তিনটি।

(১) দৈর্ঘ্য, (২) প্রস্থ ও (৩) বেধ বা উচ্চতা অথবা গভীরতা বা ঘনত্ব।

অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে মাত্রা বহুমাত্রিকতা হতে পারে। মাত্রার উপস্থিতিতে এবং সংযোগে বস্তুর আকার আকৃতিগত গঠনরূপটি প্রকাশ পায়।

মাত্রার ধারণা পেতে প্রথমেই 'বিন্দু' দিয়ে শুরু করতে হবে।

(১) **বিন্দু** ঃ যার শুধুমাত্র অবস্থান আছে এবং কোনো মাত্রা নেই।

(২) **একমাত্রার ধারণা** ঃ কিছু ব্যবধানে অবস্থিত দুটি বিন্দুকে যুক্ত করলে পাওয়া যায় একটি সরলরেখা। এটি একমাত্রা বিশিষ্ট।

(৩) **দ্বিমাত্রিক বা দুটি মাত্রার ধারণা** ঃ একটি সরলরেখা যখন তার অভিমুখ পরিবর্তন করে ডাইনে বা বামে অগ্রসর হয়ে আর একটি বিন্দুতে এসে যুক্ত হয় তখন পাওয়া যায় দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ যুক্ত রেখা। সেটি আবার চতুষ্কোণ যুক্ত হয়ে রেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি ক্ষেত্রবিশিষ্ট এবং ২টি তল বিশিষ্ট বস্তুর আকার আকৃতির ধারণা দেয়। যেমন ঃ **দৈর্ঘ্য প্রস্থ বিশিষ্ট কাগজ**। এর surface-এর উপরের তলটি ছবির ক্ষেত্রে বিবেচ্য। **দ্বিমাত্রিক অর্থাৎ যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুটি মাত্রা আছে। কাগজের দুটি তল এবং এটি দ্বিমাত্রিক।**

(৪) **ত্রৈমাত্রিক/দ্বিমাত্রিক বা তিনটি মাত্রার ধারণা** ঃ যখন দৈর্ঘ্য প্রস্থের সঙ্গে উচ্চতা অর্থাৎ বেধ বা গভীরতা যুক্ত হয় তখন সেটি হয় ত্রৈমাত্রিক ঘনবস্তু। বর্গক্ষেত্র আকার বিশিষ্ট লুডো খেলার ছক্কা যেমন ত্রিমাত্রিক সমানাকৃতির ঘনক। এর ছয়টি তল। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ সমান। আকার আকৃতির পার্থক্যে ঘনবস্তুর তলের পরিবর্তন হয়। শঙ্কু আকৃতির ২টি (দুটি) তল গোলাকার। স্পর্শ দ্বারাই ৬টি তল/ত্রিমাত্রিকতা অনুভব করা যায়। **ঘনমনা বা Volume যুক্ত কোনো বস্তুর মোট পরিমাণ হল আয়তন।**

ছবিতে ত্রিমাত্রিক ধারণার সৃষ্টি করা ঃ ছবিতে দৃশ্য বস্তুর স্বাভাবিক এবং বাস্তবসম্মত রূপ দেওয়ার জন্য ত্রিমাত্রিকতার প্রয়োজন।

ছবি আঁকার ক্যানভাস, কাগজ বা অন্য যাই হোক তা দ্বিমাত্রিক সমতলক্ষেত্র বিশিষ্ট। তার ওপর ছবি আঁকলে সাধারণভাবে তা দ্বিমাত্রিকই হবে। অর্থাৎ, দৈর্ঘ্য প্রস্থ পাওয়া যাবে, কিন্তু বেধ বা ঘনত্ব পাওয়া যাবে না।

দ্বিমাত্রিক সমতল ক্যানভাস বা কাগজের ওপর আঁকা ছবিতে আলো-ছায়ার (Light and Shades) তারতম্য ঘটিয়ে এবং Perspective-এর নিয়ম অনুসারে কাছের দূরের ধারণা দিয়ে বেধ আনা সম্ভব। এটা বলা যায়—**দৃষ্টির বিভ্রম সৃষ্টি করে ঘনবস্তুর ত্রিমাত্রিকতা ফুটিয়ে তোলা**। যেমন—একটি দৃশ্যমান ঘনবস্তু লুডোর 'ছক্কা'র দৃশ্যমান অংশ কাগজের ওপর শুধুমাত্র রেখার সাহায্যে আঁকলে তা ছক্কার প্রকৃত রূপ, গঠনটি প্রকাশ করবে না; অর্থাৎ সেটি জীবন্ত হয়ে উঠবে না। কিন্তু সেটির ঘনত্বসহ দৃশ্যমান অংশ perspective-এর নিয়মানুসারে ঠিকমতো এঁকে, তার উপর যথাযথ রঙের সাহায্যে একধারে কালো এবং বিপরীত দিকে ছায়া (dark tone) সৃষ্টি করার ফলে সেটি কাগজ থেকে যেন উঠে আসতে চাইবে, জীবন্ত মনে হবে। মনে হবে যেন স্পর্শ করা যাবে। স্পর্শ অনুভবে যেন ঘনত্বও বোঝা যাবে এমনই মনে হবে। **ভাস্কর্য স্বভাবতই ত্রিমাত্রিক।**

আলো ছায়ার সাহায্যে ত্রিমাত্রিক ছবি আঁকার কৌশল হল—বস্তুর যেদিকটায় আলো সেদিকে প্রায় সাদা বা প্রয়োজনমত বস্তুর নিজস্ব রঙের হালকা আভাস দেওয়া (Light tone) হবে। একে বলে High light অংশ। যেদিকে সবচাইতে বেশি ছায়া সেদিকে

বস্তুর নিজস্ব রঙের গাঢ় রং (Dark tone) দিতে হবে। আলো-ছায়ার মধ্যবর্তী অংশে দিতে হবে মাঝামাঝি স্তরের রং অর্থাৎ একেবারে হালকাও নয়, খুব গাঢ়ও নয়। এটিকে বলে Middle tone দেওয়া। আলোর দিক থেকে ধীরে ধীরে Middle tone-এর অংশ পেরিয়ে ছায়ার গভীরতা বাড়বে। যেমন—গাছের কাণ্ডে রং করতে কাণ্ডের স্বাভাবিক রং আগে সব জায়গায় দেওয়া হল। এবার আলোর দিক ছেড়ে মাঝামাঝি অংশ থেকে কিছুটা গাঢ় রং দেওয়া হল। সবশেষে আলোর বিপরীত অংশে বেশ গাঢ় রং দেওয়া হল। এবার মনে হবে কাণ্ডটি হাত দিয়ে যেন স্পর্শ করা যাবে। এই হল রঙের সাহায্যে ত্রিমাত্রিকতার ধারণা দেওয়া।

শিশুদের যে কোনো ঘনবস্তু দেখিয়ে তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার বিষয়ে ধারণা দিয়ে ত্রিমাত্রিকতার ধারণা দেওয়া যাবে। তার আগে দ্বিমাত্রিক যেমন একটি কাগজ দেখিয়ে বোঝানোর বিষয়টি শুরু করতে হবে।

পরিপ্রেক্ষিত
(Perspective)

ধূধূ প্রান্তরের মাঝে দাঁড়িয়ে দেখব দূরে আকাশ আর মাটি এক সরলরেখায় মিশেছে। আবার এই প্রান্তরের মাঝে অবস্থিত খুব উঁচু স্থান থেকে যদি দেখি তাহলে দেখব আগের সরলরেখাটি উঁচুতে উঠে গেছে। এই রেখাটি হল দিগন্ত রেখা বা Line of Horizon. আমাদের চোখ বরাবর এই রেখাটি থাকবে। চোখের ওপরের বস্তুর রেখা দিগন্ত রেখায় এসে মিশবে, যেমন আকাশ। চোখের নীচের রেখা উঠে এসে দিগন্ত রেখায় মিশবে। যেমন আগে বর্ণিত প্রান্তর সীমা। বহুদূর দেখা যায় এমন রেললাইনের পাশে যদি দাঁড়িয়ে দেখি তাহলে দেখা যাবে দুটি লাইন ক্রমশ সরু হয়ে যেন ওপরে উঠে এক বিন্দুতে মিশেছে। বাস্তবসম্মত ছবি করতে তাই পরিপ্রেক্ষিতের নিয়ম ভালো করে জানা দরকার। কাছের ঘর, গাছ যেমন বড়ো হবে আবার দূরের সম আকৃতির ঘর, গাছ যেমন ছোটো হবে—আরও ওই নিয়মে কাছের অংশ ঘন হবে, দূরের অংশে ঝাপসা হালকা হবে। আরও একটা বিষয় মনে রাখা দরকার—রেললাইন বা ভূমি রেখা যার ওপর ঘর, বাড়ি, গাছ ইত্যাদি আঁকা হয়েছে সেই রেখা পরিপ্রেক্ষিতের নিয়মে ক্রমশ উপরে উঠে বহুদূরে একটি বিন্দুতে মিলবে। এটিকে বলে ‘‘ভ্যানিশিং পয়েন্ট’’। আবার ঘর বাড়ির বা গাছের শীর্ষতলের রেখা বা ভূমি রেখার সমান্তরাল তা ওই ‘‘ভ্যানিশিং পয়েন্টে’’ নেমে এসে মিশবে। অর্থাৎ বাস্তবে এই দুটি রেখা সমান্তরাল হলেও পরিপ্রেক্ষিতের নিয়মে সমান্তরাল থাকবে না। বলা বাহুল্য দর্শকের ডান ও বামদিকের দুটি ‘‘ভ্যানিশিং পয়েন্ট’’কে একটি সরলরেখায় যুক্ত করলে Eye Level বা দৃষ্টিতল পাব, অর্থাৎ সেই Horizontal Line-ই পাব। তবে গাছ, ঘর-বাড়ির দেয়াল অর্থাৎ লম্বরেখা ছোটো-বড়ো, দূর-নিকট সকল অবস্থাতেই লম্ব (৯০° কোণ) থাকবে। বলা বাহুল্য Eye Level এবং Horizontal Line একই রেখায় অবস্থিত।

বস্তুর প্রকৃত রূপ আর সেটির দৃশ্যমান রূপের মধ্যে অনেক পার্থক্য। সমআকৃতির ঘর, বাড়ি, গাছ ইত্যাদি যা সামনেই অবস্থিত—তা দূরে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তার আকার আকৃতি মাপ সব একই থাকে। কিন্তু, ছবির মধ্যে দৃষ্ট সেই সমআকৃতির ঘর, বাড়ি, গাছ ইত্যাদি দূরে থাকলে পরিপ্রেক্ষিতের নিয়ম অনুসারে ক্রমশ ছোটো হবে এবং সেইমতো আঁকতে হবে। Vanishing Point, Eye Level এবং Basic Line ঠিকমতো নির্ধারিত হলে পরিপ্রেক্ষিত ঠিকমতো হবে।

- **পরিপ্রেক্ষিতের ধারণার শুরু ঃ**

বিলীয়মান দুটি বিন্দুর সংস্থাপন অর্থাৎ দুটি Vanishing point যুক্ত করে দৃষ্টিতল নির্বাচন করা। (Eye level যা কিনা Line of Horizon) এবং সেইমতো বিশেষ কৌশলে বস্তুরূপের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলা—এ সমস্তই গাণিতিক ছকে বাঁধা। রেনেসাঁ যুগের পূর্ববর্তী ইউরোপীয় শিল্পীরা সম্ভবত এটা জানতেন না। তখন সব কিছুর ওপর থেকে দেখানোর চেষ্টা হত। প্রাচীন মিশর ও চিনের শিল্পীরাও এ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না।

সে সময় মিশরীয় শিল্পীরা দূরের মানুষকে উপরের সারিতে আঁকতেন এবং Perspective-এর প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ছোটো না করে সমান মাপে আঁকতেন।

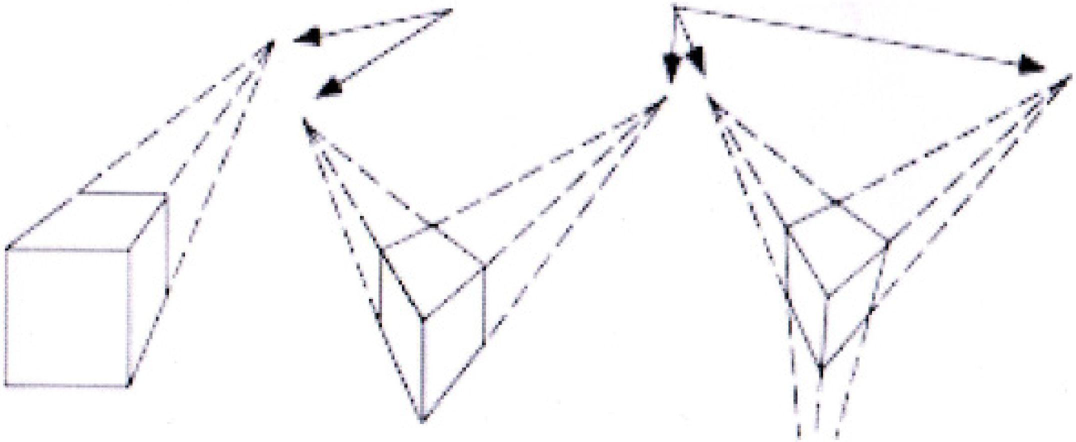

প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকরেরা সম্ভবত Perspective-এর বিশেষ কৌশল সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। কিন্তু সব সময় মেনে চলেননি। বিশেষজ্ঞের মতে—কাছের বা সামান্য দূরের দুটি অংশকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে একই সঙ্গে দেখানোর জন্য তাঁরা ইচ্ছাকৃত ভাবেই এটা করেছেন, অর্থাৎ পরিপ্রেক্ষিতের নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইতালির ফ্লোরেন্সে প্রখ্যাত স্থাপত্য শিল্পী ও ভাস্কর ফিলিপ্পো ব্রুনোলেচ্চি (Fillippo Burnelleschi, 1379-1446 A.D.) গাণিতিক ছকে বাঁধা পরিপ্রেক্ষিতের সূত্রগুলি আবিষ্কার করেন। শিল্পের জগতে এ এক যুগান্তকারী ঘটনা। এরপর শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, শিল্পী অ্যালবার্ট ডুরার প্রমুখ শিল্পীরা Perspective-এর নিয়মগুলি ঠিকমতো লিপিবদ্ধ করেন।

রঙের পরিপ্রেক্ষিত বা Colour Perspective ঃ

ছবিতে রঙের মাধ্যমে দূর নিকট বোঝাতে যথাক্রমে অনুজ্জ্বল হালকা ও উজ্জ্বল গাঢ় রঙের যে কৌশলগত ব্যবহার হয়—তাই রঙের পরিপ্রেক্ষিত বা Perspective.

• ছবির পরিপ্রেক্ষিতের কৌশল ঃ

ছবিতে তো বটেই, এমনকী স্থাপত্যে বা ভাস্কর্যে কোথাও রঙের ব্যবহার করতে হলে রঙের পরিপ্রেক্ষিতও জানা দরকার। ছবিতে—কাছের দৃশ্যবস্তুতে দেওয়া হবে সঠিক রংটির Deep tone বা গাঢ় রং। অবশ্যই সেটি যেন উজ্জ্বল হয়। ক্রমশ দূরের দৃশ্যবস্তুতে ধীরে ধীরে রংই হালকা হয়ে যাবে। ভোরের কুয়াশার ছবিতে নিউট্রাল টিন্ট (Neutral Tint) ব্যবহার করলে সবকিছুই হবে অস্পষ্টতায় ভরা। সেখানে উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার একেবারেই নেই। রাত্রের আকাশের রং দিনের মতো হালকা নীল হবে না, সেখানে কালচে নীল বা লালচে নীল (দুটি ভিন্ন ভাব প্রকাশ করবে) এবং তার সঙ্গে ঘরবাড়ি, গাছপালা সবই কালচে ভাবসহ অস্পষ্টতায় ঢাকা থাকবে।

প্রাকৃতিক দৃশ্যে—ছবির উপরের অংশ হল নিকটের আকাশ, মাথার উপরের আকাশ; ক্রমশ নীচের অংশ হল দূরের আকাশ। দূরের আকাশ শেষ হবে ছবির মাঝামাঝি অংশে অর্থাৎ দিগন্ত রেখায়। তারপর শুরু হবে জমি, দূরের গাছপালা, ঘর ইত্যাদি

Background। এরপর ক্রমশ নীচে একেবারে সামনের অংশ অর্থাৎ ফোরগ্রাউন্ড (Foreground)। সবচেয়ে নিকটের বলে এখানের গাছপালা, ঘর—যা কিছু আকার আকৃতিতে বড়ো হবে।

এবার রং করার ক্ষেত্রে—ছবির ওপরের অংশে অর্থাৎ মাথার উপরের আকাশে রং হবে তুলনায় গাঢ় ও উজ্জ্বল। দূরের আকাশ ক্রমশ হালকা ও ধূসর রঙের হবে। দূরের গাছপালা, ঘর ইত্যাদি আকারে ছোটো এবং হালকা ধূসর বর্ণের হবে। অস্পষ্ট ভাব থাকবে। আবার ফোরগ্রাউন্ডে যা কিছু সবথেকে কাছে বলে এখানে রং হবে গাঢ় উজ্জ্বল ও প্রয়োজনমতো সামান্য ডিটেলসের কাজ হবে—রঙে। তুলনায় অনেক স্পষ্ট হবে। তাহলে, দেখা গেল—পরিপ্রেক্ষিতের নিয়ম অনুসারে 'আই লেভেলের' উপর অর্থাৎ আকাশের গাঢ় উজ্জ্বল থেকে হালকা হতে হতে দিগন্তরেখায় নেমে এসে হালকা ধূসর বর্ণে মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার সামনের নিকটের অংশও গাঢ় উজ্জ্বল থেকে হালকা হতে হতে দূরে ধূসর বর্ণে অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই হল রঙের পরিপ্রেক্ষিত। **ছবির দূরের অংশ হল পশ্চাদভূমি বা পটভূমি, পরিবেশ বা Background.**

পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজন ঃ ত্রিমাত্রিক রূপ আঁকা।

দ্বিমাত্রিক তলের (ক্যানভাস, কাগজ, দেওয়াল) উপর ত্রিমাত্রিক রূপের ধারণা দিতে, perspective-এর এই কৌশলটি ব্যবহার করা হয়। তাত্ত্বিকদের মতে, এটি দৃষ্টি বিভ্রম সৃষ্টি করার কৌশল হলেও বাস্তবের সঠিক রূপকে যথার্থভাবেই প্রকাশ করে। ছবিকে করে তোলে বাস্তব।

চিত্র রচনায় ছবির ভিত্তিস্বরূপ হল—(১) সঠিক রেখাঙ্কন (Drawing), (২) বিষয়বস্তুকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ও ভারসাম্য বজায় রেখে সাজানো (composition) এবং (৩) পরিপ্রেক্ষিতের নিয়ম মেনে দূর-নিকট, ছোটো-বড়ো, ত্রৈমাত্রিক রূপ ইত্যাদি সঠিকভাবে আঁকা। তিনটি কাজ বিচ্ছিন্ন নয়। রেখাঙ্কন বা ড্রইং-এর সময়েই এগুলি হবে। বর্ণপ্রয়োগের ক্ষেত্রেও দূরের হালকা রং, কাছের গাঢ় রং, ত্রৈমাত্রিকতা আনতে হালকা-গাঢ় রঙের ব্যবহার—এসবও পরিপ্রেক্ষিতের নিয়ম মেনেই হবে (Colour perspective)। পরিপ্রেক্ষিতের নিয়ম না জানলে বা ছবিতে পরিপ্রেক্ষিতের ভুল থাকলে ছবি আঁকা নিষ্ফলে যাবে। ভাস্কর্য, স্থাপত্য, ধারাবাহিক চিত্র রচনা, ত্রৈমাত্রিকতা—সবক্ষেত্রেই পরিপ্রেক্ষিত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দিগন্তরেখা (Line of Horizon), চোখ বরাবর রেখা (Eye Level), ভূমি রেখা (Base Line) ইত্যাদি ঠিকমতো বজায় রেখে ছবি আঁকলে ছবির রূপটি অন্তত সঠিক হবে। এরপর বর্ণ লেপনে ভাব-লাবণ্য যুক্ত হয়ে সেটি হয়ে উঠবে অপূর্ব সুন্দর।

সামনে দেখে কোনো কিছু আঁকতে গেলে—যা আঁকা হবে তা যেন অন্তত শিল্পীর ছয় ফুট দূরত্বে থাকে। না হলে, পরিপ্রেক্ষিতের গোলমালে ড্রইং-এর বিকৃতি ঘটবে। ডাচ শিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গখ্ প্রথম জীবনে ঘরের ছোট্ট পরিসরে কয়লাখনির কর্মরত ক্লান্ত বিধ্বস্ত মানুষগুলির ছবি এঁকেছিলেন কাগজের ওপর কয়লার আঁচড় দিয়ে (উনি তখন কয়লাখনিতে ধর্মপ্রচারকের চাকরি নিয়ে এসেছিলেন)। খুব কাছ থেকে আঁকার জন্য ছবির ড্রইং-এ ঘটেছিল বিকৃতি। কিন্তু Potrait-গুলির (মুখাকৃতি) ক্লান্ত করুণ মুখের আর্তি অসাধারণ ভাবময় ছিল। পরিপ্রেক্ষিতের নিয়ম অনুসারে ওই সব ছবির ড্রইং-ও যদি সঠিক হত, তাহল ওই ছবিগুলি কোন পর্যায়ে পৌঁছত তা কল্পনার বাইরে।

ছাত্রছাত্রীদের কীভাবে পরিপ্রেক্ষিতের ধারণা দেওয়া যাবে?

ব্ল্যাকবোর্ডে, নীচের দিকে Base বা ভূমিরেখা, মাঝামাঝি দিগন্তরেখা বা Horizontal line তথা Eye Level এঁকে ছবির বাঁপাশে একটি ঘর, একটি গাছ বড়ো করে আঁকা হল। Base line থেকে গাছ আঁকা হল। সামান্য ওপরে ঘর আঁকা হল। ঘরের Base line একটু ওপরে হল। অর্থাৎ ঘরের সামনে গাছ। ঘরের চালটি দিগন্তরেখার কিছু উপরে থাকবে। এবার, গাছের মাথা থেকে আঁকা সরলরেখা ডানদিকে দিগন্তরেখায় নেমে আসবে। একইভাবে ঘরের চাল থেকে আঁকা রেখা নেমে এসে দিগন্তরেখায় মিশতে চাইবে (কাল্পনিক)। Base line থেকেও গাছ ও ঘরের রেখা ওপরে উঠে দিগন্তরেখায় মিশতে চাইবে। ডানদিকে ক্রমশ দূরে দেখা যাচ্ছে—যদি পরপর গাছ আঁকতে হয়, তা উপর ও নীচের রেখার মধ্যেই হবে। পরিপ্রেক্ষিতের নিয়ম অনুসারে গাছগুলি ক্রমশ ছোটো হতে থাকবে। রাস্তাও ওই নিয়মে মোটা থেকে সরু হয়ে এঁকে বেঁকে দূরে যাবে। যথাযথ রঙের সাহায্যে ঘরের, গাছের কাণ্ডের, গাছের পাতার গুচ্ছের ত্রৈমাত্রিক ধারণা দিতে হবে—আলোছায়ার তারতম্য ঘটিয়ে। জমির সামনের রং এবং আকাশের ওপর অংশ ঘন করলে সহজেই সামনে এবং দূরত্ব বোঝানো যাবে। এইভাবে পরিপ্রেক্ষিতের ধারণা দেওয়া যাবে।

ভারসাম্য ও ছন্দ

(Balance & Rhythm)

• চারুশিল্পের প্রকৃতি/স্বরূপ (Nature of Fine Arts)

• শিল্পের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক (Relation of Nature with Artistry (Art & Craft)

শিল্পের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক নিবিড়। প্রকৃতির রূপ আর রঙে যে অপরূপ শোভা তা শিল্প সৃষ্টির মূল প্রেরণা। প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যে ভরা রূপকেই সৌন্দর্যের পূজারী শিল্পী নতুন নতুন ঐশ্বর্যে এবং সাজে ফুটিয়ে তোলেন তাঁর শিল্প সৃষ্টিতে। রং, তুলি, কাগজ অথবা মাটি, কাঠ, পাথর, বাঁশ, বেত শিল্প সৃষ্টির যে-কোনো উপকরণই হোক তা পাই প্রকৃতির থেকে—তা সে চারুশিল্প বা কারুশিল্প যাই হোক অথবা ভাস্কর্যই হোক। নকশা অলংকরণের রূপসৃষ্টিও প্রকৃতির ফুল, পাতা, পাখি ইত্যাদি অলংকৃত রূপ থেকেই পাই।

• শিল্পের উপাদান (Ingredients of Art & Craft)

শিল্প শাস্ত্রের নন্দন তত্ত্ব অনুসারে—উপাদানগুলির বৈশিষ্ট্য ঃ

(i) **সৌন্দর্য (Beauty)** ঃ প্রথমেই আসে সৌন্দর্যের কথা। **রূপকে যা বিকশিত করে তাইই সৌন্দর্য। লাবণ্যে ভরা রূপের মাধুর্যই হল সৌন্দর্য**। শিল্পের ষড়ঙ্গ অনুসারে দৃশ্যময় বস্তুর সঠিক রূপ, তার সঠিক মাপজোখ, গড়ন, সাদৃশ্য, সঠিক রঙের ছটা—সব ঠিক হলেও সৌন্দর্যের সন্ধান তখনও পাওয়া যায় না। এবার যখন লাবণ্যযুক্ত হয়ে তার ভাবটি ফুটে উঠল, তখনই তা হল সুন্দর। এটি অন্তর্লোকের উপলব্ধির জিনিস। এই সৌন্দর্য ছাড়া শিল্প কখনও সার্থক শিল্প হয়ে ওঠে না। বোধ হয় **শিল্পের শেষ কথাই হল অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য**।

(ii) **ত্বক বা অঙ্কনরীতি/প্রথা (Texture)** ঃ ছবিতে রং লেপনের বিভিন্ন পদ্ধতিতে রূপের প্রকাশটিও বিভিন্নতা পায়। কোথাও প্রায়-শুকনো তুলিতে রং দিলে ছবির এক রূপ আবার পাতলা টলটলে রঙের ব্যবহারে ছবির আর-এক রূপ। এটিই ছবির ত্বক বা Texture বা অঙ্কন রীতি। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও ছেনি, বাটালির গতি প্রকৃতিতে Texture-এর বিভিন্নতা আসে। ছবি আঁকার কাগজ, দেওয়াল, বোর্ড, কাপড় (দানাদার অথবা মসৃণ) ইত্যাদির ওপরও Texture নির্ভর করে।

(iii) **ছন্দ (Rhythm) ঃ স্পন্দন ও গতির সুষম প্রকাশই হল ছন্দ**। বিশ্ব প্রকৃতির সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে অন্তহীন এই সুষম ছন্দ অর্থাৎ স্পন্দন ও গতি। এক একটি গাছের এক একটি বিশেষ ছন্দ। মানুষের চলাফেরায় দেহ-ভঙ্গির বিভিন্ন ছন্দ, ভাব ও ভঙ্গির ভেতর দিয়েই ছন্দের প্রকাশ। ৮ম শতাব্দীর নাসিক (বোম্বাই) অঞ্চলের 'এলিফ্যান্টা গুহার' শিবের ত্রিমূর্তি (তিনটি মুখে—মাধুর্য, গাম্ভীর্য ও রুদ্র রস) বা উত্তর ভারতের সারনাথের বুদ্ধমূর্তি স্থিতি ছন্দের এবং দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোরের নৃত্যরত শিবের অর্থাৎ নটরাজ মূর্তি গতি ছন্দের অপূর্ব নিদর্শন। যে-কোনো মাধ্যমেই সৌন্দর্য সৃষ্টিতে ছন্দের এক বিশেষ স্থান।

(iv) **Balance বা ভারসাম্য** ঃ ভাবের এবং আকার আকৃতিতে সমতা। ছবির কোনো অংশ যদি ভাবের অথবা আকার আকৃতির আতিশয্যে ভারাক্রান্ত হয় অর্থাৎ বিষয়বস্তুর তথা রূপের ভারে ভারাক্রান্ত হয় তাহলে ছবি ভারসাম্য হারায়। রঙের ব্যবহারেও সেই একই কথা। ভারসাম্যের অসাধারণ উদাহরণ—ভিক্ষাপাত্র হাতে মহামানব বুদ্ধের সম্মুখে অতি ক্ষুদ্র কায়া গোপা ও রাহুলের ছবি। পিছনের তোরণ ভারসাম্য রক্ষা করছে।

(v) **সামঞ্জস্য (Adjustment)** ঃ ছবির মধ্যে বিভিন্ন দৃশ্যবস্তুর অথবা বিভিন্ন রঙের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, দূর-নিকট, ছোটো-বড়ো ইত্যাদির মধ্যেও সামঞ্জস্য থাকা চাই। যেমন—নিকটের গাছ থেকে একই আকার আকৃতির দূরের গাছ ছোটো করে আঁকতে হবে।

এককথায় শিল্প-শাস্ত্রের ষড়ঙ্গ অনুসারে দৃশ্য বস্তুর সব কিছুই যেন পরস্পর মানানসই ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। শিল্প-শাস্ত্রের ষড়ঙ্গ ঃ

রূপভেদঃ প্রমাণানি ভাব লাবণ্য যোজনম্।

সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্।।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন—

(১) রূপভেদ অর্থাৎ দৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান (রূপের বিভিন্নতা),

(২) প্রমাণ অর্থাৎ দৃশ্য বস্তুর সঠিক আকার আকৃতি,

(৩) ভাব—এটি অন্তরঙ্গের জিনিস যা ভঙ্গিতে কিছুটা বোঝা যায়,

(৪) লাবণ্য—এটি ভাবকে পরিমিতি দেয়, আনে মাধুর্য,

(৫) সাদৃশ্য—ভাবের অনুরণন,

(৬) বর্ণিকাভঙ্গ—সঠিক বর্ণ প্রয়োগ। সার্থক চিত্র রচনায় এই ছয়টি পূর্ণমাত্রায় থাকবে।

• ছবি কাকে বলে?

শিল্পসৃষ্টির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে উপাদানসমূহ দ্বিমাত্রিকতলে যখন সৌন্দর্য, অঙ্কনরীতি (Texture), ছন্দ, ভারসাম্য, সামঞ্জস্য কল্পনা, অনুভূতি ইত্যাদি সমন্বিত যে চিত্ররূপ সৃষ্টি হয় তাই হল ছবি।

শিল্প শাস্ত্রের ষড়ঙ্গ অনুসারে—যথার্থ রূপ, সঠিক আকার আকৃতি ও মাপজোখ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্যের আভাষ এবং যথাযথ বর্ণ প্রয়োগে হয় সার্থক চিত্র সৃষ্টি। ভারতীয় শিল্পকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল শিল্পের ষড়ঙ্গ।

মাত্রা (Dimension)

মাত্রা সম্পর্কে ধারণা (Concept of dimension) ঃ

পৃথিবীতে বিভিন্ন বস্তু বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রূপে দৃশ্যমান। এক একটা রূপের একেকরকম আকার থাকে। প্রত্যেক আকারে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা ও নির্দিষ্ট গভীরতা আছে। চিত্রশিল্পে বিভিন্ন আকারকে ড্রয়িং-এর মাধ্যমে জানা অবশ্যই দরকার।

পরবর্তীকালে একমাত্রিক, দ্বিমাত্রিক বা বহুমাত্রিক নিয়ে চর্চা অনেকদিন ধরেই চলছে। চিত্রচর্চার প্রথমদিকে ত্রিমাত্রিক কৌশল নিয়ে চর্চা হত না। পরে প্রাচীন গ্রিস, মিশর বা ভারতবর্ষে এই নিয়ে চর্চা শুরু হয়।

একমাত্রিক (One dimension) ঃ

শুধুমাত্র এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে মিলিত হয়ে যে লাইন তৈরি হয়, তা হল একমাত্রিক। যেমন নীচের চিত্র অনুযায়ী এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে মিলিত হয়ে লাইন তৈরি হচ্ছে। এগুলিকেই একমাত্রিক বা One dimension বলা হয়।

দ্বিমাত্রিক (Two dimension) ঃ

যে বস্তুর মধ্যে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ দেখা যায় তাকে দ্বিমাত্রিক (Two dimension) বলা হয়। নীচের চিত্রে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ইত্যাদি এঁকে দেখানো হয়েছে। এগুলি প্রত্যেকটা দ্বিমাত্রিক বস্তু। জ্যামিতিতে, বিজ্ঞানে দ্বিমাত্রিক বস্তুর ব্যবহার দেখা যায়। দ্বিমাত্রিক বস্তুগুলি ত্রিমাত্রিক বস্তুর বিমূর্ত রূপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

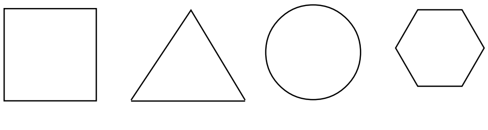

দ্বিমাত্রিক চিত্র (2D Painting) ঃ এই চিত্র বলতে দ্বিমাত্রিক বস্তুকে বোঝায়। একটি দৃশ্যকে নির্দিষ্ট সীমায়নে, সমগ্র পরিধিকে একটি নির্দিষ্ট Frame-এর মধ্যে আবদ্ধ করে। একটি সমতল ক্ষেত্রের উপর দুটি তল বোঝানোর প্রচেষ্টা চিত্রের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

ত্রিমাত্রিক (Three dimension) ঃ

দ্বিমাত্রিক বস্তুগুলিকে কীভাবে ত্রিমাত্রিক আকার দেওয়া হয়েছে তা নীচে দেওয়া হল। যে বস্তুর মধ্যে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা দেখা যায়, তাকে ত্রিমাত্রিক (Three dimension) বলা হয়। নীচের চিত্রে Circle থেকে Sphere বা Square থেকে Cube এবং Triangle থেকে Pyramid-এর পরিবর্তিত রূপ দেখানো হয়েছে। দ্বিমাত্রিক বস্তুকে ত্রিমাত্রিক রূপ দেওয়া হয়েছে। চিত্রশিল্পে দ্বিমাত্রিক কাগজে, ক্যানভাসে বা শিক্ষার্থীকে still life বসিয়ে অনুশীলন করা প্রয়োজন। সব থেকে ভালো হয় যদি নীচের চিত্র অনুযায়ী কাঠের তৈরি ত্রিমাত্রিক বস্তু still life হিসেবে সাজিয়ে অনুশীলন করা যায়। বাক্স, বল, শঙ্কু, পিরামিড ইত্যাদি ধরনের ত্রিমাত্রিক বস্তু নিয়ে ড্রয়িং করলে, ত্রিমাত্রিক বস্তুর সম্পর্কে ধারণা সুদৃঢ় হয়।

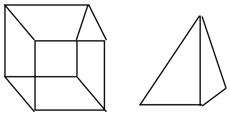

তবে চিত্রশিল্পে এই তিনটি Dimension ছাড়া আরও একটি Dimension-এর ব্যবহার দেখা যায়। যাকে Fourth Dimension বলা হয়। বিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসো ও জর্জ ব্রাক যখন কিউবিজম নিয়ে চর্চা শুরু করেন তখন থেকেই এই Fourth Dimension-এর ব্যবহার শুরু হয়। তার আগে সেঁজান Basic Structure অর্থাৎ চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ, বৃত্ত নিয়ে ত্রিমাত্রিকভাবে ছবিতে ব্যবহার করেছেন। সেঁজানের ছবির মধ্যে Fourth Dimension কিছুটা এসেছিল। কিন্তু পিকাসো ও ব্রাকের Analytic Cubism-এর Fourth Dimension-এর ব্যবহার চূড়ান্তভাবে হয়েছিল। Fourth Dimension-এ বিখ্যাত ছবি 'Demoiselles D Avignon' পাবলো পিকাসো 1907 খ্রিস্টাব্দে এঁকেছিলেন। আর এক বিখ্যাত শিল্পী সালভাদোর দালির crucifixion-এ Fourth Dimension ব্যবহৃত হয়েছে।

পরবর্তীকালে ফিজিক্সেও Fourth Dimension হিসেবে সময়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। "Futurist" আন্দোলনের শিল্পীরা time-কে ছবিতে দেখানোর চেষ্টা করেন। বিশেষ করে ফিজিক্সের এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তাঁরা তাঁদের ছবির আন্দোলন গড়ে তোলেন।

চিত্রে Dimension নিয়ে চর্চা করতে হলে বিভিন্ন বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তাদের আকার ও Dimension-এর পার্থক্য জানা দরকার। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর পার্থক্য শুধু আকারে নয় দূরত্বে, টেক্সচারে, রঙে প্রভৃতি সবক্ষেত্রে লক্ষ করা দরকার। এইজন্য প্রাচীন ভারতের টীকাকার যশোধরা লিখেছেন—

"রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাব-লাবণ্য-যোজনং।
সাদৃশ্যং বণিকা-ভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্।"

উপরোক্ত শ্লোকে প্রথমেই রূপভেদঃ কথাটি বলা হয়েছে। আকারের সঙ্গে আকারের পার্থক্য, রঙের পার্থক্য, গভীরতার পার্থক্য, দৈর্ঘ্যের পার্থক্য, প্রস্থের পার্থক্য ইত্যাদি সব পার্থক্য সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

ত্রিমাত্রিক ভাস্কর্য (3D Sculpture) ঃ ভাস্কর্য একটি ত্রিমাত্রিক বস্তু। ভাস্কর্যের তিনটি তল অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা থাকে। চারিদিক থেকে ভাস্কর্য দেখা যায়।

ড্রইং ও পেন্টিং (Drawing & Painting)

ড্রয়িং বলতে এককথায় বুঝি রেখাচিত্র এবং পেন্টিং বলতে বুঝি রং করা ছবিতে ড্রয়িং একটা অংশ ও পেন্টিং আর-একটা অংশ। ড্রয়িং হল যে-কোনো ছবির প্রাথমিক ধাপ। যদিও ড্রয়িং আলাদা ছবি হিসেবেও দেখা যায়। ভালো ড্রয়িং না জানলে পেন্টিং

করা যায় না। ড্রয়িং করার জন্যে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করা হয়। যেমন—পেনসিল, চারকোল, পেন অ্যান্ড ইংক, কন্টি, ড্রাই প্যাস্টেল প্রভৃতি।

ড্রয়িং ঃ

ড্রয়িং চর্চা করতে গেলে সহজ কিছু আকার নিয়ে কাজ করা জরুরি যেমন স্টিল লাইফ অর্থাৎ জড়বস্তু ড্রয়িং করলে শিক্ষার্থীদের ড্রয়িং-এর ধারণা সুদৃঢ় হয়। ধরা যাক কোনো গ্লাস বসিয়ে ড্রয়িং করা হল বা ফুলদানি, মগ, হাঁড়ি, শিশি ইত্যাদি সামনে রেখে ড্রয়িং করা যেতে পারে। এরপর পাতা, ফুল, গাছ ইত্যাদি নিয়ে ড্রয়িং করা যাবে। ধীরে ধীরে পশু, পাখি, মানুষ ইত্যাদি আঁকার চর্চা করতে হবে। ড্রয়িং একজন শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস তৈরি করে। তবে শুরুতে বিভিন্ন টেকনিক বা শৈলী বা উন্মেষধর্মিতা এসব নিয়ে চর্চা না করা ভালো। সহজ-সরল, সাবধানী, স্বচ্ছন্দ রেখা দিয়ে ড্রয়িং অভ্যাস করা ভালো।

আলো ও ছায়া ঃ

ড্রয়িং-এর সঙ্গে সঙ্গে আলোছায়া অর্থাৎ লাইট অ্যান্ড শেড এসে পড়ে। যদিও শুধুমাত্র রেখার সাহায্যেও ছবিতে দ্বিমাত্রিকতা ফুটে ওঠে। আলোছায়ারও বিভিন্ন ভাগ আছে। যেমন—(ক) প্রাকৃতিক বা ন্যাচারাল অর্থাৎ সূর্যের আলো (খ) কৃত্রিম বা আর্টিফিশিয়াল অর্থাৎ বিদ্যুতের আলো, (গ) প্রয়োজনভিত্তিক ও পরিকল্পিত, তবে শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রাকৃতিক আলোছায়া নিয়ে চর্চা করার ক্ষেত্রে পেনসিল বা মনোক্রাম অর্থাৎ এক রঙে অভ্যাস করা দরকার। তাতে রঙের টোন সম্পর্কে ধারণা দৃঢ় হয়।

কম্পোজিশন ঃ

ছবির মধ্যে কতকগুলি অংশ সম্পর্কে ধারণা থাকলে ভালো ছবি আঁকা যায়, যথা—(১) ড্রয়িং (২) কম্পোজিশন (৩) পারসপেক্টিভ (৪) কেন্দ্রবিন্দু (৫) আলোছায়া (৬) রং। এছাড়া রেখা ছন্দ বৈপরীত্য জায়গা প্রভৃতি ছবি আঁকতে গেলে প্রয়োজন হয়। ড্রয়িং ও আলোছায়া নিয়ে আলোচনা আগেই করা হয়েছে। কম্পোজিশন নিয়ে এবার আলোচনা করা দরকার, কারণ ছবি আঁকার ক্ষেত্রে কম্পোজিশন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কম্পোজিশন বলতে 'রচনা' বোঝায় অর্থাৎ গঠন বা নির্মাণ বিন্যাস বা সাজানো। কম্পোজিশন সময় অনুযায়ী পালটে গেছে। রেনেসাঁতে ইউরোপে যে ধারণা ছিল, পরবর্তীকালে তা পরিবর্তিত হয়েছে। কম্পোজিশনের চারটে শর্ত হল—বিষয়বস্তু (Content), শৈলী (Style), আঙ্গিক (Texture) ও নান্দনিক আবেদন (Aesthetics)।

যদিও কম্পোজিশনের নির্দিষ্ট কোনো ছক নেই তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কম্পোজিশন দেখা গেছে, যেমন—সিমেট্রিক্যাল (symmetrical), ফরমাল (formal), সার্কুলার (circular), হরাইজন্টাল (horizontal) ইত্যাদি। তবে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে জটিল কম্পোজিশন না নেওয়া ভালো। সহজ-সরল object নিয়ে কাজ করা ভালো, তাতে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। দু-একটা মানুষ বা পশু নিয়ে কম্পোজিশন করা যেতে পারে।

কেন্দ্রবিন্দু ঃ

যে ছবি আঁকি না কেন তাতে একটা কেন্দ্রবিন্দু থাকবে অর্থাৎ ছবির মূল বিষয়বস্তুকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। বাকি অংশে অন্যান্য বিষয়কে অতখানি গুরুত্ব দেওয়া যাবে না। বাকি অংশগুলি মূল বিষয়কে দেখতে সাহায্য করবে, মূল কেন্দ্রবিন্দুতে ছবির বিষয় ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

স্কেচিং (Sketching) ঃ

স্কেচিং কথার প্রচলিত অর্থ মোটামুটি একটা ধারণা দেওয়া অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া। স্কেচিং বলতে বুঝি, 'A simply or hastily executed drawing or painting, especially a preliminary one, giving the essential feature without the details.'

শিল্পকলায় স্কেচিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদিও শিল্পকলার ক্ষেত্রে স্কেচ, ড্রইং ও স্টাডি এই তিনটে কথার প্রচলন আছে। এর মধ্যে স্কেচ অন্য দুটির থেকে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত রূপ। স্কেচিং করার উদ্দেশ্য দ্রুততার সঙ্গে স্বল্প রেখার সাহায্যে কোনো কিছুর

সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়ার বিশেষ দক্ষতা আয়ত্ত করা। স্কেচ হল ড্রইং ও স্টাডির আগের ধাপ। ছবি আঁকার প্রাথমিক ধাপ হল স্কেচ। স্কেচিং-এর মধ্য দিয়ে একজন শিল্পীর হাত পরিণত হয় এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

পূর্বে শিল্পীরা কোনো বড়ো কাজ করার আগে একটি প্রাথমিক খসড়া করে নিত। বিশেষ করে প্রাক-রেনেসাঁ, রেনেসাঁ ও রেনেসাঁ-উত্তর শিল্পীদের মধ্যে চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য নির্মাণের পূর্বে ছোটো মাপের অনেকগুলি স্কেচ করে নিত। যা কোনো বড়ো শিল্পকার্য শুরুর আগে আত্মবিশ্বাস তৈরি করত। বিভিন্নভাবে শিল্পকার্যকে দেখতে স্কেচিং সাহায্য করত। কিন্তু পরবর্তীকালে স্কেচিং আলাদা শিল্পমাধ্যম হিসেবে প্রকাশিত হয়। আজকের শিল্পীর কাছে স্কেচ একটি বিশেষ আর্টফর্ম হিসেবে গণ্য করা হয়, যার মধ্য দিয়ে শিল্পীর সৃষ্টিশীল চিন্তাচর্চার তাৎক্ষণিক অভিব্যক্তির প্রতিফলন ঘটে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়াম বা উপকরণের তারতম্যের কারণে স্কেচের আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটে। নিম্নে কয়েকটি স্কেচিং-এর মাধ্যম নিয়ে আলোচনা করা হল।

পেনসিল (Pencil) ঃ

স্কেচিং-এর জন্য পেনসিল সব থেকে উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। পেনসিল বর্তমান সমাজজীবনে এক অপরিহার্য মূল্যবান বস্তু। সমাজের সর্বক্ষেত্রে এর ব্যবহার। শিশু থেকে শিল্পী, কারুশিল্পী থেকে ইঞ্জিনিয়ার সবক্ষেত্রেই এর ব্যবহার চলে। আধুনিক যুগে টেকনোলজির কারণে ড্রয়িং বা ছবি আঁকার উপযোগী আরও উন্নত উপকরণ পাওয়া যায়, তবু পেনসিলের প্রয়োজনীয়তা একটুও কমেনি। পেনসিল ব্যবহার করেনি এরকম মানুষ পাওয়া দুষ্কর। শিল্পচর্চায় পেনসিল প্রাথমিক খসড়া, শিক্ষানবিশি কাজে খুবই ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্পীদের পেনসিলে আঁকা ছবি দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। পেনসিলে স্পর্শকাতর লাইন দেখলে শিল্পীর মান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, পিকাসো প্রমুখ শিল্পীর পেনসিলে লাইন দেখলে বোঝা যায় তা কত sensitive ও অর্থবহ।

পেনসিল আবিষ্কারের আগে কোনো ছবির ড্রয়িং বা খসড়া তৈরি করতে চারকোল বা তুলি ব্যবহৃত হত। প্রাচীন গ্রিসে শিল্পীরা পাতলা লেড (led) বা সিসার টুকরো ব্যবহার করতেন। কয়েক শতাব্দী পরে সিসা ও টিন এই দুই ধাতুর মিশ্রণে তৈরি মিশ্র ধাতু (Alloy) দিয়ে কাজ করা হত। কিন্তু এই মিশ্রণেও সমস্যার সমাধান হয়নি। 1400 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বোভেরিয়াতে গ্রাফাইট আবিষ্কার হয়। কিন্তু গ্রাফাইট ধাতু হিসেবে খুবই নরম। ফলে ব্যবহার করতে গিয়ে সমস্যা দেখা দিল। এরপরে 1875 খ্রিস্টাব্দে গ্রাফাইটের সাথে পরিমাণমতো মাটি মিশিয়ে আবিষ্কৃত হল আধুনিক পেনসিলের শিষ। নিকোলাস জ্যাকুইস্কুন্তি নামে একজন ফরাসি ভদ্রলোক পেনসিলের আবিষ্কারক। কিন্তু বর্তমান পেনসিলের কাঠের অংশটুকু আবিষ্কার করেন ইতালির এক দম্পতি সিমোনিও ও লিনডিয়ানা বার্নাকোত্তি।

পেনসিলের দুটো অংশ—শিষ ও কাঠের তৈরি বডি। পেনসিলের প্রধান জিনিস হল শিষ। শিষের মানের উপর নির্ভর করে পেনসিলের গ্রেড পাওয়া যায়। পেনসিল সাধারণত তিনটে গ্রেডের হয়, যথা—নরম, মাঝারি ও শক্ত। নীচে গ্রাফের মধ্যে পেনসিলের গ্রেড দেখানো হল।

6H 5H 4H 3H 2H H (HB) B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 10B

⟷

HB কথার অর্থ Hard black অর্থাৎ Hard-ও আছে, black-ও আছে। HB পেনসিল হচ্ছে মাঝারি বা মিডিয়াম। আমরা বাজারে সাধারণত যে পেনসিল পাই তা হল HB। নরম বা soft পেনসিল : B থেকে 10B অবধি যে পেনসিল পাওয়া যায়, তা হল নরম। ছবি আঁকার ক্ষেত্রে এই পেনসিল ব্যবহার করা হয়। B থেকে যত উপরদিকে যাব, ততই নরম ও গাঢ় পেনসিল পাওয়া যাবে অর্থাৎ 10B হচ্ছে সব থেকে নরম ও গাঢ়। এ ধরনের পেনসিল বাইরে থেকে আঘাত পেলে কাঠের অংশের ভেতরের শিষ টুকরো হয়ে যায়। নরম বা সফ্‌ট পেনসিল shade-এর জন্য উপযুক্ত। পেনসিলের ছবি আঁকার জন্য soft পেনসিলগুলি উপযুক্ত।

Hard বা শক্ত পেনসিল ঃ H থেকে 6H অবধি Hard পেনসিল। এই পেনসিল ট্রেসিং ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন কোম্পানি অনুযায়ী পেনসিলের গ্রেড পরিবর্তিত হয়। কোনো কোম্পানি H থেকে 3H অবধি বার করে, আবার B থেকে 6B অবধি রয়েছে।

• চিত্রাঙ্কন ও রঙের সাহায্যে ছবি আঁকা ঃ

• উপকরণ ঃ HB, 2B, 6B পেনসিল রাবার, Sketch Pen, ১নং, ৪নং, ১২নং তুলি, রঙের পাত্র রং, জলের পাত্র, ন্যাকড়া, ড্রইং বোর্ড, বোর্ড পিন/ক্লিপ, কার্টিজ পেপার।

প্রথমে ছবি আঁকার হাত তৈরি করার জন্য সাধারণ যে-কোনো সাদা কাগজে আঁকা শুরু করা যাবে। আঁকা চলবে সম্পূর্ণ 'ফ্রি হ্যান্ড ড্রইং'-এ। অর্থাৎ, স্কেল, কম্পাস কোনো কিছুরই ব্যবহার হবে না। HB অথবা 2B পেনসিল শিষ থেকে ১ উপরে হালকা করে ধরে, হাতের কড়ে আঙুলটি কাগজের উপর আলতো করে ছড়িয়ে হাতের ভর রাখতে হবে। খুব হালকা করে যতটা বড়ো করা সম্ভব সে ভাবে উপর থেকে নীচে, নীচ থেকে উপরে, ডান থেকে বামে আবার বাম থেকে ডানে সরলরেখা টানার অভ্যাস করতে হবে। রাবারের ব্যবহার কোনোভাবেই হবে না। এরপর একটানে বৃত্ত, অর্ধবৃত্ত আঁকার অভ্যাস করতে হবে অবশ্যই বড়ো করে, বৃত্তের ব্যাসার্ধ অন্তত ৩ হবে। স্বভাবতই বৃত্ত ঠিক মতো হবে না। রাবারে না মুছে আগের আঁকার ওপর দিয়েই পরপর এঁকে যেতে হবে খুব হালকা করে যতক্ষণ মোটামুটি ঠিক না হয়। এবার ঠিক অংশটি রেখে বাকি মুছে ফেলা হবে রাবার দিয়ে। অর্থাৎ সব শেষে একবার মাত্র রাবারের ব্যবহার হল। এভাবে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বক্ররেখাও আঁকা চলবে। ১ থেকে ৯ সংখ্যার সাহায্যে ছবি আঁকা হবে। এরপর Match Stick drawing এবং পরে Massive drawing-এর সাহায্যে জীবজন্তু, গাছ, মানুষ, পাতা, ফুল ফল ইত্যাদি আঁকার অভ্যাস করতে হবে। দেশলাই কাঠি সাজিয়ে বিশেষ ভঙ্গিসহ সহজে ছবি আঁকা যায় বলে Match Stick নাম। এসবই একদম প্রাথমিক স্তরে। এগুলির ছবি দেওয়া হল বুঝবার জন্য। সম্ভব হলে বোর্ডে খুব বড়ো করে এই আঁকাগুলি অভ্যাস করলে তাড়াতাড়ি হাত তৈরি হবে, রেখার সাবলীলতা আসবে, জোর আসবে। একটি অর্ধবৃত্ত এঁকে তার নীচে গাছের কান্ডের মতো দুটি রেখা আঁকলে গাছ হবে। একটি ত্রিভুজ, নীচে চতুর্ভুজ এঁকে ঘর হবে। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, যতটা সম্ভব গাছ, ঘর, নৌকা ইত্যাদি খুব ভালো করে দেখে তারপর আঁকার অভ্যাস করতে হবে। নদী অঞ্চলের অনেক ছাত্রছাত্রীকে দেখা গেছে তারা বহুবার নৌকা চড়েছে; কিন্তু নৌকা আঁকতে গিয়ে গামলা এঁকেছে। এটা হওয়ার কারণ—নৌকার আকার আকৃতি ভালো করে লক্ষই করেনি। ছবি আঁকে মন। যে-কোনো জিনিসকে খুব ভালো করে দেখে মনের মধ্যে তার ছবি এঁকে নিতে হবে। তবেই সামান্য চেষ্টা করলে সেই ছবি খুব সহজেই আঁকা যাবে। তাতে হুবহু একরকম না হলেও ছবির রসের কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে তা সামনে দেখে আঁকতে হবে।

পেনসিলের সাহায্যে ড্রইং কিছুটা রপ্ত হলে Sketch Pen, তুলি দিয়ে, চাইনিজ ইংক ও কালো পোস্টার রঙে ড্রইং করার অভ্যাস করতে হবে। কোনো কিছু সামনা সামনি দেখে Sketch করার অভ্যাস করতে হবে এবং যথাসম্ভব খাতার থেকে পেনসিল বা Sketch Pen না তুলে, একটানে, যা দেখে আঁকা হচ্ছে তা যদি স্থান বা ভঙ্গি পরিবর্তন করে তাহলে ওই পর্যন্তই আঁকা হবে। দ্রুত আঁকার অভ্যাস করতে হবে মন থেকে বাকি অংশ এঁকে শেষ করা হবে না।

এরপর আসবে ত্রিমাত্রিক ধারণা দেওয়ার জন্য Shade বা আলোছায়ার ব্যবহার। যেদিকে সবচেয়ে বেশি আলো সে দিক ছেড়ে মাঝামাঝি থেকে বিপরীত দিক পর্যন্ত হালকা করে পেনসিলের Shade দিতে হবে পাশাপাশি ঘন ঘন রেখা টেনে। প্রয়োজনে সম্পূর্ণ ছায়াবৃত্ত অংশটি আরও একবার Shade দিতে হবে পাশাপাশি ঘন ঘন রেখা টেনে। তারপরে সম্পূর্ণ ছায়াবৃত্ত অংশটি আরও একবার Shade দিতে হবে একইভাবে। তাহলে আলোছায়ার তিনটি মাত্রা এল। খুব ঘন Shade, হালকা Shade, একেবারে সাদা। এবার প্রয়োজন বুঝে স্থানে স্থানে Shade দিতে হবে। জানলার ধারে একটি মাটির কলসি বসিয়ে ছয় ফুট দূরত্বে বসে ড্রইং করে নিয়ে আলোছায়া দেখে Shade দেওয়ার অভ্যাস করলে ভালো। একটি ড্রইং বোর্ডের ওপর চারকোণে চারটি বোর্ড পিন এঁটে কাগজে আঁকা হবে। Shade দেওয়ার জন্য 6B পেনসিল ব্যবহার করা হবে। পেনসিলটি কাটতে হবে সরু চ্যাপ্টা বাটালির মতো, অর্থাৎ সাধারণ গোলভাবে নয়। এক্ষেত্রে পেনসিল ধরা হবে একটু অন্যভাবে। পেনসিলটি সবটাই হাতের তালুর মধ্যে ধরা থাকবে। এটা ধীরে ধীরে অভ্যাস হলে এভাবে ড্রইংও করা হবে, এতে পেনসিলে চাপ খুব বেশি পড়ে না। পেনসিলের শিষটি প্রায় শুইয়ে সমস্ত অংশ দিয়ে Shade দেওয়ার ফলে দেখতে ভালো হবে। অর্থাৎ চওড়া রেখা পড়বে।

এরপর শুরু হবে রং দিয়ে ত্রিমাত্রিক রূপ ফুটিয়ে তোলার কাজ। এর জন্য বিভিন্ন রং, রং গোলার পাত্র বা প্যালেট, তুলি মোছার ন্যাকড়া, জলপাত্র, ১নং, ৩নং, ৬নং, ১২নং জলরঙের গোল তুলি প্রয়োজন। এই তুলিগুলি হল—সেবল (Sable) হেয়ার

ব্রাশ, ‘স্কুইরাল হেয়ার ব্রাশ’ অর্থাৎ কাঠবেড়ালির ল্যাজের লোমের তৈরি। যাদের পক্ষে সম্ভব—মরা কাঠ বেড়ালির এই লোম বা ছাগলের ল্যাজের লোম সরু মোটা ভেদে একসঙ্গে নিয়ে (গুচ্ছ করে) কাঠির ডগায় শক্ত করে বেঁধে তুলি তৈরি করে নিতে পারে। তুলির ডগা যেন ছুঁচলো হয় অর্থাৎ মোটা থেকে সরু। সাধারণভাবে রং দেওয়ার জন্য ৫নং/৬নং তুলি ব্যবহৃত হবে। বড়ো মোটা অংশের জন্য ১২নং এবং সরু রেখার জন্য ১নং/৩নং দরকার। প্রয়োজন মতো রং পাতলা করে নিয়ে প্যালেটে তুলি ঘুরিয়ে ভালো করে তুলিতে রং তুলে তুলিকে সামান্য শুইয়ে খুব দ্রুত টানতে হবে। শুকনো তুলি ঘষলে অনাবশ্যক দাগ পড়বে। রং কিছুটা শুকোলে দ্বিতীয়বার রং না ঘষে শুধু চাপিয়ে দিয়ে আঁকতে হবে। এইভাবে ৩/৪ বারের বেশি আর কখনোই রং দেওয়া হবে না। তাহলে ছবি নোংরা হবে। ছবিতে সাদার প্রয়োজন খুব বেশি। সম্পূর্ণ আলোর দিকে কাগজের ওপর কোনো রং দেওয়া হবে না। সাদা রঙের ব্যবহার হবে না। তবে, টেম্পারা রীতিতে ছবি আঁকলে সাদা রং মিশিয়ে তৈরি করে নিয়ে যা যা রং লাগবে তা সব প্রস্তুত করে নিয়ে তুলোট কাগজ বা নেপালি হ্যান্ডমেড কাগজ বা অন্য মোটা কাগজে হালকা করে ঘষে রং দিতে হবে। রঙের Shade ঠিক মতো হয়েছে কিনা দেখে নেওয়ার জন্য পাশে একটি কাগজ রাখতে হবে, তাতে রং দিয়ে দেখে নিয়ে তারপর কাজ হবে।

অচেতন বস্তুর চিত্র আঁকা (Still life) ঃ কলসি আঁকা

রঙে ছবি আঁকার জন্য প্রথমে মাত্র একটি রঙে ছবি আঁকার অভ্যাস করতে হবে। ধরা যাক মাটির কলসি রং দিয়ে আঁকা হবে। তাহলে, খয়েরি বা বার্নট সায়ানা রং দিয়ে আলোর দিকে সাদা ছেড়ে ছায়ার অংশ হালকা করে রং দিয়ে পরে ঘন ছায়ার দিক আবার রং দিয়ে দিতে হবে। কলসির মাঝখান উঁচু গোল—তাই রঙের মধ্যেও সেই অংশ হালকা রঙের হবে। ক্রমশ তলার দিকে ঘন রং হবে। প্রয়োজনে এসব অংশে সামান্য কালো মিশিয়ে রং দিতে হবে।

ছবি আঁকার সময় খুব details-এর কাজ সবসময়েই বর্জনীয়। গাছ আঁকার সময় গাছের এক একটা Bhunch বা শাখা প্রশাখা শুধু আঁকা হবে। গাছের আলাদা পাতা নয়।

ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করলে গাছের পাতা আঁকা হবে কালো সীমারেখার মধ্যে। কাংড়া ও রাজপুত পেন্টিংস-এর বই দেখে এগুলি অভ্যাস করলে ধারণা হবে। ড্রইং-এর ক্ষেত্রে আচার্য নন্দলাল বসুর ‘রূপাবলীর’ (কয়েকটি খণ্ডে) চিত্রসমূহ কপি করলে ভালো।

মানুষের আকার-আকৃতি ইত্যাদি আঁকার জন্য Human Drawing-এর কোনো বই দেখে আঁকার অভ্যাস করা ভালো। গাছ, জীবজন্তু আঁকার ক্ষেত্রেও একই কথা—কিছু Drawing-এর বই দেখে অভ্যাস করা ভালো। তবু সামান্য ধারণা দেওয়ার জন্য বলা—শিশুর মাথা বয়স্ক মানুষের তুলনায় বড়ো। হাত-পা দেহ একটু নাদুস নুদুস গোল ভাব অর্থাৎ হাড়গোড়ের কাঠিন্য থাকবে না। নারী দেহের থেকে পুরুষ দেহের কাঁধ বুক বেশি চওড়া হবে এবং নিতম্ব সরু হবে অর্থাৎ নারী দেহের নিতম্ব পুরুষ দেহের নিতম্বের তুলনায় চওড়া বেশি হবে। কাগজ অর্থাৎ কার্ট্রিজ পেপার দরকার। ছবি আঁকার জন্য দানাযুক্ত কাগজের কথা বলা হয়, কারণ—দানাযুক্ত কাগজ হলে জল রংই হোক, পেনসিল রঙ হোক তা কাগজের গায়ে ভালোভাবে বসে যায়। Wax Pastel করতে হবে।

প্যাস্টেল ঃ

মোমের মতো ব্যবহারোপযোগী বিভিন্ন রং-খড়ি হল প্যাস্টেল। প্যাস্টেল তিন ধরনের হয়। (১) অয়েল প্যাস্টেল, (২) ড্রাই প্যাস্টেল ও (৩) ওয়াক্স প্যাস্টেল। চকখড়ির সঙ্গে প্যাস্টেলের প্রস্তুতিগত পার্থক্য আছে। চকখড়ি বোর্ডে লেখার উপযুক্ত। প্যাস্টেল কাগজের ওপর আঁকার উপযুক্ত।

প্যাস্টেল শব্দটি ফরাসি। ফরাসি শিল্পীদের মধ্যেই এর বহুল ব্যবহার প্রথমে শুরু হয়। উনিশ শতকের ফরাসি শিল্পী এড্গার ডেগাস প্যাস্টেলের মাধ্যমে অসাধারণ শিল্প সৃষ্টি করেছেন। আমাদের দেশে সাম্প্রতিক কালের শিল্পী গোপাল ঘোষ প্যাস্টেলের মাধ্যমে ছবি আঁকায় উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছেন। প্যাস্টেলের আঁকা ল্যান্ডস্কেপ অসাধারণ। লাতিন শব্দ পেস্টা, পেস্ট থেকে প্যাস্টেল শব্দের উৎপত্তি। ১৬৬২-তে প্যাস্টেল শব্দটি ব্যবহার হতে শুরু হয়।

(ক) ড্রাই প্যাস্টেল — জলের মিশ্রণে তৈরি গুঁড়ো রংকে পেস্টের মতো করে শুকিয়ে তৈরি হয় ড্রাই প্যাস্টেল।

(খ) ওয়াক্স প্যাস্টেল — গলানো মোমের মিশ্রণে গুঁড়ো রঙের পেস্ট শুকিয়ে হয় ওয়াক্স প্যাস্টেল।

(গ) অয়েল প্যাস্টেল —তেলের মিশ্রণে (লিসনিড অয়েল ও তার্পিন তেল) গুঁড়ো রঙের পেস্ট শুকিয়ে পাওয়া যায় অয়েল প্যাস্টেল। এর ব্যবহার শুরু হয় অনেক পরে। এর উজ্জ্বলতাও অনেক বেশি। অয়েল প্যাস্টেলে আঁকা ছবির ওপর তেল রঙেরও অল্প কাজ করা যায় যেমন শিল্পী গোপাল ঘোষ অনেক ক্ষেত্রেই করতেন। **বিভিন্ন রঙের প্যাস্টেল পেপার ছাড়াও দানাযুক্ত মোটা কাগজেই প্যাস্টেলে ভালো কাজ হয়**। ছবিতে বিশেষ 'টোনাল এফেক্ট' সৃষ্টির জন্য বিশেষ রঙের প্যাস্টেল ব্যবহার করা হয়। হালকা জলরঙের ছবি এঁকে তার ওপর প্যাস্টেল দিয়ে আঁকলে আলাদা এক ধরনের এফেক্ট সৃষ্টি হয়—বিশেষত প্রাকৃতিক দৃশ্যের ক্ষেত্রে।

• প্যাস্টেলে আঁকার পদ্ধতি ঃ

১। প্যাস্টেলে আঁকার পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ সরল। তবে, অতি উচ্চমানের ছবি আঁকতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে হয়। কোন্ রঙের উপর কোন্ রং চাপালে উজ্জ্বলতা নষ্ট হবে না, তার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়।

২। প্যাস্টেল পেপার, মোটা কার্টিজ পেপার বা অন্য মোটা কাগজ বেছে নিতে হবে কাজের জন্য। টোনাল এফেক্ট সৃষ্টির জন্য বিশেষ রঙের প্যাস্টেল পেপার দরকার।

৩। ইজেলে রাখা ড্রইং বোর্ডের উপর কাগজটি টান করে রেখে চারধারে বোর্ড ক্লিপ দিয়ে আটকানো হবে।

৪। প্রথমে হালকা করে ড্রইং করে নিতে হবে পেনসিলের সাহায্যে। ইরেজারের ব্যবহার না করাই উচিত, এতে কাগজ নষ্ট হয়, কালো ছোপ ধরে যায় বেশি ইরেজার ঘষলে। তৈরি হাত হলে সরাসরি প্যাস্টেলেও ড্রইং করে নেওয়া যায়।

৫। দু'ভাবে আঁকা যায়। লাইনের পাশে লাইন দিয়ে অর্থাৎ স্ট্রোক দিয়ে দিয়ে আঁকা যায়। আবার চেপে ঘষে ঘষেও আঁকা যায়। প্রয়োজনে দু'রকম পদ্ধতি মিশিয়েও কাজ হয়। এসবই নির্ভর করে নিজস্ব অভিজ্ঞতার ওপর।

৬। এই রং দীর্ঘস্থায়ী। প্যাস্টেলের ওপর প্রয়োজনে তেল রঙেরও সামান্য কাজ করা যায়।

৭। তেল রঙে যেমন রং শুকিয়ে আবার রং দেওয়া হয়, এতে সে ব্যাপার নেই। বিরতি না দিয়ে রঙের পর রং চাপানো যায়।

৮। সাধারণভাবে হালকা থেকে গাঢ় রঙে যাওয়া যায়। একান্ত প্রয়োজনে গাঢ় রঙের ওপর সাদা ঘষে আবার হালকা রং দেওয়া যায়। সাদা ছেড়েও কাজ শুরু করা হয়।

৯। অয়েল প্যাস্টেলে আঁকা ছবি বেশ উজ্জ্বল হয়।

১০। শিশুরা রং দিয়ে ছবি আঁকতে বেশি ভালোবাসে। শিশুদের কাছে সেই হিসাবে প্যাস্টেল হল অন্য যে কোনো মাধ্যমের থেকে ভালো, অনেক সহজসাধ্য। অন্য প্যাস্টেলের থেকে ওয়াক্স প্যাস্টেলের দাম বেশ কম। একটি বাক্সে মোটামুটি প্রয়োজনীয় রং সবই থাকে। শিশুরা ইচ্ছামতো সেগুলি সহজেই ব্যবহার করতে পারে।

১১। শিশুরা অবশ্য ঘষে ঘষেই রং করবে।

১২। অন্য যে কোনো মাধ্যমের থেকে অনেক অল্প সময়েই প্যাস্টেলে ছবি আঁকা শেষ হয়।

১৩। ড্রাই প্যাস্টেলে ছবি আঁকলে মাউস স্প্রেয়ার দিয়ে পাতলা আঠার জল স্প্রে করে দেওয়া হয়।

• প্যাস্টেলের বৈশিষ্ট্য ঃ

১। প্যাস্টেলের আঁকার পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ সরল। শিশুরা নির্ভয়ে আনন্দের সঙ্গে এই কাজ করতে পারে।

২। এই রং সহজে নষ্ট হয় না।

৩। সংশোধন করার জন্য সাদা রং ঘষে আবার ঠিকমতো রং করা যায়।

৪। খুব অল্প সময়েই ছবি আঁকা শেষ করা যায়।

৫। প্যাস্টেল সহজেই স্বল্প দামে পাওয়া যায়।

৬। উপকরণ বলতে শুধুই প্যাস্টেল আর কাগজ।

৭। সাধারণভাবে যে কোনো কাগজেই প্যাস্টেলে আঁকা সম্ভব।

জল রং (Water Colour) ঃ

যে রং জলের সঙ্গে মিশিয়ে স্বচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়, তাকেই জল রং বলে অর্থাৎ জল রং বলতে Transparent বা স্বচ্ছ জল রংকে বুঝি। বাজারে দু-ধরনের জল রং পাওয়া যায়—(1) কেক, (2) টিউব। জল রং বলতে জলের সঙ্গে রং মিশিয়ে ছবি আঁকা বোঝায়। সেক্ষেত্রে টেম্পারা, গোয়াশ, পোস্টার কালার জল রঙের মধ্যে পড়ে যায়। কারণ এইসব মাধ্যমের ক্ষেত্রে জল ব্যবহার করা হয়। জল ব্যবহার করে দু-রকম ছবি করা হয়।

(1) স্বচ্ছ জল রং অর্থাৎ Transparent water colour

(2) অস্বচ্ছ জল রং অর্থাৎ Opaque water colour

পূর্বে ভারতীয়, মিশরীয় শিল্পীরা জল ব্যবহার করে টেম্পারা, ফ্রেস্কো, গোয়াশ প্রভৃতি পদ্ধতিতে কাজ করেছিলেন। কিন্তু স্বচ্ছ জল রঙের ব্যবহার পঞ্চদশ শতকে প্রথম জার্মান শিল্পী ডুরার আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে টার্নার, উইনস্লো, হোমার প্রমুখ শিল্পী জল রঙে অনেক বিখ্যাত ছবি এঁকেছেন। স্বচ্ছ জল রঙের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শিল্পীদের ভূমিকা অনেকখানি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে তাঁরাই স্বচ্ছ জল রংকে জনপ্রিয় করেছিলেন। আমাদের দেশে গোপাল ঘোষ, বসন্ত গাঙ্গুলি, রনেন আয়ন দত্ত, বীরেন দে, গণেশ হালুই প্রমুখ শিল্পী স্বচ্ছ জল রঙে ছবি এঁকেছেন।

জল রঙের উপকরণ ঃ

রং, কাগজ, বোর্ড, ক্লিপ, প্যালেট, জলের পাত্র, তুলি, জল রঙের ইজেল, পেনসিল, রবার, কাপড় ইত্যাদি।

জল রঙের পদ্ধতি ঃ

জল রঙে ছবি আঁকতে হলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করে ছবি আঁকলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

- জল রঙের ছবিতে কাগজের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘক্ষণ জল ধারণ করতে পারবে, এরকম কাগজ বাছাই করা দরকার। সেক্ষেত্রে হ্যান্ডমেড পেপার (Handmade paper) সব থেকে ভালো জল রঙের কাজ করার ক্ষেত্রে। হ্যান্ডমেড পেপারের মধ্যে ডেভিড কক্স, ওয়াটম্যান কাগজ সব থেকে ভালো। এছাড়া ভালো কার্টিজ পেপারেও জল রং করা যায়। অ্যাসিড মুক্ত কাগজ ব্যবহার না করলে রঙের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে যায়।
- জল রঙের ছবির জন্য কাগজটাকে ড্রয়িং বোর্ডের উপর ভিজিয়ে রেখে চারিদিকে ব্রাউন টেপ দিয়ে মাউন্ট করে নিতে হবে। তাতে কাগজটা টান টান থাকে।

- পেনসিল দিয়ে হালকাভাবে ড্রয়িং করা প্রয়োজন, নাহলে রঙের স্বচ্ছতার জন্য পেনসিল ড্রয়িং ফুটে উঠবে।
- জল রং শুরুর আগে ড্রয়িং বোর্ডের উপরের দিকটা অল্প একটু উঁচু করে রাখতে হবে। যাতে জলের মধ্যে রঙের pigment সমানভাবে ছড়াতে পারে।
- বোর্ডটিকে একজায়গায় একভাবে রেখে জল রঙের ছবি আঁকা সম্পূর্ণ করতে হবে। বোর্ড এদিক-ওদিক নড়ালে রঙের pigmentগুলি জলের সঙ্গে এদিক-ওদিক নড়ে ছবিটিকে নষ্ট করে দেবে।
- ছবির উপর থেকে রং ব্যবহার করে নীচের দিকে আসতে হবে।
- হালকা থেকে গাঢ় রং অর্থাৎ light to dark পদ্ধতিতে জল রং করতে হয়।
- পাতলা রং ব্যবহার করে জল রং করা হয়।
- সমস্ত কাগজ ভিজিয়ে রং দেওয়ার চিনা পদ্ধতি বর্তমানে বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। এতে ছবি খুব soft থাকে।
- জল রঙের ছবি আঁকতে গেলে ভুল হয়ে গেলে শোধরানো যায় না।
- ছবিতে Highlight রাখতে হলে, কাগজে সাদা অংশ ছেড়ে যেতে হয়।
- তুলি চালনায় ক্ষিপ্রতা থাকা প্রয়োজন। নাহলে ছবির একদিকে রং করতে করতে আর-এক দিক শুকিয়ে গেলে ছবিতে রঙের দাগ থেকে যায়।
- ছবির টোন সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার অর্থাৎ আলোছায়ার ব্যবহারের কৌশল ভালোভাবে রপ্ত করা প্রয়োজন।
- জল রঙে প্রচুর অনুশীলন প্রয়োজন। প্রথমে মোটা তুলির ব্যবহার এবং পরে সরু তুলির ব্যবহার করতে হয়।

জল রং ব্যবহারের সুবিধা ঃ

- জল রঙের খরচ অপেক্ষাকৃত কম।
- স্বল্প সময়ে ছবিটি সম্পূর্ণ করা যায়।
- তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।
- জল রঙে শিক্ষানবিশ থেকে শিশু প্রত্যেকেই কাজ করতে পারে।
- আউটডোর স্টাডির ক্ষেত্রে জল রং সবথেকে উৎকৃষ্ট মাধ্যম।

জল রঙের বৈশিষ্ট্য ঃ

- জল রং বলতে স্বচ্ছ অর্থাৎ Transparent জল রংকে বোঝায়।
- লাইট টু ডার্ক পদ্ধতি এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।
- পাতলা রং এবং কাগজের সাদা অংশ ছেড়ে Hightlight বোঝানো হয়।
- ছবির প্রত্যেকটা টোন পরিষ্কার বোঝা যায়।
- খুব তাড়াতাড়ি ছবি সম্পন্ন হয়।
- কাগজ ভিজিয়ে ভেজা অবস্থায় জল রং ব্যবহার ছবির নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে।

জল রঙের অসুবিধা ঃ

- জল রঙে ছবি আঁকতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। সেজন্য সব শিল্পী জল রং ব্যবহার করেন না।
- ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ না করলে জল রঙে ছবি আঁকা সম্ভব নয়।
- জল রঙের ছবি দীর্ঘস্থায়ী হয় না।
- ছবির রং পোকামাকড় খেয়ে নষ্ট করে দেয়।
- দীর্ঘদিন পরে ছবির ঔজ্জ্বলত্য নষ্ট হয়ে যায়।

- ছবি সংরক্ষণ করতে প্রচুর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।
- ছবির কাগজ তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।
- ছবি আঁকতে ভুল হয়ে গেলে সংশোধন করা যায় না।

জল রঙের উল্লেখযোগ্য ছবি ঃ

টার্নারের আঁকা The red Rigi, উইন্স্লো হোমারেরা 'Rowing Home'.

আলপনা—ডিজাইন/নকশা/অলংকরণ

Alpana—Design/Pattern/Ornamentation

■ **নকশা ঃ** কাগজ, কাপড়, পুঁথি-পাটা, দেয়াল, মন্দির মসজিদ ইত্যাদি যখন রঙে-রেখায় অথবা অন্য যে কোনো মাধ্যমে বিভিন্ন আলংকারিক এককের সুষম ছন্দে পুনরাবৃত্তির সাহায্যে অলংকৃত করা হয় তখন সেই অলংকৃত রূপটিকে বলে **নকশা**।

আলপনা ঃ কোনো উৎসবে গৃহাঙ্গন বা উৎসব স্থান যখন বিভিন্ন ছন্দোবন্ধ আলংকারিক এককের মাধ্যমে রঙে ও রেখায় সুশোভিত হয় তখন সেই অলংকৃত রূপটিকে বলে আলপনা। অলংকরণকে **মণ্ডন শিল্পও** বলে।

নকশা ও অলংকরণের মর্মকথা, বৈশিষ্ট্য ঃ

নকশা ও অলংকরণের মর্মকথা এবং বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এককের ছন্দোবন্ধ ভাবে সব মিলে সুষম ছন্দে নকশার রূপ নেয়। নকশার সাহায্যেই হয় অলংকরণ।

পদ্ম, পদ্মের পাপড়ি, অন্য যে কোনো ফুলের পাপড়ি, লতা-পাতা-আকর্ষ, কলকা, শাঁখ, হাঁস, ময়ূর, মাছ বা অন্য যা কিছুর অলংকৃত রূপ হল আলপনা বা নকশার একক। এগুলির হুবহু বাস্তব আকার-আকৃতি না নিয়ে যখন তাকে এক বিশেষ ছন্দে আঁকা হয়, তখনই তা হয় অলংকৃত রূপ। অর্থাৎ, ছন্দোময় নকশার সাহায্যেই বিশেষ স্থান অলংকৃত হয়। জ্যামিতিক নকশাও নানাভাবে ব্যবহার করা হয়।

■ **নকশা ও আলপনা আঁকার রীতি/পদ্ধতি, নকশায় ঃ** যেখানে যেমন নকশা আঁকার প্রয়োজন সেইমতো বিভিন্ন একক সমষ্টির সমন্বয়ে নকশার ছকটি কাগজে রেখা ও রঙের সাহায্যে এঁকে নিতে হবে। এরপর নকশা করার জায়গাটিতে সেটি ট্রেস করে নিয়ে তুলির সাহায্যে রং দিয়ে কাজটি করা হবে। নকশায় নানা বর্ণই ব্যবহৃত হয়। স্টেনসিল কাট করে, স্প্রে করে বা অন্যভাবে ছাপ দিয়ে ছাপা কার্ড, বাটিক, বাঁধনি, সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্ট করে নকশার কাজ করা যায়। মাটিতে, পাথরে রিলিফের কাজ করা হয়।

■ **আলপনার ক্ষেত্রে ঃ** মেঝে বা যেখানে আলপনা দেওয়া হবে, সেই জায়গাটিতে সাবান-সোডার জলে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিয়ে তার ওপর চকখড়ি দিয়ে সমস্ত আলপনাটি এঁকে নিতে হবে। তারপর মোটা তুলির সাহায্যে সাদা ও অন্যান্য রং দিয়ে ভরাট করতে হবে। সাধারণত আলপনায় সাদা রংই শুধু ব্যবহার করা হয়। আতপ চাল বাটা খড়িগুঁড়ো দিয়ে আলপনা দিলে তার সঙ্গে সামান্য পাতলা গঁদের আঠা মিশিয়ে নিতে হবে। পোস্টার রং হলে আলাদা আঠা মেশানোর প্রয়োজন হয় না। আলপনায় রঙের বৈচিত্র্য আনার জন্য লাল, সবুজ, হলুদ রঙের ব্যবহার হয়। আলপনা সাধারণত একটি কেন্দ্র থেকে ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। সেইমতো, কেন্দ্রে হাঁস, পদ্ম, জোড়া শাঁখ ইত্যাদি এঁকে তার চারদিকে মোটা রেখার বৃত্ত এঁকে আবার ফুলের পাপড়ি, লতা, পাতা দিয়ে আঁকা চলতে থাকে। **আলপনার রেখা হবে মোটা এবং বেশিরভাগ স্থান, যেমন—পাতা, ফুলের পাপড়ি ইত্যাদি রঙে ভরাট হবে। এটিই আলপনার বৈশিষ্ট্য**। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেই আলপনার ব্যবহার। তাই কালো রঙের ব্যবহার হয় না।

■ **নকশা ও আলপনার ইতিবৃত্ত ঃ**

নকশা ও আলপনার ইতিহাস অতি প্রাচীন। বলা যায় শিল্পের শুরু থেকেই এর ধারা নানাভাবে বিস্তার লাভ করেছে।

■ **নকশা প্রসঙ্গ ঃ**

যুগে যুগে ভারত শিল্পে নানাভাবে নকশা অলংকরণের কাজ এসেছে। পট পুথিচিত্রকে অলংকৃত করতে, চিত্রিত ছবিকে আরও মনোমুগ্ধকর করতে, মন্দির-মসজিদকে অলংকৃত করতে নানাভাবে এর ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ কখনও রং-তুলিতে এঁকে অথবা কখনও পাথরে খোদাই করে বা মাটির ফলকে অলংকরণের কাজ করে।

বিভিন্ন দেশের নকশার রীতি আমাদের নিজস্ব রীতির সঙ্গে মিশেছে। যেমন—পার্সিয়ান রীতির মিশ্রণে মোগল আমলে করা মসজিদের বিভিন্ন নকশা। যুগে যুগে বিভিন্ন মন্দির-মসজিদ ও অন্যান্য স্থাপত্য—শিল্পকাজেও দেয়ালে উৎকীর্ণ বা রঙে চিত্রিত নকশা অসামান্য শিল্পের নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অজন্তার গুহাচিত্রের মধ্যে অতুলনীয় নকশার চিত্রিত রূপ, ইলোরার গুহা ভাস্কর্যে পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ নকশা, তাজমহলের 'জাফরির' কাজ, দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন মন্দিরগাত্রের বিভিন্ন নকশা। জৈন পুথিচিত্র বা অন্যান্য পুথিচিত্রেও অসাধারণ নকশার অলংকরণ চিত্রিত হয়েছে। কাঁথার মধ্যে বিভিন্ন সুতোর সাহায্যে সেলাই করে অসাধারণ সুন্দর নকশার কাজ করা হয়। এটি কিন্তু ঘরের মা-ঠাকুমারা কত সহজেই তাঁদের অবসর সময়ে করেন। এর শিল্পনৈপুণ্যের কোনো তুলনা নেই। শাড়ি, শালের গায়েও সুতো দিয়ে বিভিন্ন নকশার কাজ হয়। বিছানার চাদর, শাড়ি, পর্দার কাপড়, বাটিক, বাঁধনি, ফেব্রিক সবেতেই বিভিন্ন নকশার অলংকৃত সুন্দর ছাপ পাওয়া যায়। তাঁত বা অন্যান্য টেক্সটাইল ডিজাইনেও কত রকমের নকশা। আজকাল বাড়ির মেঝে, দেয়ালে নকশা করা টাইলসও বসানো হচ্ছে। গ্রামের ভূমিজ মানুষদের কুটিরের দেয়ালে সামান্য কয়েকটি মেটে রঙে মোটা তুলিতে আঁকা হয় অসামান্য সব নকশা। তাঁদের শিল্প ভাবনার কী অসাধারণ প্রকাশ। নকশার সীমাবদ্ধতা না থাকলেও নকশার জন্য প্রয়োজন হয় নির্দিষ্ট রং ও রেখা।

■ **প্রসঙ্গ আলপনা ঃ**

ভারতের সর্বত্রই বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে পালাপার্বণে অথবা কোনো মাঙ্গলিক প্রতীক হিসাবে আলপনা দেওয়ার রীতি আছে। এক এক স্থানে আলপনার এক এক নাম।

যেমন—বিহারে—আরিপনা

রাজস্থানে—মন্দানা

মহারাষ্ট্র, কর্ণাটকে—রঙ্গোলি

উত্তর প্রদেশে—সাঞ্ঝি (সান্ধ্যকালে দেওয়া হয়)

গুজরাটে—সাথিয়া

ওড়িশায়—ওস্যা

কেরল, তামিলনাড়ুতে—কোলাম

অন্ধ্রপ্রদেশে—মুগ্গা ইত্যাদি।

আলপনার কিছু বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) আলপনা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানভিত্তিক, তাই কালো রঙের ব্যবহার হয় না। লোকশিল্পের অন্যতম শিল্পধারা হল আলপনা। আলপনা হল বাংলার আদিম শিল্প। তবে কোথাও কোথাও রং-তুলিতে আলপনা না এঁকে অন্যভাবে হয়। পাতলা টিনের ছোটো পাত্রে পরপর ছিদ্রসহ আলপনা করা থাকে। তাতে সাদা খড়ি গুড়ো দিয়ে মেঝেতে ঠুকে দিলে আলপনা হয়। যেমন মহারাষ্ট্রের আলপনায়; মহারাষ্ট্রে আলপনাকে বলে রঙ্গোলি।

আলপনা যেন গ্রামের একান্ত আপন আটপৌরে ঘরোয়া নান্দনিক শিল্পের প্রকাশ।

(২) আলপনার উৎসই হল গ্রামের পালা পার্বণ পূজা উৎসব অনুষ্ঠান। এসব উপলক্ষ্যে ঘরে ঘরে দেওয়া হয় আলপনা।

(৩) শিল্পের পাঠ না নিয়েও ঘরের মা-বোনেরা অনায়াস চেষ্টাতেই অতি সহজেই অসামান্য সব আলপনা দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য আলপনার চরিত্রও হয় ভিন্ন, এককও হয় ভিন্ন। লক্ষ্মীপূজার আলপনায় একক হিসাবে থাকে শঙ্খ, পদ্মের পাপড়ি, শাঁখ, চাল মাপার কুনকে, ধানের ছড়া ইত্যাদি। একটি কেন্দ্র থেকে ধীরে ধীরে আলপনার বিস্তার ঘটে। একটি সীমাবদ্ধ জায়গার মধ্যে শেষ হয়। এছাড়াও প্রতি ঘরের দুয়ারে চৌকাঠ বরাবর লতাপাতা দিয়ে আলপনা আঁকা হয়। তার সঙ্গে থাকে পরপর কয়েকটি লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ। মাটির সরা এবং লক্ষ্মীর ঘটটিও চিত্রিত করা হয়। এগুলি হল লক্ষ্মীসরা ও লক্ষ্মীঘট। সরস্বতী পূজার আলপনায় থাকে হাঁস, পদ্ম, বীণা, শাঁখ, কলকা ইত্যাদি। বিয়ের পিঁড়ির আলপনায় থাকে জোড়া মাছ, লতা পাতা, ফুল ইত্যাদি।

(৪) আবার বিভিন্ন ব্রতের আলপনা হয় সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এখানে কেন্দ্র থেকে আর আলপনার বিস্তার ঘটে না। যেমন সেঁজুতির ব্রতের আলপনায় থাকে ঘর, গাছ, চন্দ্র, সূর্য। 'সুবচনীর' ব্রতের আলপনায় মেঝেতে রেখার সাহায্যে একটি আয়তাকার ক্ষেত্র আঁকা হয়। তার মধ্যে একপাশে থাকে একটি ছোট্ট আলপনা। অন্যপাশে থাকে একঝাঁক হাঁস যেন ওই আলপনার দিকে উড়ে আসছে। 'পুণ্যিপুকুর' আলপনা আয়তাকার ক্ষেত্রের মধ্যে আঁকা হয়। পুকুর, ঘট, খেজুর গাছ ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে এককের ব্যবহার নেই, পুনরাবৃত্তি নেই। এখানে সবকিছুই বিশেষ প্রতীকের সাহায্যে আঁকা হয়। অবনীন্দ্রনাথের ''বাংলার ব্রত'' গ্রন্থে ব্রতের আলপনার বহু নকশার পরিচয় পাওয়া যায়।

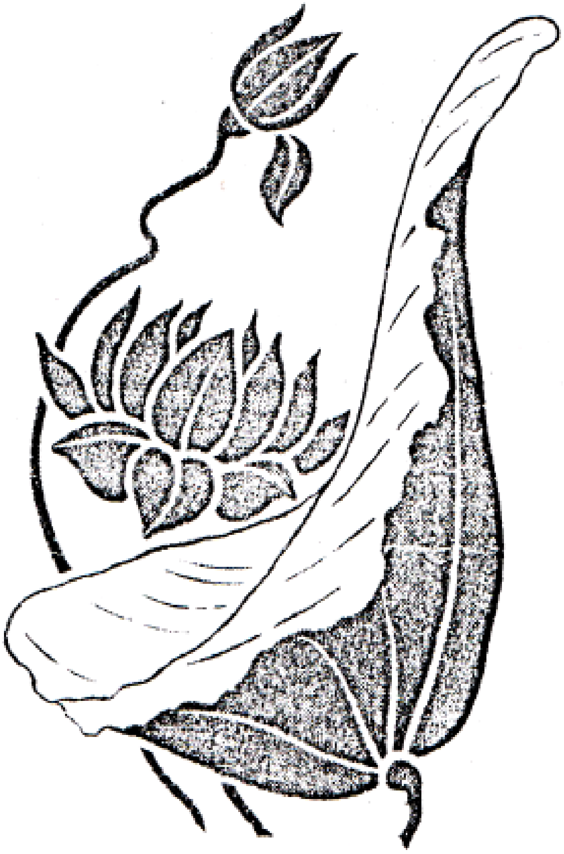

(৫) মূলত ন্যাকড়া বা তুলোর ছোট্ট পুঁটলি আতপচাল বাটার সাদা রঙে চুবিয়ে আঙুলের সাহায্যে আলপনা দেওয়া হয়। সে কারণে আলপনার রেখা হয় মোটা। সেজন্য বেশ মোটা তুলিতে, মোটা রেখায় আলপনা আঁকা হয়। এটাই বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহে শান্তিনিকেতনে আলপনার চর্চা বিশিষ্টতা অর্জন করে। সেই সূত্র ধরে বর্তমানে আলপনায় আরও কিছু রং ও রেখার ছন্দোবদ্ধ অভিনবত্ব লক্ষ করা যায়। আলপনায় বা নকশার রং ও রেখার সামঞ্জস্য, ভারসাম্য, সর্বোপরি সুষম ছন্দ অবশ্যই বজায় থাকে।

বিদ্যালয়ের উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সাজানো ঃ

অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সাজানোর আগে কী কী করতে হবে, কীভাবে সাজানো হবে, কী কী উপকরণ লাগবে—এসবের

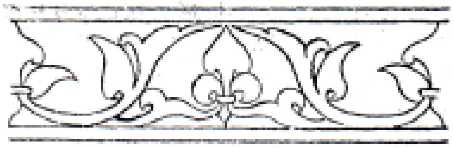

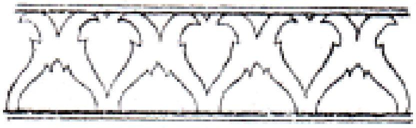

একটি পরিকল্পনা করে নিতে হবে। সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা মিলেই কাজ হবে। সম্ভবমতো ছাত্রছাত্রীদেরও বুঝিয়ে বলতে হবে। পরিকল্পনামতো সমস্ত উপকরণ নিয়ে কাজ শুরু হবে। সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা অবশ্যই থাকবে।

বিভিন্ন উপকরণ যেমন—শোলার চাঁদমালা, ফুল, কলকা, থার্মোকলের বিভিন্ন নকশা, জরির ফিতে, কাগজে চুমকি বসানো নকশা, কাগজে আঁকা নকশা আলপনা, কাগজের শিকলি, ফুল, বাটিক বা বাঁধনির টেবিলঢাকা, রঙিন কাপড়, চিত্রিত ঘট, সরা ইত্যাদি নিয়ে অনুষ্ঠান কক্ষ এবং মঞ্চ সাজানো হবে। অনুষ্ঠান কক্ষটির প্রবেশপথের দুধারে দুটি চিত্রিত ঘট বসিয়ে আলপনা দেওয়া হবে। ঘটে কিছু ফুল-পাতা থাকবে। বাহারি গাছের ছোটো টব বসালে তার গায়ে নকশা এঁকে দিতে হবে। অন্যান্য স্থানেও প্রয়োজনমতো আলপনা আঁকা হবে। বাটিক-বাঁধনির কাপড়ে টেবিল ঢেকে দেওয়া হবে। অন্যান্য স্থানেও প্রয়োজনমতো আলপনা আঁকা হবে। বাটিক-বাঁধনির কাপড়ে টেবিল ঢেকে দেওয়া হবে। মঞ্চের পিছনে দেয়ালে গাঢ় নীল রঙের অথবা মভ রঙের কাপড় ঝুলিয়ে মাথায় রঙিন কাগজের শিকলি নানাভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। ঘরের দেয়ালে ছাত্রছাত্রীদের আঁকা ছবি, আলপনা, নকশা, মুখোশ, বাঁধনি ইত্যাদি প্রদর্শনীর মতো সাজানো হবে। বিশেষ স্থানে ধূপ, প্রদীপ, ফুল থাকবে থালার উপর। এইভাবে সমস্ত পরিবেশটি রমণীয় ও মনোরম হয়ে উঠবে।

আলপনার একক হিসাবে কলকা, শাঁখ, পদ্ম, পদ্মপাতা, ফুল ইত্যাদির অলংকৃত রূপ ব্যবহার করা হয়। আলপনার সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু নকশার সীমাবদ্ধতা নেই। যেমন—শাড়ি পাড়ের নকশা।

বইয়ের ছবিতে আলপনা ছাপার জন্য সাদা-কালো হয়েছে। আলপনার কালোর স্থানে নীল, লাল, হলুদ ইত্যাদি রং ব্যবহৃত হবে, কালো হবে না।

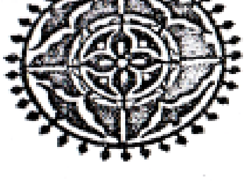

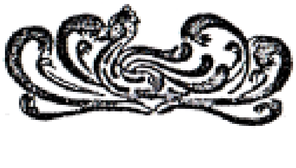

নকশার একক ঃ পদ্ম, পদ্মের পাপড়ি, ফুল, লতাপাতা, কলকা, হাঁস, ময়ূর, হাতি, ঘোড়া, জ্যামিতিক আকার আকৃতি, ফোক আর্টের মানুষ, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি। দেয়ালে, মেঝে, কাগজে, সরাতে যে-কোনো কিছুতেই নকশা হতে পারে।

নকশার বৈশিষ্ট্য ঃ নকশার বৈশিষ্ট্য হল রূপ ও ছন্দ বজায় রেখে এককের অলংকৃত রূপের পুনরাবৃত্তি। রং ও রেখার পুনরাবৃত্তি হবে। রং ছাড়াও শোলা, থার্মোকল, জরি, কাপড়, রঙিন কাগজ ইত্যাদি দিয়েও নকশা করে অলংকরণ করা যায়।

স্কুলে পাপড়ির বিন্যাস দেখিয়ে, পেঁপে-পাতা দেখিয়ে আলপনার রূপ, ছন্দ সম্বন্ধে শিশুদের কাছে ধারণা দেওয়া যায়। শিক্ষক শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে অনুশীলন করলে সুফল পাবেন।

মাটির কাজ—মডেলিং/রিলিফের কাজ
(Clay work—Modelling/Relief work)

■ শিল্প কাজে মাটির ব্যবহার ঃ

শিল্প কাজে মাটি হল সবচেয়ে সহজলভ্য উপকরণ যা হাতের কাছে চাইলেই পাওয়া যায়। অবশ্য অঞ্চলভেদে মাটির চরিত্র বিভিন্ন হয় এবং এটাই স্বাভাবিক। যেমন দক্ষিণবঙ্গের নদীমোহনার কালো পলিযুক্ত এঁটেল মাটি কাজের জন্য সবচেয়ে ভালো। যার জন্য কুমারটুলির (কলকাতা) মৃৎশিল্পীরা নৌকা করে ওই মাটি বয়ে আনেন। আবার, বাঁকুড়ার, পুরুলিয়ার লালচে আঠালো মাটিতে (বালি মিশ্রিত) যে সমস্ত কাজ হয় তা শুকোলে মনে হয় যেন পোড়া মাটির কাজ।

মাটি তথা পোড়ামাটির কাজের ইতিহাস অতি প্রাচীন। মৃৎশিল্পের আবির্ভাব নারীদের হাত দিয়েই। পোড়ামাটির কাজের সাক্ষ্য দেয় মহেঞ্জোদারোর পোড়ামাটির মূর্তিগুলি (৩০০০ খ্রিঃ পূঃ-১৫০০ খ্রিঃ পূঃ)। ('পোড়ামাটির বা টেরাকোটার কাজ' অংশে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।)

■ মাটির বিভিন্নতা ও উপযুক্ত মাটি সংগ্রহ ঃ

চরিত্রভেদে মাটি তিন ধরনের হয় ঃ (১) বেলে মাটি, (২) দো-আঁশ মাটি এবং (৩) এঁটেল মাটি। বেলে মাটিতে বালির ভাগ খুব বেশি থাকায় মাটির কাজ হবে না, ঝরে পড়ে যায়। দোআঁশ মাটিতে বালি এবং কাদার ভাগ প্রায় সমান সমান। কিন্তু কাজের জন্য প্রয়োজন মাটির যে আঠালো ভাব তা বিশেষ না থাকায় এই মাটিও কাজের উপযুক্ত নয়, ঝরে-পড়ে কাজের সময়। এঁটেল মাটিতে আঠার ভাগ বেশি থাকায় এই মাটিকেই কাজের জন্য বেঝে নেওয়া হয়। কিন্তু এই মাটির কাজ শুকোলে সংকুচিত হওয়ার কারণে ফেটে যায়। যে কারণে এঁটেল মাটির সঙ্গে সামান্য মিহিবালি অথবা দোআঁশ মাটি মিশিয়ে মাটি প্রস্তুত করে কাজ করলে মাটি ফাটার সমস্যা দূর হয়। তবে নদীমোহনার পলি-এঁটেল মাটি সংগ্রহ করে কাজ করতে পারলে সবচেয়ে ভালো। স্থানীয় কুমোরপাড়া থেকে এই মাটি সংগ্রহ করা যায়। দেখতে হবে ওই মাটিতে যেন তুষ, খড়ের কুচি না থাকে। কুমোরদের ঘরে মাটিতে তুষ, পাট, খড়ের কুচি মেশানোর কারণ তাঁরা সাধারণত খড়ের কাঠামোর ওপর মাটির প্রতিমা যখন তৈরি করেন তখন তুষ খড় মিশ্রিত মাটি ঝরে পড়ে না। ওগুলি মাটিকে ধরে রাখে। মাটির ধর্ম হল আঠালো মাটির মধ্যে মাটি ছাড়া অন্য কিছু থাকলে পরে শুকোলে মাটি ফাট ধরে। প্রতিমার কাজে পেছনের অংশ দেখলে এটা বোঝা যায়। সামনের ফাটা অংশে কাদা মাখা পাতলা ন্যাকড়ার টুকরো চিটিয়ে ফাট ঢাকা হয় (কুমোরদের কাজে)। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সামান্য তুষ, পাট ও খড়ের কুঁচি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে কাজ হয়।

মাটির কাজকে স্থায়িত্ব দিতে গেলে পলি-এঁটেল মাটির সঙ্গে পরিমাণমতো খুব সরু পরিষ্কার বালি মিশিয়ে সেই কাজ ছায়ায় শুকিয়ে নিয়মমতো পুড়িয়ে নিতে হয় (পদ্ধতি পর্বে আলোচিত টেরাকোটা অংশে)। বিদ্যালয়ে শেখানোর জন্য বা ছোটো ধূপদানি, ফুলদানি, পুতুল ইত্যাদি তৈরি করতে পলি-এঁটেল মাটি ব্যবহার করলে ভালো কাজ হবে। প্রায় শুকোলে যদি দেখা যায় কোথাও ফাটল ধরেছে সেখানে একটু গর্ত করে খুঁচিয়ে মাটি ঢুকিয়ে কাদা-জল দিয়ে ঘষে দিতে হয়। এরপর পুরো শুকোলে আর ফাটল থাকে না। মাটির কাজ ছায়ায় শুকোতে হবে।

■ কাজের উপযুক্ত মাটি তৈরির প্রথম পদ্ধতি ঃ

মাটি শুকনো হলে বড়ো কাঠের পাটায় রেখে তা হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে গুঁড়ো করে নিতে হবে। এরপর বড়ো মাটির গামলায় মাটি

রেখে জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে দুদিন। দুদিন পর গামলার মধ্যে ভিজে নরম মাটি ময়দা ঠাসার মতো মাখতে হবে। মাটি ঠেসে ভিতরের হাওয়া বার করে দেওয়া হয়। সে সময় মাটির মধ্যে কাঁকর, পাট-কুঁচি, ইটের টুকরো ইত্যাদি মাটি ছাড়া অন্য কিছু থাকলে তা বেছে ফেলে দিতে হবে। কালো পলি-এঁটেল মাটি পাওয়া গেলে ভালো। না হলে, সাধারণ এঁটেল মাটির সঙ্গে সামান্য মিহি বালি ভালো করে ছেঁকে নিয়ে (যাতে বালির সঙ্গে অন্য কিছু না থাকে) মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে (ভেজা নরম মাটির সঙ্গে)। বালির বদলে পরিষ্কার দোআঁশ মাটিও মিশিয়ে নেওয়া চলে। হাত দিয়ে মাটি চটকালে হাতের তালুতে মাটি চিটিয়ে না থাকলে বুঝতে হবে মাটি ঠিক কাজের উপযুক্ত হয়েছে।

• মাটি তৈরির দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ

অন্য আর একভাবে মাটি তৈরীর পদ্ধতি হল—মাটির গামলায় গুঁড়ো মাটিতে প্রচুর জল ঢেলে ভেজাতে হবে দু-তিন দিন। মাটি ভিজে ঘোলের মতো হবে। এররপর খুব সরু ছাঁকনিতে ওই পাতলা ঘোলের মতো মাটি অন্য একটি মাটির গামলায় ছেঁকে নিতে হবে। এতে ইটের কুঁচি, পাট কুঁচি, ঘাস বা অন্য কিছু ছাকনিতে আটকে যাবে অর্থাৎ পরিষ্কার মাটির ঘোল পাওয়া গেল। একদিন ওই মাটির জল থিতোতে দিয়ে ওপর থেকে জল না ঘেঁটে সাবধানে তুলে ফেলে দিতে হবে। এবার থিতোনো মাটি মোটামুটি কাজের উপযুক্ত করে কিছুটা শুকিয়ে নিলেই হবে।

এবার প্রয়োজনমতো দুহাতের তালুর চাপ দিয়ে আঙুলের সাহায্যে মাটির যা কিছু প্রস্তুত হবে, ছায়ায় রেখে মাটির কাজ শুকোতে হবে। পোড়া মাটির কাজ করলে সামান্য মিহিদানার বালি মিশিয়ে কাজ হবে—যা আগেই বলা হয়েছে।

• যন্ত্রপাতির ব্যবহার (Modelling Tools) ঃ

ছোটোখাটো কাজের জন্য দুটি হাতের তালু এবং আঙুলই যথেষ্ট। তবু প্রয়োজনে মাটি কেটে বার করার জন্য তারকাঠি, ছুরি এবং লম্বা চ্যাপ্টা কাঠি, মাটি পিটিয়ে সমান করার জন্য ব্যবহার করা হয়। ছুঁচালো মুখবিশিষ্ট কাঠি দিয়ে মূর্তিতে চোখ নাক করা, নকশার কাজ করা হয়। এছাড়া চাকের সাহায্যে মাটির বিভিন্ন পাত্র তৈরি তো হচ্ছেই। বাঁশের চাকলা দিয়ে বাঁশের ছুরি বা চোয়াড়ি, কাঠের ভাঙা স্কেল দিয়ে বিভিন্ন চ্যাপ্টা কাঠি এবং মাথার চুলের কাঁটা দিয়ে তারকাঠি তৈরি করে নেওয়া যায়। তারকাঠি দিয়ে অতিরিক্ত মাটি কেটে বার করা হয়। চেয়াড়িও এই কাজে ব্যবহৃত হয়। কাজের যন্ত্রপাতি কিনতেও পাওয়া যায়।

সংরক্ষণ ঃ অসমাপ্ত মাটির কাজটি পরের দিন করার জন্য সংরক্ষণ করতে হবে এইভাবে—মাটির কাজটি এবং অব্যবহৃত তৈরি মাটির ওপর জলের ছিটে দিয়ে মোটা ভিজে কাপড় দিয়ে ঢেকে তার ওপর ভিজে পলিথিন শিট দিয়ে ভালো করে ঢেকে দিতে হবে যাতে হাওয়া না ঢোকে। এইভাবে বেশ কিছুদিন মাটি ও অর্ধসমাপ্ত কাজটি ভবিষ্যতে কাজের জন্য সংরক্ষণ করা যায়।

সাধারণ কাজের জন্য কিছু যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম ঃ

১। কাজ করার সময় মাটি কাটা বা চাঁছার জন্য বিভিন্ন তারকাঠি ও ছুরি।

২। সূক্ষ্ম কাজের জন্য বিভিন্ন আঁচড়া ও চোয়াড়ি কাঠি এবং নরুন।

৩। মাটি বসানোর জন্য চওড়া চ্যাপটা কাঠি।

৪। মাটি কেটে নেওয়ার জন্য বড়ো তার।

৫। মাটি গুঁড়ো করার জন্য মুগুর বা হাতুড়ি।

৬। মাটি ছাঁকার জন্য চালুনি বা ছাঁকনি।

৭। বেলুনি, বড়ো কাঠের পাটা।

৮। রং, তুলি, জল, ন্যাকড়া আর মাটি তো লাগবেই।

■ **মাটির কাজ ঃ**

■ **উপকরণ ঃ** মাটি, রং-তুলি, পেনসিল, মাটির কাজের যন্ত্রপাতি এবং এঁটেল মাটি।

■ **মাটির হাঁস তৈরি ঃ** (হাতের চাপে খুব সহজে কাজ করা যাবে)।

কিছুটা মাটি নিয়ে দুহাতের তালুতে চাপ দিয়ে এবং ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা বল করা হল। এবার মাটির দুদিক হাতের চাপে সরু করা হল। একদিক একটু মোটা ছোটো, অপরদিক লম্বা একটু সরু। মধ্যখানটা বেশ মোটা রইল। হাতের তালুতে বসিয়ে ওটির দুটি দিক আঙুলের চাপে ওপরদিকে তুলে দেওয়া হল। লম্বা দিকটি তুলে দিয়ে হল হাঁসের গলা ও ঠোঁট। গলাটি ঘুরিয়ে দেহের ওপর রাখতে হবে। মাটির কাজে কোনো অংশ খোলা ছড়ানো হলে সেগুলি সহজেই ভেঙে যায়। এরপর দুদিকে দুটি ডানা গায়ের সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া হল। এরপর তার গায়ে নকশা করে শুকিয়ে রং করা হবে। কাঁচা অবস্থায় পিঠে গর্ত করে বাতিদান, ধূপদান করা যায়। আম, কলা, হাতি, ঘোড়া একটি বড়ো মাটির তাল থেকে করা হবে। অতিরিক্ত মাটি তার কাঠির সাহায্যে কেটে বার করে নিতে হবে। কোথাও মাটি জুড়তে হলে বাড়তি মাটিকে ভালো করে টিপে বসাতে হবে না হলে খুলে আসবে। প্রয়োজনে মাটির ভেতরে ছোটো তার বা কাঠি ব্যবহার করা যাবে।

■ **রিলিফ কাট ঃ (টেরাকোটা অংশ) দ্রষ্টব্য।**

১″ পুরু করে মাটির টাইল তৈরি করে তার ওপর বাহারি পাতা, ফুল রেখে চাপ দিয়ে ঠুকে দিলে সুন্দর ছাপ হবে। এবার ছুরি বা কাঠি দিয়ে নকশার বাইরের অংশ সামান্য যেমন ১/২″ কেটে (চারপাশ সমান করে) নামিয়ে দিলে নকশাটি মাটির আয়তক্ষেত্রাকার বা বর্গক্ষেত্রাকার টাইলস থেকে কিছুটা উঁচু হয়ে থাকবে। **একে বলে রিলিফের কাজ**। টাইল্‌সের গায়ে আঁকা নকশা বা ফিগারের ওপর মাটি চাপিয়ে চাপিয়েও সুন্দর কাজ হয়। মাটির টাইল্‌স শুকিয়ে তার ওপর আগে সাদা খড়ির রং বা সাদা পোস্টার রং দিয়ে তারপর নকশা এঁকে বিভিন্ন রং দিয়ে চিত্রিত করা যাবে। বাজার থেকে কেনা মাটির সরা, ছোটো ঘট ইত্যাদিও মাঝারি তুলির সাহায্যে চিত্রিত করা যাবে। তার আগে হালকা পেনসিলের ড্রইং করে নিতে হবে।

রিলিফের কাজ দুই ধরনের হয়—

১। **লো-রিলিফ ঃ** তল থেকে খুব সামান্য উঁচু হলে নকশা বা মূর্তি যাই হোক তাকে লো-রিলিফ বলে—তা সে মাটির কাজই হোক বা পাথরে খোদাই করেই হোক।

২। **হাই-রিলিফ ঃ** তল থেকে যথেষ্ট উঁচু হলে অর্থাৎ শুধুমাত্র পৃষ্ঠদেশটুকু তলের সঙ্গে লেগে থাকলে তাকে হাই-রিলিফ বলে। মন্দিরগাত্রে সাধারণত হাই-রিলিফের কাজ দেখা যায়।

■ **কুণ্ডলীকৃত কাজ (Coiled Work) ঃ** (মাটি প্রস্তুত করে নিতে হবে আগে যেভাবে বলা হয়েছে)।

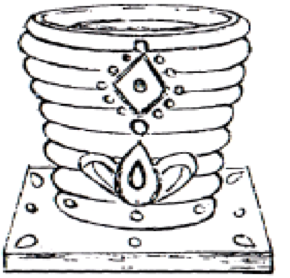

কুণ্ডলী পদ্ধতিতে পেন

■ **পদ্ধতি ঃ** মাটির একটি ছোটো কিন্তু পুরু প্লেট তৈরি করা হল। তারপর মাটিকে সরু করে অর্থাৎ সরু গোল দড়ির মতো করে ওই প্লেটটির ওপর বসিয়ে একপাক ঘুরিয়ে আগের পাকের ওপর দিয়ে ক্রমাগত কুণ্ডলী পাকিয়ে অনেকটা উঁচু করে একটি পাত্র তৈরি করা যাবে। প্রতিবার মাটির ওপর মাটির পাক দেওয়ার আগে এই জায়গায় পাতলা কাদা জল মাখিয়ে নিতে হবে। কাজ শেষে কাজটির ওপর ওই দড়ির মতো তৈরি মাটি দিয়ে কিছু নকশাও করা যাবে।

মাটির কাজের যন্ত্রপাতি কিনতেও পাওয়া যায়। পুরানো কাঠের স্কেল, বাঁশ ইত্যাদি থেকে তৈরি করেও নেওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আগে বলা হয়েছে।

টেরাকোটা বা পোড়ামাটির স্থায়িত্ব অনেক বেশি। মাটি পোড়ানোর আগে তার গায়ে দেশি বা মেটে রং লাগিয়ে নিয়ে তাকে শুকিয়ে পোড়ালে সুন্দর স্থায়ী রঙের কাজ হয়। যেমন—কিছুটা গরম জলে কালো খয়ের গুঁড়ো মেশানো হল ভালো করে নেড়ে

নেড়ে। তারপর তাতে খাবার সোডা অল্প পরিমাণ মেশানো হল। আলাদা পাত্রে রেড অক্সাইড কালার অর্থাৎ মেটে লাল রং অল্প ঠাণ্ডা জলে নেড়ে একটা পেস্ট তৈরি করা হল। সেটি আগের মিশ্রণে দেখানো হল। রংটি যেন পাতলা না হয়। রঙের মধ্যে যেন দানা না থাকে। প্রয়োজনে একটু থিতিয়ে নিয়ে ওপরের রংটি ব্যবহার করা যায়। এবার মোটা তুলির সাহায্যে রং করে নিতে হবে। খয়ের, সোডা ইত্যাদি ছাড়াও খুব সামান্য গঁদের আঠাসহ মেটে রং আঙুল দিয়ে নেড়ে পেস্ট তৈরি করেও লাগানো যায়। রেড অক্সাইডের বদলে গ্রিন অক্সাইড, কালো রং দিয়েও করা যায়। এক-একটি এক একরকম রঙের প্রকার ঘটবে।

মাটির সরাতে বা অন্য কোনো মাটির জিনিসে তেল রং বা আঠা মিশ্রিত জল রং, পোস্টার রং করা যাবে।

মাটির সরা অলঙ্করণ ঃ

■ **উপকরণ ঃ** পোড়া মাটির সরা, পেনসিল, ট্রেসিং পেপার, বিভিন্ন পোস্টার রং, সরু মোটা জল রঙের তুলি, জল, ন্যাকড়া, প্যালেট (রং গোলার পাত্র), ১নং সিরিশ কাগজ। কাগজে আঁকা রঙিন নকশা।

■ **পদ্ধতি ঃ** সরার ওপর হালকা করে সিরিশ কাগজ ঘষে নিয়ে ট্রেসিং পেপারের সাহায্যে সরার গায়ে নকশা এঁকে নিতে হবে। এরপর যেখানে যেমন দরকার সেখানে সেইমতো অলঙ্করণ করা হবে। প্রথমে সাদা রং করে পরে অন্যান্য রং হবে।

■ **তেলরঙে করলে ঃ**

উপকরণ ঃ তেলরং, অয়েল প্যালেট, সরু মোটা কয়েকটি অয়েল ব্রাশ, ট্রেসিং পেপার, পেনসিল, পিউরিফাইড লিনসিড ও তারপিন তেল, পিউরিফাইড ভার্নিশ, ন্যাকড়া ইত্যাদি।

■ **পদ্ধতি ঃ** আগের মতোই রং-এ নকশা এঁকে (প্যালেট লিনসিড ও তারপিন তেলে রং গুলে) এরপর তেল রং-এ নকশা আঁকার পর শুকিয়ে নিয়ে গ্লেজ আনার জন্য ভার্নিশ পেন্ট করা হবে।

(তেল রঙে আঁকার পদ্ধতি দেখা দরকার।)

মাটির ঘট, ফুলদানি, পুতুল সবই জলরঙে বা তেল রঙে রং করা যাবে বা অলঙ্কৃত করা যাবে।

■ **মাটির ছাঁচ তৈরি এবং তার থেকে পুতুল ঃ**

• **উপকরণ ঃ** যে কোনো পুতুল, তেল সাবান জল, মোটা তুলি, মাটি, মাটির কাজের যন্ত্রপাতি (ছুরি, চ্যাপটা কাঠি, তার কাঠি ইত্যাদি), জল, ন্যাকড়া।

• **পদ্ধতি ঃ** যে পুতুলটির ছাঁচ তৈরি হবে সেই পুতুলটির ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত পেছনের অর্ধাংশ পাতলা করে নারকেল তেল তুলির সাহায্যে লাগিয়ে নিতে হবে। এরপর আধ ইঞ্চি পুরু করে তার ওপর মাটি চাপানো হবে টিপে টিপে। ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত মাটির কিনারা তার কাঠি ও চ্যাপ্টা কাঠির সাহায্যে সমান করে নিতে হবে। মাটির কিনারায় আকারে একটু কেটে দিতে হবে—এটা হল লক্ করা। এরূপ ওপরে নীচে দুটি হবে। দুদিন পরে ভালো করে শুকোলে পুতুলের বাকি অর্ধাংশে এবং ছাঁচের অর্ধাংশের কিনারায় তেল মাখিয়ে নিয়ে আগের মতো মাটি টিপে টিপে লাগাতে হবে। শুকিয়ে গেলে জোড়ের অংশে ছুরির ডগা দিয়ে সামান্য চাপ দিয়ে দুদিকের দুটি অর্ধাংশ ছাঁচ পুতুল থেকে সাবধানে ছাড়িয়ে নিতে হবে। এরপর ছাঁচটি পুড়িয়ে নিতে পারলে ভালো।

এবার ওই ছাঁচ থেকে পুতুল তৈরি করতে হলে—ছাঁচের ভিতরের দুটি অংশেই তেল সাবান জলের দ্রবণ (নারকেল তেলের সঙ্গে সাবান কুচি গরম করে গুলে নিতে হয়) মাখিয়ে দিতে হবে। তারপর দুটি অংশেই কাগজের মণ্ড বা মাটি টিপে টিপে বানাতে হবে। এরপর দুটি অংশ একত্রিত করে ভালো করে দড়ি দিয়ে বেঁধে নীচের খোলামুখ দিয়ে মাটি বা কাগজের মণ্ড সরু কাঠির সাহায্যে গুঁজে গুঁজে দিয়ে জোড়ের মুখগুলি ভরাট করে দিতে হবে। শুকোলে বাঁধন খুলে ছুরির ডগা দিয়ে চাপ দিয়ে ছাঁচ দুটি ছাড়িয়ে নিলে পুতুলটি বার হবে। এরপর সেটি রং করে নিলেই হবে।

■ **প্লাস্টারের ছাঁচ তৈরি ঃ**

• **উপকরণ ঃ** প্লাস্টার অফ প্যারিস (POP), গামলা, জল, পুতুল, তারকাঠি, চ্যাপটা কাঠি, কাঠের পাটা, মাটি, তেল সাবান, জলের দ্রবণ, তুলি।

• **পদ্ধতি ঃ** দু'হাতের তালুতে কিছুটা মাটি নিয়ে চাপ দিয়ে সরু লম্বা করা হল বেশ কয়েকটা। এবার কাঠের পাটার ওপর সেগুলি রেখে চ্যাপটা কাঠির সাহায্যে পিটিয়ে পিটিয়ে সিকি ইঞ্চি পুরু ও আধ ইঞ্চি চওড়া করে লম্বা ফিতের মতো তৈরি করা হল। এগুলি হল বেরিয়ার বা পাঁচিল। সমস্ত পুতুলটির গায়ে তেল সাবান জলের দ্রবণ তুলি দিয়ে লাগানো হল। (অল্প কাপড় কাচা সাবানের টুকরো ও নারকেল তেল সামান্য জলে মিশিয়ে অল্প আঁচে বসিয়ে নাড়াচাড়া করে দ্রবণটি তৈরি হয়।) ছাই দিয়েও হয়।

এবার, গামলাতে আধমগের কম জল নেওয়া হল। জলের ওপর গুঁড়ো প্লাস্টার কিছুটা ঢালা হল। এরপর হাত দিয়ে নেড়ে নেড়ে প্লাস্টার গোলা হল। এটি থকথকে কাদার মতো হবে। খুব পাতলা যেন না হয়। প্লাস্টার গোলা জলের ওপর থেকে বুদ্‌বুদ্, নোংরা ইত্যাদি হাতে করে চেঁছে ফেলে দিতে হবে। এবার পুতুলটির সামনে ও পেছনের ঠিক মধ্যেখান বরাবর ওপর থেকে নীচে মাটির বেরিয়ার খাড়া করে লাগিয়ে বসাতে হবে। তারপর হাত দিয়ে পুতুলের সামনের দিকে প্লাস্টার লাগাতে হবে আধ ইঞ্চি পুরু করে—যতটা বেরিয়ার উঁচু। একদিন পর প্লাস্টার শুকিয়ে গেলে বেরিয়ার ছাড়িয়ে নিয়ে ফেলে দিতে হবে। প্লাস্টারের কিনারায় মাঝে মাঝে কিছুটা দূরত্ব রেখে ইংরেজি ''V'' এর মতো কেটে গর্ত করে দিতে হবে। একে বলে 'লক্'। এবার কিনারার গা বরাবর তেল বা তেল সাবান জল মাখিয়ে পূর্বের মতো পুতুলের পিছনের অংশে প্লাস্টার দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পরের দিন শুকোলে দুটি প্লাস্টার অংশের জোড়ামুখে ছুরির ডগা দিয়ে সামান্য চাপ দিয়ে পুতুল থেকে প্লাস্টার অংশ দুটি ছাড়িয়ে নিতে হবে। এটাই হল ছাঁচ।

• **ছাঁচ থেকে পুতুল তৈরি করতে—**ছাঁচের ভিতরের দুটি অংশে তেল সাবান জল লাগিয়ে নিয়ে ছাঁচের ভিতর মাটি বা কাগজের মণ্ড আঙুলে টিপে টিপে বসাতে হবে। কিছুটা পুরু হলে ছাঁচের দুটি অংশ 'লকে'র ঘাটে ঠিকমতো লাগিয়ে জুড়ে বেঁধে নিতে হবে। খোলামুখ দিয়ে মণ্ড বা মাটি—কাঠির সাহায্যে চেপে চেপে গুঁজে দিতে হবে। জোড়ার মুখ আটকে যাবে। দুদিন পর প্লাস্টার খুলে পুতুলটি বার করে শুকিয়ে রং করে নিতে হবে। এভাবে ছাঁচের সাহায্যে মুখোশ বা অন্য কিছুও করা যাবে।

■ **মাটির ফলক বা প্লেট তৈরী করে পেন-স্ট্যান্ড তৈরি ঃ**

• **উপকরণ ঃ** মাটি, কাঠের পাটা, তার কাঠি, ছুরি, নরুন, চ্যাপটা কাঠি, জল, ন্যাকড়া ইত্যাদি।

• **পদ্ধতি ঃ** উপরের ছবির মতো পাঁচটি প্লেট তৈরি করা হল আধ ইঞ্চি পুরু করে। চারটি প্লেটের গায়ে নকশা করে নেওয়া হল নরুন দিয়ে, তার কাঠি দিয়ে। নীচের প্লেটের ওপর কাদা জল লাগিয়ে এবং বাকি চারটে প্লেটও কাদা জল মাখিয়ে পর পর জোড়া হল। জোড়ার অংশগুলি ভেতরে আঙুল দিয়ে নরম মাটি লাগিয়ে ঘষে ঘষে সামান্য পুরু করে দেওয়া হল। ছায়াতে রেখে শুকিয়ে নিয়ে রং করে নিতে হবে অথবা পুড়িয়ে নিতে হবে। তবে পোড়ানোর কাজ যেন মাটি ও বালি মিশ্রিত হয়।

■ **মাটির হাতি, ঘোড়া, পুতুল ইত্যাদি তৈরি ঃ** [ত্রিমাত্রিক বস্তু তৈরি]

• **উপকরণ ঃ** মাটি, জল, চেয়ারি কাঠি, ছুরি, চ্যাপটা কাঠি, তারকাঠি। এছাড়া মাটির হাতি, ঘোড়া, পুতুল ইত্যাদি যা দেখে কাজ হবে।

• **পদ্ধতি ঃ** দু'হাতের তালুতে কিছুটা মাটিকে চাপ দিয়ে পাকিয়ে বল মতো করা হল। এবার টিপে টিপে পুতুলের মাথা, দুটো হাত কোমরে ঠেকানো, কোমরটা সরু করে ক্রমশ নীচের দিকে ঘাগরার মতো ফুলিয়ে করা হল। পা দেখানো হবে না। মাথায় খোঁপা থাকবে। হাতের চাপে শঙ্কু, পিরামিড, ঘনক ইত্যাদি করা থাকে।

একটা ছোটো প্লেট মতো করে তার ওপর মাটি রেখে চাপ দিয়ে দিয়ে হাতি, ঘোড়া করা হবে। সমস্ত কাজই সামনে রাখা পুতুল, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি দেখে করা হবে। প্রয়োজন মতো ছুরি, তার কাঠির ব্যবহার হবে। পরে সমস্ত কাজ ছায়ায় শুকিয়ে রং করে নিতে হবে।

কাগজের কাজ

(Paper Art)

চিনদেশে কাগজ আবিষ্কারের পর কাগজকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হতে থাকে। কাগজ ব্যবহার করে যে কাজ করা হয়, সেগুলি হল—কাগজের মণ্ড (Paper Pulp), পেপার ম্যাসে (Paper Mache), পেপার কাটিং (Paper Cutting), অরিগামি (Origami), কিরিগামি (Kirigami)। অলংকরণ থেকে শুরু করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কাগজের কাজ ব্যবহার করা হয়। 'Paper' শব্দটা লাতিন প্যাপিরাস থেকে এসেছে।

কাগজের মণ্ড (Paper Pulp) ঃ

পাল্প বা মণ্ড হচ্ছে আঁশযুক্ত বস্তু যা রাসায়নিক বা যান্ত্রিকভাবে কাঠ, আঁশযুক্ত শস্য বা ফেলে দেওয়া কাগজ দিয়ে তৈরি করা হয়। কাগজের মণ্ডের ক্ষেত্রে কাগজকে পুনরায় ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে কাগজের আঁশকে ভেঙে ফেলা হয়।

প্রাচীনকালে মিশরীয়রা প্যাপিরাসের উপর লিখিত যা প্যাপিরাস গাছ থেকে তৈরি হত। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে চিনে কাগজ আবিষ্কারের পর পাল্প বা মণ্ডও তৈরি হতে থাকে। বর্তমানে বিভিন্নভাবে ও বিভিন্নক্ষেত্রে মণ্ডের ব্যবহার হচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চলে মণ্ড তৈরির পদ্ধতির রকমফের দেখা যায়। কাশ্মীরে যেভাবে কাগজের মণ্ড তৈরি হয়, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে তা একদম আলাদা। এখানে মণ্ডের সঙ্গে গোবর, তুষ, মাটি ব্যবহার করা হয়। আবার রাজস্থানে মণ্ডের সঙ্গে মুলতানি মাটি ব্যবহার করা হয়। কারুশিল্পের ক্ষেত্রে মণ্ডের ব্যবহার সারা পৃথিবীতে হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের মুখোশ, বাক্স, গহনা, এমনকি আধুনিক শিল্পে এর ব্যবহার প্রচুর হচ্ছে।

পেপার পাল্প বা কাগজের মণ্ড তৈরির পদ্ধতি ঃ

উপকরণ ঃ পুরোনো খবরের কাগজ, আঠা, স্ক্র্যাবার, স্পঞ্জ, শিলনোড়া বা মিহি করে পাল্প মেশানোর মেশিন, ছাঁচ, জল, পাত্র ইত্যাদি।

পদ্ধতি ঃ খবরের কাগজের টুকরো ছোটো করে ছিঁড়ে ২৪ ঘণ্টা জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখতে হবে। যদি তাড়াতাড়ি কাগজ ভেজাতে হয়, তাহলে কয়েকঘণ্টা গরমজলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর অন্য একটি পাত্রে হামান দিস্তা দিয়ে বা মিক্সিতে ভালো করে মেশাতে হবে। যাতে কাগজের আঁশগুলি একেবারে মিশে যায়, খুব মিহি মণ্ড করতে চাইলে শিলনোড়ায় বেটে নিতে হবে। তারপর অতিরিক্ত জল ঝরিয়ে নিতে হবে। মার্কিন কাপড় এক্ষেত্রে ব্যবহার করা ভালো। এতে জল ভালোভাবে ঝরে যাবে। এরপর সেলুলোজ পাউডার আঠা বা জিলেটিন বা অন্য আঠা হাত দিয়ে মেশাতে হবে। আঠার পরিমাণ বেশি হলে চলবে না। তিন

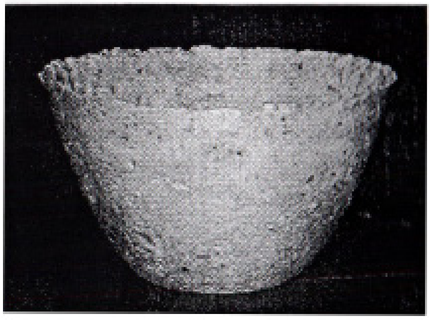

পেপার পাল্পের কাজ

লিটার মণ্ডের সঙ্গে 50 গ্রাম আঠা মেশাতে হবে। এরপর ঘণ্টা দুয়েক রেখে দিতে হবে। ঘণ্টা দুয়েক পরে আরও একবার মণ্ডটাকে ভালো করে মাখতে হবে। এই কাগজের মণ্ড একেবারে মাটির মতো হয়ে যাবে। এই মণ্ড দিয়ে ইচ্ছেমতন যে-কোনো কাজ করা যাবে। বর্তমানে ভাস্কর্য (Sculpture) তৈরি করা হচ্ছে মণ্ড ব্যবহার করে। মণ্ড তৈরি করে দিন দুয়েকের মধ্যে ব্যবহার করা সব থেকে

ভালো। নাহলে মণ্ড নষ্ট হয়ে যায়। তবে যদি শক্ত করে আটকানো পাত্রে অর্থাৎ হাওয়া যাতে না ঢোকে, সেইরকম পাত্রে ঠিকভাবে রাখলে কিছুদিন রাখা যায়।

কাগজের মণ্ডের কাজ তৈরি ঃ

কাগজের মণ্ড দিয়ে কোনো বস্তু তৈরি করতে হলে, সেই বস্তুর ছাঁচের প্রয়োজন হয়। সেই ছাঁচ প্লাস্টার বা প্লাস্টিক বা রাবার যাই হোক না, তা নিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। ছাঁচের উপর releasing agent ব্যবহার করতে হবে। কারণ এর ফলে কাগজের মণ্ড সহজে ছাঁচ থেকে উঠে আসবে। বাজারের releasing agent ব্যবহার করার চেয়ে নিজেরা তৈরি করে নিলে ভালো হয়। এক্ষেত্রে ওয়াক্সপোলের সঙ্গে তার্পিন তেল গরম করতে হবে। যতক্ষণ না ওয়াক্সপোল তার্পিন তেলের মধ্যে মিশে যায় ততক্ষণ একটা কাঠি দিয়ে নাড়াতে হবে। গরম অবস্থায় ভালোভাবে ছাঁচের উপর এই মিশ্রণটি দুই থেকে তিনবার লাগাতে হবে। অতিরিক্ত জলকে বের করে নেওয়ার জন্য স্পঞ্জ দিয়ে আস্তে আস্তে চেপে জল শুষে নিতে হবে।

এরপর কাগজের মণ্ডটি ধীরে ধীরে ছাঁচের উপর লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে ভাস্কর্যের স্ক্র্যাবার ব্যবহার করে মণ্ডকে মসৃণ করতে হবে। দিন তিনেক রৌদ্রে শুকোতে দিতে হবে। বর্তমানে মাইক্রোওভেনে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রেখে শুকিয়ে নেওয়া যায়। মণ্ড শুকিয়ে গেলে ধীরে ধীরে ছাঁচের মধ্য থেকে বার করে নিতে হবে। যে জায়গায় মণ্ড ঠিকমতো মসৃণ হয়নি, সেখানে মণ্ড লাগিয়ে মসৃণ করে নেওয়া যেতে পারে।

সবশেষে শুকিয়ে যাওয়ার পর সাদা রং করতে হবে। এক্ষেত্রে যদি অ্যাক্রিলিক রং করা হয় তাহলে অ্যাক্রিলিক সাদা ব্যবহার করতে হবে। যদি পোস্টার রং ব্যবহার করা হয় তাহলে Zinc oxide বা খড়িমাটি বা Whiting যে-কোনো সাদা রং নিয়ে সঙ্গে ফেভিকল ও জল মিশিয়ে পাতলা করে লাগাতে হবে। শেষে সাদা রং শুকিয়ে গেলে ইচ্ছেমতো রং দিয়ে অলংকরণ করা যাবে।

কাগজের মণ্ডের সুবিধা ঃ

- কাগজের মণ্ডের কাজ অন্যান্য কাজের থেকে অনেক বেশি হালকা হয়। সেজন্য সহজেই অনেক কাজ বহন করা যায়।
- এক ছাঁচে অনেক কাজ উৎপাদন করা যায়।
- টেক্সচার তৈরি করে কাজের জন্য উপযুক্ত মাধ্যম।
- মাটির পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে মাটির পরিবর্তে মণ্ড উপযুক্ত মাধ্যম।
- ফেলে দেওয়া কাগজকে পুনরায় ব্যবহার করা যায়।

কাগজের মণ্ডের অসুবিধা ঃ

- কাগজের মণ্ড দীর্ঘস্থায়ী মাধ্যম হিসেবে থাকে না।
- মণ্ড তৈরি যথাযথ না হলে কাজ টেঁকসই হবে না।

পেপার ম্যাসে (Papper Mache) ঃ

পেপার ম্যাসে শব্দটা ফরাসি ভাষা থেকে এসেছে। একটা কাগজের স্তরের উপর আর-একটা স্তর লাগিয়ে পেপার ম্যাসে করা হয়। প্রাচীন মিশরে এই পদ্ধতিতে কফিন বা মুখোশ তৈরি হত। যদিও এক্ষেত্রে প্যাপিরাস বা কাপড় ব্যবহার করা হত। পরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে পেপার ম্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের দেশে কাশ্মীরে বিভিন্ন বাক্স, ট্রে ইত্যাদিতে পেপার ম্যাসের ব্যবহার দেখা যায়। পুরুলিয়া জেলায় ছৌ-এর মুখোশে পেপার ম্যাসে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে থিয়েটার, পাপেট প্রভৃতি ক্ষেত্রে পেপার ম্যাসে খুবই ব্যবহার করা হয়।

পেপার ম্যাসের পদ্ধতি ঃ

উপকরণ ঃ পুরোনো খবরের কাগজ, আঠা, রং, তুলি, বার্নিশ ইত্যাদি।

পদ্ধতি ঃ খবরের কাগজ ছোটো ছোটো করে ছিঁড়ে নিতে হবে। যে ছাঁচে কাগজগুলি লাগানো হবে সেই ছাঁচটিকে ভালো করে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এরপর ছেঁড়া কাগজগুলি জলে ভিজিয়ে ছাঁচের উপর লাগাতে হবে। প্রথমে একটা বা দুটো স্তর জলে

ভিজিয়ে ভালোভাবে ছাঁচটির উপর লাগাতে হবে। কারণ জলের স্তরের কাগজ আঠার স্তরের কাগজকে ছাঁচের সংস্পর্শে আসতে দেয় না। কাগজটা শুকিয়ে গেলে খুব সহজেই ছাঁচ থেকে উঠে আসে। তারপর ময়দা বা অ্যারারুট দিয়ে তৈরি পাতলা আঠা দিয়ে কাগজের সাত থেকে আটটা স্তরের কাগজ লাগাতে হবে। এমনভাবে আঠা লাগানো কাগজ লাগাতে হবে, যাতে সমস্ত জায়গায় সমানভাবে কাগজ লাগে। বিশেষ করে ছাঁচের ছোটো ভাঁজগুলিতে কাগজ ঠিকমতো ঢুকে যায়। তার জন্য কাঠের স্প্যাচুলা ব্যবহার করতে হবে। বর্তমানে ময়দা বা অ্যারারুটের পরিবর্তে Synthetic আঠা ব্যবহার করা হয়। Polyvinyl acetate (PVA) বা Fevicol জাতীয় আঠা এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

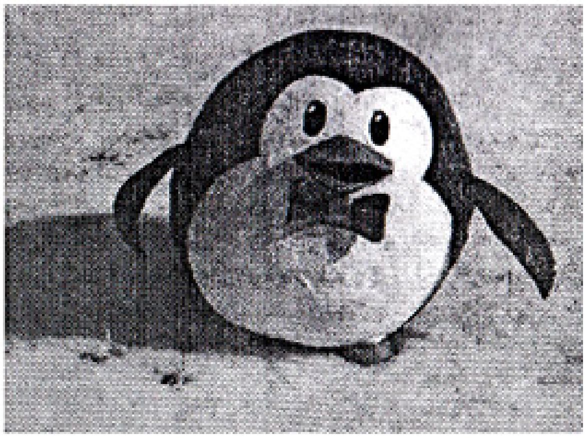

পেপার ম্যাসের কাজ

পেপার ম্যাসের কাজ ছাঁচসহ ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। যদি ঠিকমতো সব জায়গা না শুকোয়, তখন ছাঁচ থেকে পেপার ম্যাসের কাজ বার করে নিলে কাজটি বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরপর সাদা রং ব্যবহার করতে হবে। তবে উপরের স্তরের কাগজ যদি সাদা কাগজ ব্যবহার করা হয় তাহলে ভালো হয়। রঙের ক্ষেত্রে ইচ্ছেমতো রঙে অলংকরণ করা যায়। সবার শেষে বার্নিশ ব্যবহার করলে কাজটি খুবই সুন্দর দেখাবে।

পেপার ম্যাসের সুবিধা ঃ

- পেপার ম্যাসের কাজ খুবই হালকা হয়। খুব সহজেই বহন করা যায়।
- পেপার ম্যাসের কাজ খুব সহজেই করা যায়। বিশেষভাবে শিশুরাও এই পদ্ধতিতে কাজ করতে পারবে।
- ফেলে দেওয়া কাগজ পুনরায় ব্যবহার করা যায়।
- অনেক কম খরচে কাজ করা যায়।

পেপার ম্যাসের অসুবিধা ঃ

- এই কাজ দীর্ঘস্থায়ী হয় না অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী মাধ্যম হিসেবে এর ব্যবহার করা যায় না।
- জলের সংস্পর্শে এলে কাজ নষ্ট হয়ে যায়।

পেপার কাটিং (Paper cutting) ঃ

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে চিনদেশে পেপার কাটিং শুরু হয় বলে মনে করা হয়। চিনের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পেপার কাটিং যুক্ত। এই ঐতিহ্যবাহী পেপার কাটিং পদ্ধতিকে বলা হয় জিয়ানঝি (Jianzhi)। সাধারণত, লাল রঙের পাতলা কাগজ চিনারা ব্যবহার করে। তারা এই পেপার কাটিং-কে উন্নতি, সমৃদ্ধির প্রতীক বলে মনে করে। সেজন্য চিনদেশের প্রত্যেক বাড়ির দরজায় বা বিভিন্ন জায়গায় পেপার কাটিং দেখা যায়। চিনদেশের মেয়েরা পেপার কাটিং-এ সিদ্ধহস্ত ঐতিহ্যবাহী পেপার কাটিং অসাধারণ শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তাই ইউনেস্কো পেপার কাটিংকে "Intangible Cultural Heritage"-এর অন্তর্ভুক্ত করেছে। এ ছাড়া ফিলিপাইন,

জাপান, ইজরায়েল, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে পেপার কাটিং দিয়ে অলংকরণের চল আছে। আমাদের দেশে রঙ্গোলিতে পেপার কেটে অলংকরণ করে মেঝেতে আটকানো হয়। তারমধ্যে রং ভরে দেওয়া হয়।

শুধুমাত্র কাগজের ভাঁজের সংখ্যার পরিবর্তন ঘটিয়ে অর্থাৎ দুভাঁজ, চারভাঁজ, আটভাঁজ করে কাগজ কেটে বিভিন্ন ডিজাইন তৈরি করা হয়।

কাগজ বিভিন্ন ভাঁজ করে কাটা হয়। জাপানে এই ভাঁজ করে কাগজ কাটাকে কিরিগামি (kirigami) বলা হয়। কিরিগামি শব্দটি জাপানি শব্দ। কিরু (kiru) মানে কাটা ও গামি (gami) মানে কাগজ। যদিও কিরিগামি অরিগামির একটা অংশ বলে মনে করা হয়। সাধারণত কিরিগামি দু-দিকে সমানভাবে কাটা হয়ে থাকে। কাগজ কেটে বিভিন্ন কাজের কয়েকটি পদ্ধতি নীচে দেওয়া হল।

কাগজের ডিজাইন ঃ

উপকরণ ঃ মার্বেল কাগজ, কাঁচি, আঠা,

( ) পদ্ধতি ঃ চৌকো মাপের একটা রঙিন মার্বেল কাগজ নেওয়া হয়, তারপর ১ নং চিত্র অনুযায়ী সমানভাবে ভাঁজ করা হল।

( ) কাগজটি আয়তাকার আকার অর্থাৎ ২ নং চিত্রের মতো লাগবে। ২ নং চিত্র অনুযায়ী আর একটা ভাঁজ দেওয়া হল।

( ) এবার কাগজটিকে চিত্র ৩-এর অনুযায়ী কোনাকুনিভাবে ভাঁজ করতে হবে।

( ) ৪ নং চিত্র অনুযায়ী ড্রয়িং করে নিতে হবে। শেষে কাঁচি দিয়ে ড্রয়িং-এর অংশ কেটে ফেলতে হবে

( ) এরপর ভাঁজগুলি খুলে ফেলে একই মাপের অন্য রঙের কাগজে ৫নং চিত্রে বর্ণিত কাটা ডিজাইন আটকে দিতে হবে।

বিভিন্নভাবে কাগজ ভাঁজ করে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন করা যায়। এইভাবে কাগজের পুতুল কাটা চিত্র সহযোগে নীচে দেওয়া হল।

সিল্যুট কাগজ কাটা (Silhouette paper cutting) ঃ

গাঢ় রঙের কাগজ কেটে অবয়ব তৈরি করাকে Silhoutte Paper Cutting বলা হয়। সিল্যুট কাজ গ্রিসদেশে Vase Painting-এ দেখা গেছে। পরে বইয়ের ইলাস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে এই কাজ দেখা গেছে। ছায়া পুতুলে (Shadow Puppet) সিল্যুট চিত্র ব্যবহার করা হয়। সাধারণত হালকা রঙের কাগজের উপর গাঢ় রং দিয়ে অবয়ব কেটে কোনো কম্পোজিশন বা প্রতিকৃতি তৈরি করা হয়। কালো কাগজ ব্যবহার করে সিল্যুট পেপার কাটা হয়।

উপকরণ ঃ কালো কাগজ, কাঁচি, আঠা, সাদা বা হালকা রঙের কাগজ।

- **পদ্ধতি ঃ** কালো কাগজে পেনসিল দিয়ে যে-কোনো অবয়ব ড্রয়িং করে নিতে হবে। ড্রয়িং সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকলে সরাসরি কাঁচি দিয়ে কেটে অবয়ব তৈরি করা যায়।
- ড্রয়িং অনুযায়ী কাঁচি দিয়ে কাগজটাকে কাটতে হবে।
- অন্য একটি surface-এ বা হালকা রঙের কাগজে কাটা কাগজ আটকে দিতে হবে।

এইভাবে ভালো কম্পোজিশন সিল্যুট-এর মাধ্যমে করা যায়।

কাগজ কেটে কম্পোজিশন ঃ

বিভিন্ন রঙের কাগজ কেটে চরিত্র বা দৃশ্য অনুযায়ী রং ব্যবহার করে কম্পোজিশন করা হয়। এই কাজে background থেকে শুরু করতে হয়। অর্থাৎ আকাশ ও মাঠ আগে কেটে আটকাতে হবে, তারপর দূরের বস্তু ও ক্রমান্বয়ে সামনের দিকের বস্তু বা মানুষ কেটে আটকাতে হবে।

পেপার কাটিং-এর সুবিধা ঃ

- খুব সহজে ও অল্প সময়ে কাজটা করা যায়।
- অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় খরচ অনেক কম।
- কাগজ সহজলভ্য মাধ্যম।

- যে-কোনোভাবে কাগজ ব্যবহার করা যায়।
- শিশুরাও এই মাধ্যম ব্যবহার করতে পারে।

পেপার কাটিং-এর অসুবিধা ঃ

- ক্ষণস্থায়ী মাধ্যম,
- পুনরায় ব্যবহার করা যায় না।
- কাগজ ব্যবহারের সময় সাবধানতা অবলম্বন না করলে কাজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- সংরক্ষণ করা যায় না।

কাগজ কেটে কম্পোজিশন

অরিগামি (Origami) ঃ

অরিগামি শব্দটি জাপান থেকে এসেছে অরি (ori) কথার অর্থ ভাঁজ করা ও কামি (kami) পরিবর্তিত হয়ে গামি অর্থাৎ কাগজ। এক কথায় অরিগামি বলতে কাগজ ভাঁজ করে যে শিল্প, এটি জাপানের ঐতিহ্যবাহী শিল্প। সপ্তদশ শতকে জাপানে এর শুরু হয় এবং উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মূল ভাঁজের সংখ্যা অরিগামিতে কম থাকে। সাধারণত, চৌকো কাগজে বিশুদ্ধ অরিগামি করা হয়। তবে আয়তাকার কাগজও ব্যবহার করা হয়। প্রয়োজনে কাগজ ভাঁজ করে কাটা হয়, তাকে কিরিগামি বলে। পূর্বেই এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অরিগামির বৈশিষ্ট্য ঃ

- অরিগামিতে মূল ভাঁজ বা Basic fold ব্যবহার করা হয়। যেমন—Valley fold, Mountain folds, Reverse folds, squash folds প্রভৃতি।
- চৌকো কাগজ ব্যবহার করা হয়।
- কাগজের একদিক রঙিন ও উলটোদিকে সাদা হয়।
- শুধুমাত্র কাগজ ভাঁজ করে অরিগামি করা হয়।

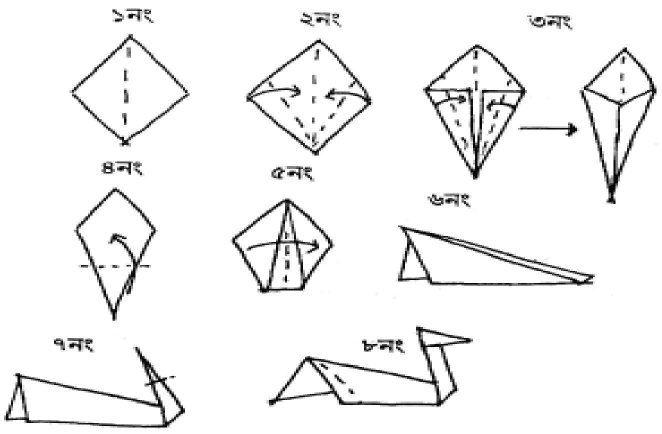

অরিগামি

অরিগামির সুবিধা ঃ • শুধুমাত্র কাগজ ভাঁজ করে করা হয়।
• যে-কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই কাজটা করা যায়।
• প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুকে সহজেই শেখানো যায়।
• কোনো উপকরণ ছাড়াই শুধুমাত্র হাত ব্যবহার করে করা যায়।

অরিগামির অসুবিধা ঃ • ক্ষণস্থায়ী মাধ্যম।
• ভাঁজ ঠিকমতো নাহলে বস্তু তৈরি করা যাবে না।
• খুব সহজেই ছিঁড়ে যায়।

■ মাটির সরার সাহায্যে মণ্ড দিয়ে মুখোশ তৈরি ঃ

• উপকরণ ঃ পোড়ামাটির সরা, কাগজের মণ্ড, পাতলা ন্যাকড়া, পুরানো খবরের কাগজ, আঠার জল, ছুরি, কাঁচি, নরুন, রং, তুলি, হাত মোছার ন্যাকড়া, জল ও জলপাত্র।

• পদ্ধতি ঃ যদি জোকারের মুখোশ হয়—পোড়া মাটির একটি সরার ওপর ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মোছা হল। তার ওপর খবরের কাগজ বিছিয়ে দেওয়া হল সরার মাপ মতো। যাতে ভেতরে হাওয়া না থাকে সেইমতো হাত দিয়ে সমান করে চিটিয়ে দেওয়া হল। এরপর কাগজের মণ্ড তার ওপর কিছুটা পুরু করে চাপিয়ে প্রয়োজনমতো নাক উঁচু করে, চোখের, ঠোঁটের আকৃতি আনা হল। যেমন জোকারের মুখ হয় সেইমতো মডেলিং করা হল—ছুরি, নরুনের সাহায্যে। সবশেষে তার ওপর আটার জল মাখিয়ে পাতলা ন্যাকড়া টান টান করে আটকে দেওয়া হল। চোখের, নাকের ছিদ্র করে নেওয়া হল। কয়েকদিন পর শুকিয়ে গেলে সরা থেকে মুখোশটি ছাড়িয়ে নিয়ে প্রথমে পোস্টার সাদা রং করে তারপরে যেখানে যেরূপ রং দরকার সেইমতো রং করা হল। তেল রং করলে একইভাবে করা হবে। শেষে পিউরিফায়েড ভার্নিস দিয়ে পেইন্ট করে দিতে হবে। এইভাবে বাঘের মুখোশ বা অন্য ধরনের মুখোশও করা যাবে। ছাঁচের সাহায্যেও মণ্ড দিয়ে পুতুল বা অন্য কিছু তৈরি করা যায়।

■ কভার ফাইল তৈরি ঃ

• উপকরণ ঃ শক্ত পিচ্‌বোর্ড ১টি ১০″×১৩″ ফাইল তৈরির শক্ত প্যাস্টেল বা বোর্ড পেপার হাফশিট, মার্বেল পেপার বা ব্রাউন পেপার পিচ্‌বোর্ডের দুই পিঠে সাঁটার ২টি ১০″×১৩″, কাঁচি, ১২ ইঞ্চির স্কেল পেনসিল, আঠা, সরু ফিতে এবং একটি তৈরি ফাইল। ফাইলের কভার পেপারটি শক্ত না পাওয়া গেলে ছবি প্যাস্টেল কাগজ একটির ওপর আর একটি আঠা দিয়ে জুড়ে শুকিয়ে নিলে শক্ত পেপার হবে।

• পদ্ধতি ঃ সামনের তৈরি ফাইলটি দেখে এবং এখানে দেওয়া ফাইলের ছবি দেখে দুপাশে মোড়ার জন্য দুটি কাগজ খণ্ড কেটে নিতে হবে শক্ত প্যাস্টেল পেপার থেকে। লম্বায় দুটি মাপ ১২.৫″ হবে। কিন্তু চওড়া একটির ৯″ ও অপরটির ৭″ হবে। আবার

দুটিরই চওড়া ৯″ করা যায়। তারপর দুটি অংশ ৬.৫″×৯.৫″ করা যায়। এবার চারটি খণ্ড ১″ করে বোর্ডের চারটি কিনারায় ঢুকিয়ে আঠা দিয়ে সাঁটা হবে। পিচ্‌বোর্ডের যেদিকটায় সাঁটা হল সেদিকে পিজবোর্ডটি ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে ভিজিয়ে ভালো করে আঠা মাখিয়ে তার ওপর ব্রাউন পেপার বা মার্বেল পেপার টান টান করে সেঁটে দিতে হবে। ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে সাবধানে আলতো করে মার্বেল পেপারটি ঘষে সেঁটে দিতে হবে যাতে ভেতরে হাওয়া না থাকে বা কুচকে না থাকে। পিচ্‌বোর্ডের অপর পিঠেও একইভাবে মার্বেল পেপার সাঁটা হবে। এরপর ছবির মতো ছুরির ডগা দিয়ে ফিতে পরাবার দুটি ছিদ্র করা হবে। কভারগুলি ভাঁজ করার জায়গায় স্কেলের কিনারায় চাপ দিয়ে ২/৩টি ভাঁজে মুড়ে দিলে ভাঁজ পড়বে। এবার কভারের ওপরে স্প্রে করে বা পেপার কার্টিং বা স্টেনসিল করে নকশা করলে ভালো লাগবে।

■ **অফিস খাম তৈরি ঃ**

● **উপকরণ ঃ** ব্রাউন পেপার, আঠা, ছুরি, কাঁচি, তৈরি খাম, স্কেল, পেনসিল।

● **পদ্ধতি ঃ** ১১″× ৮.৫″ একটি ব্রাউন পেপার নিয়ে তার খসখসে দিকে ছবির মতো এঁকে নিতে হবে। এরপর আঁকা ছবির মতো ডট্ লাইন ধরে কাঁচি দিয়ে কেটে বাড়তি অংশ বাদ দিতে হবে। এবার দুপাশে ছড়ানো দুটি অংশ (২.৫″র একটু বেশি এবং ২.৫″-র একটু কম) মুড়ে এনে একটির ওপর আরেকটি রেখে (অর্থাৎ একটির ভিতরে অপরটি সামান্য ঢুকে থাকবে এবং ওপরের চওড়া মাপটি নীচের ৪.৫″-এর সমান হবে) আঠা দিয়ে জুড়ে দিতে হবে। নীচের বাড়তি .৫″ অংশটি মুড়ে আঠা দিয়ে জুড়তে হবে। ওপরের ত্রিকোণাকৃতি ১″ অংশটি খোলা থাকবে। এভাবে খাম তৈরি হবে। একটি তৈরি খাম দেখে কাজটি করলে আরও ভালো।

■ **শিশুদের পেপার কাটিং শেখানো ঃ**

তৃতীয় শ্রেণি থেকে এই কাজ করানো ভালো। প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেণির শিশুদের হাতে কাঁচি দেওয়া উচিত নয়। শিশুরা প্রথমে আম, কলা, হাঁস ইত্যাদি হাতে ছিঁড়ে করতে পারবে। রঙিন ছবির অংশ কেটে বসাতে শিখবে পরে। যেমন—শুধু একটা ঘরের ছবি, শুধু একটা গাছের ছবি। এভাবেই ধীরে ধীরে তাদের কাজের উন্নতি ঘটাতে হবে।

কাগজ কেটে সুন্দর নকশা করে, স্টেনসিল কাট করে আর্ট পেপারের ওপর বসালে সুন্দর নকশা হবে।

■ **কাগজের সাহায্যে চর্‌কি বা ঘূর্ণি তৈরি ঃ**

● **উপকরণ ঃ** একটু মোটা ধরনের কাগজ, পেনসিল, রাবার, স্কেল, কাঁচি, আঠা, এক টুকরো তার বা সরু পেরেক না হলে আলপিন, একটি চওড়া কাঠি (ভাঙা ঝুড়ির কাঠি হতে পারে)।

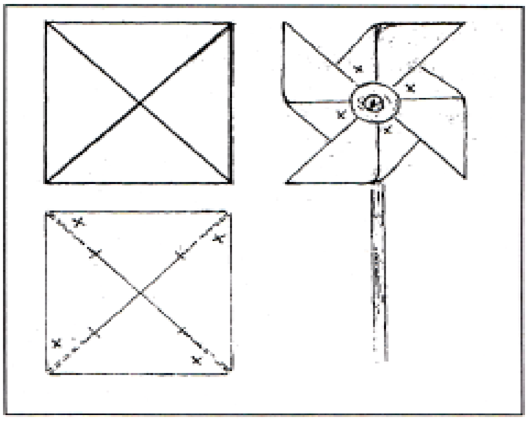

● **পদ্ধতি ঃ** স্কেল পেনসিলের সাহায্যে কাগজে দাগ দিয়ে বর্গক্ষেত্রাকার করে এঁকে সেটি কেটে নেওয়া হল। ছবির মতো চারটি কোণ সরলরেখা দ্বারা যুক্ত করে ক্রুশমতো আঁকা হল। কেন্দ্র থেকে চারটি রেখা পাওয়া গেল। রেখাগুলির মাঝামাঝি পর্যন্ত (যেমন ডট্ লাইন এঁকে বোঝানো হয়েছে) কাঁচি দিয়ে কাটা হল। ক্রুশচিহ্নিত (×) কোণগুলি ভাঁজ করে একসঙ্গে কেন্দ্রবিন্দুতে এনে আঠা দিয়ে সাঁটা হল। এবার আগের কাগজ থেকে দুটি সমান মাপের গোল চাক্‌তি কেটে কেন্দ্রস্থলের সামনে একটি ও পেছনে একটি আঠা দিয়ে সাঁটা হল। কাগজ মোড়া অংশটি বাইরের দিকে রেখে ওটির কেন্দ্রের ভিতর দিয়ে সরু শক্ত তার অথবা গজ পেরেক বা বড়ো আলপিন ঢুকিয়ে কাঠির ডগায় এমনভাবে আটকানো হল চরকিতে হাওয়া লাগলে ওটা সহজেই ঘুরতে পারে। এভাবে একটা চরকি বা ঘূর্ণি হল। কাগজের পিছনের অংশে কেন্দ্রে পেন্সিল গলার মতো ছিদ্র রাখা যায়।

■ **কাগজের আরও বিভিন্ন কাজ ঃ**

● **উপকরণ ঃ** কাগজ, আঠা, কাঁচি, মোটা প্যাস্টেল পেপার, পুরানো খবরের কাগজ, টিস্যু বা ঘুড়ির কাগজ, গাছের পাতা, ঘুড়ি, সুতো, ঘুড়ির কাঠি অথবা ঝাঁটার কাঠি দিয়ে অনেক ধরনের কাজ হয়। কাগজ ভাঁজ করে নৌকা, এরোপ্লেন, ব্যাঙ ইত্যাদি অনেক কিছু করা যায়। এগুলিকে বলে অরিগামি। কাগজ ভাঁজের এই খেলা জাপান থেকে এসেছে। এ সম্বন্ধে আগেই অনেকটা আলোচনা হয়েছে।

টিসু পেপার বা ঘুড়ির কাগজ দিয়ে ঘুড়ি তৈরির পদ্ধতি ঃ

সামনে একটি ঘুড়ি রেখে তা দেখে সেই আকৃতির কাগজ কেটে নেওয়া হবে। কাগজটির চারধারের সীমানা বরাবর সুতোতে আঠা লাগিয়ে বসিয়ে কাগজটির ধার মুড়ে দিতে হবে যাতে কাগজ সহজে ছিঁড়ে না যায়। এবার কাগজটির এক কোণ থেকে বিপরীত কোণ পর্যন্ত একটা মোটা কাঠি আঠা দিয়ে বসাতে হবে। ওপরের কোণে ছোটো একটুকরো কাগজ আঠা দিয়ে সেঁটে কাঠির ওপর দিয়ে বসাতে হবে যাতে কাঠিটি ওই কোণে আটকে থাকে। বিপরীত কোণে ওই ঘুড়ির কাগজের বাড়তি অংশ থেকে ঘুড়ির ল্যাজের অংশের জন্য দুটি সমান মাপের ত্রিভুজাকৃতির কাগজ কেটে নেওয়া হবে। এবার একটি কাটা ত্রিভুজের ওপর সবটা আঠা মাখিয়ে সরু কাঠি ত্রিভুজের তিনদিকে তিনটে বসানো হবে। তারপর বিপরীত কোণে এই কাগজটির চওড়া ধার নীচে রেখে সেঁটে দিতে হবে। দ্বিতীয় কাগজটি উলটো দিকে বসাতে হবে। ঘুড়ির দুধারের কোণ থেকে একটি কাঠি অর্ধবৃত্ত করে আটকানো হবে। এভাবে ঘুড়ি তৈরি হল। সাদা রঙিন মার্বেল কাগজে ফুল, পাতার নকশা এঁকে তারপরে কাঁচি দিয়ে সেগুলি কেটে কাগজের ওপর আঠা দিয়ে সেঁটে বসিয়ে দিলে সুন্দর ডিজাইন হবে। গাছের পাতা কাগজে রেখে পেনসিল দিয়ে তার ধার বরাবর এঁকে নিয়ে পাতাটির নকশা কেটে বসানো যায়। এটির পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ডিজাইন তৈরি হয়।

■ **কাগজের মণ্ড দিয়ে মুখোশ, পুতুল তৈরি ঃ (ছাঁচ থেকে)**

● **উপকরণ ঃ** কাগজের মণ্ড, পুতুল বা মুখোশের ছাঁচ, দড়ি, ছুরি, মিহি ছাই অথবা তেল সাবান, জল, রং, তুলি।

● **পদ্ধতি ঃ** অব্যবহৃত প্লাস্টিকের পুতুল পাওয়া গেলে তাকে সামনে পেছনে আধা-আধি চিরে নিলে দুটি অংশ হবে। ওই দুটির ভেতরের অংশে (এটাই ছাঁচ) ছাইয়ের প্রলেপ দিয়ে টিপে টিপে মণ্ড বসানো হবে বেশ পুরু করে। শুকোলে দুটি অংশ বার করে নিয়ে কাগজ ও আঠা দিয়ে দুটি অংশ জুড়ে নিতে হবে। চোখ মুখ এঁকে রং করা হবে। রঙিন কাগজ বা কাপড়ের টুকরো সেঁটে সাজানো যেতে পারে।

প্লাস্টিকের তৈরি মুখোশ এনে (কিনতে পাওয়া যায়) তার ভিতরের দিকে একই ভাবে মণ্ড দিয়ে মুখোশ তৈরি হবে প্রয়োজনমতো রং করে নিতে হবে।

(ক) মুখোশের ছাঁচে বা শক্ত আদলের ওপর মণ্ড দিয়ে অথবা আঠা মাখানো কাগজের স্তর সেঁটে সেঁটে মুখোশ হয়।

(খ) শক্ত কাগজে মুখোশের ড্রইং করে নিয়ে কেটে নিয়ে তার ওপর রং দিয়ে অথবা রঙের বদলে রঙিন মার্বেল পেপার আঠা দিয়ে আটকে সুন্দর মুখোশ হবে। (জোকার, বাঘ, ছাগলের)। বাঘের গোঁফ ঝাঁটার কাঠি দিয়ে হবে। বইয়ের ছবি দেখে সহজে মুখোশ করা যেতে পারে। বাঘের মুখোশে কালো মার্বেল পেপার দিয়ে সরু ডোরা দাগ হবে।

মোটা কালো কাগজে ছাগলের মুখোশ হবে। লাল মার্বেল কাগজে নাক, মুখ, চোখ হবে। চোখের ভেতরে সাদা হবে (লালের ভেতরে)। তার মধ্যে ছিদ্র থাকবে। মুখের ওপরে নীচে নীল মার্বেল কাগজের ফালি হবে। মাঝের রেখা বরাবর ভাঁজ করে দিতে হবে।

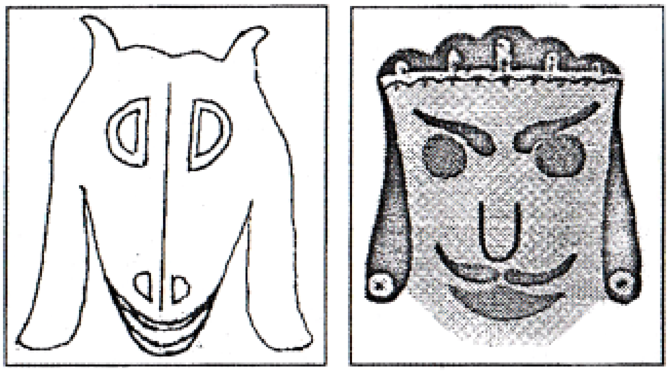

ছাগলের মুখোশ রাজার মুখোশ

• **কাগজ কেটে নকশা ঃ** চার ইঞ্চি ব্যাসের একটি বৃত্তাকার রঙিন মার্বেল পেপারকে দুই বা তিন ভাঁজ করে তার বিভিন্ন দিকে কাঁচি দিয়ে খুব ছোট্ট ছোট্ট অংশ কেটে বাদ দিয়ে কাগজটি সম্পূর্ণ খুললে দেখা যাবে খুব সুন্দর ডিজাইন হয়েছে। এভাবে অনেক ধরনের নকশা করা যায়।

রঙিন ক্রেপ পেপার ফালি-ফালি করে কেটে আঠা দিয়ে শিকলি তৈরি হবে। বিভিন্ন রঙের পতাকাও করা যাবে। ফুলের পাপড়ির মতো কেটে (যেমন পদ্ম ফুল) আঠা দিয়ে জুড়ে ভেতরে তার বা সরু কাঠি আটকে পদ্মফুল বা অন্য যে কোনো ফুল, পাতা করা যাবে। এগুলি দিয়ে সুন্দর স্টেজ সাজানো যায়। এই কাজ ভেলভেট কাগজেও হয়।

• **বুলেটিন বোর্ড/মাউন্ট বোর্ড তৈরি ঃ** একটি শক্ত বোর্ডের মাপ মতো (যেমন এক ফুট বাই দেড় ফুট) পুরানো মোটা কাগজ কেটে একটির ওপর একটি ১০/১৫টি ময়দার আঠা দিয়ে আটকে বেশ পুরু হলে তার দুপিঠে শক্ত সাদা কার্ট্রিজ পেপার সব শেষে আঠা দিয়ে সাঁটা হল। কাগজে আঠা লাগাবার আগে ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে কাগজের ওপর আলতো ঘষে কাগজটি আধ ভেজা করে নিতে হবে। আঠা মাখানো সমস্ত কাগজ একটি পিঁড়ি জাতীয় কিছু দিয়ে চাপা দিয়ে রেখে ১ দিন পরে তুলে নিলে শক্ত বোর্ড পাওয়া যাবে। চাপা দেওয়ার কারণ—কাগজটি বেঁকে বা ফুলে না ওঠে। আঠা লাগাবার সময় আঠা লাগানো কাগজটির ওপরের শুকনো পিঠটি ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে চেপে চেপে বসাতে হবে, যাতে ভেতরে হাওয়া না থাকে। পুরানো মোটা কাগজের বদলে শক্ত পিচবোর্ডের কার্ট্রিজ পেপার সেঁটেও কাজ হবে।

■ **ট্রে তৈরি ঃ**

• **উপকরণ ঃ** একটি আয়তক্ষেত্রাকার পিচবোর্ড (ধরা যাক ৯″× ১৪″), কাঁচি, আঠা, নকশা করা মার্বেল পেপার, ন্যাক্ড়া, স্কেল, পেনসিল।

• **পদ্ধতি ঃ** বোর্ডের চারদিকের সীমারেখা থেকে ১″ ভেতরে স্কেল পেনসিলের সাহায্যে আর একটি আয়তক্ষেত্র আঁকা হল। এর মাপ হল ৭″ ×১২″। বাইরের কোণের দিকে কোণ থেকে ১″ পাশে ভেতরের দাগ পর্যন্ত আগে দাগ দিয়ে নিয়ে পরে কাটা হল, চারটি সীমারেখায়। প্রতি রেখায় একটি করে কাটা হবে। চারদিকের ১″ চওড়া অংশ ভাঁজ করে তোলা হল। শক্ত কাগজ দিয়ে জোড়ার মুখগুলি অর্থাৎ কোণগুলি আঠা দিয়ে আটকানো হল। চারধারের উঁচু অংশগুলো সামান্য ডানদিকে হেলানো থাকলে ভালো। এবার মার্বেল পেপারে ভলো করে আঠা লাগিয়ে ট্রের দুপিঠে ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে চেপে চেপে সেটি লাগানো হল, যেন ভেতরে হাওয়া না থাকে। এভাবে সুন্দর ট্রে তৈরি হল। ইচ্ছামতো যে কোনো মাপের ট্রে করা যাবে।

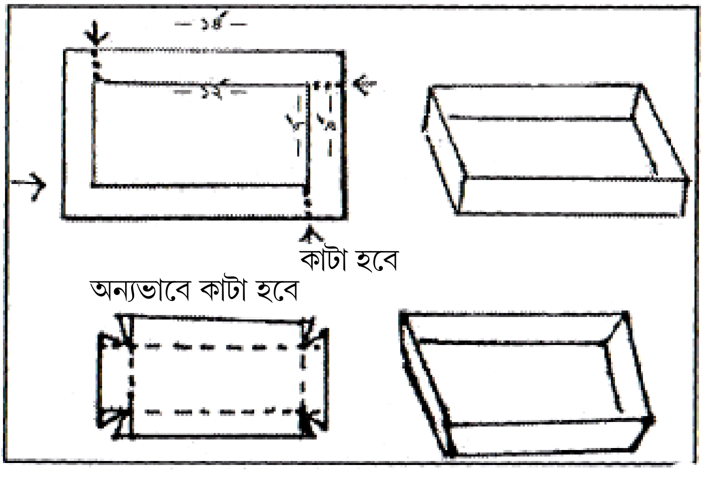

■ **মোটা শক্ত কাগজ ভাঁজ করে মুখোশ ঃ**

• **বাঘের মুখোশ ঃ** দুটো হলুদ রঙের শক্ত প্যাস্টেল পেপার একটির ওপর আর একটি আঠা দিয়ে সেঁটে বসিয়ে শক্ত করা হবে।

মোটামুটি ৯″×৯″ মাপ নিয়ে ছবির মতো এঁকে নিতে হবে এবং সেইমতো কেটে নিতে হবে। ওপরের দিকে V-এর মতো ১″ ঢুকিয়ে কাটা হবে দুটি অংশে। A-এর ওপর B এনে stapler দিয়ে আটকানো হবে। একইভাবে নীচের দুটি কাটা অংশ আঁটা হবে। নীচেরটা একটু দূরে দূরে হবে। মুখোশটিতে এবার মুখে পরার মতো ভাঁজ আসবে। দুটি কানও ছবির মতো ১″ ঢুকিয়ে কেটে A-এর ওপর B এনে আটকানো হবে। কানদুটো ওপরে ভাঁজ করা অংশের ওপরে বসিয়ে stapler দিয়ে আটকানো হবে। রঙিন মুখোশের ছবি দেখে (বইতে আছে) মার্বেল পেপার সেঁটে কাজ হবে। নাকের নীচে গালের দু'পাশের ফোলা অংশ সাদা হবে। চোখের গর্ত কেটে নেওয়া হবে। ঝাঁটার কাঠি দিয়ে গোঁফ হবে। নাকের ডট্ লাইন বরাবর কাটা হবে। মুখোশ পরলে নাকটা উঁচু হয়ে থাকবে। নাকের XY-এর মাঝের লাইনে নীচের দিকে ভাঁজ করে দিতে হবে। Y অংশ লাল হবে।

• **ছাগলের মুখোশ ঃ** কালো শক্ত কাগজে মুখোশের ড্রইং করে নিয়ে কেটে নেওয়া হবে। ওপরের দিকে আগের মতো দুটি অংশ ১″ ঢুকিয়ে কেটে stapler দিয়ে আঁটা হবে। একেবারে নীচে ঠিক মাঝখানে একটি অংশেই ১″ ঢুকিয়ে কেটে একটির ওপর অন্যটি রেখে আঁটা হবে। দুটি লম্বা ঝোলা কানের ওপরের অংশে ১″ ঢুকিয়ে কেটে একটির ওপর অন্যটি রেখে আঁটা হবে। এবার কানের ঝোলা অংশটা মুখোশের ওপরদিকে তুলে ধরে stapler-এ আঁটা অংশটা শিং-এর নীচে আটকে, ঘুরিয়ে ভাঁজ করে নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিতে হবে। শিং দুটি গোল করে পাকিয়ে আঠা দিয়ে আটকে যথাস্থানে বসাতে হবে। নাকের গর্ত, মুখ—লাল মার্বেল পেপারে হবে। চোখের ছিদ্রও কেটে নেওয়া হবে।

শক্ত কাগজ মুখোশ

কোলাজ
(Collage)

• **কোলাজ ঃ** কোনো একটি তলের ওপর (কাগজ, বোর্ড, ক্যানভাস) ফেলে দেওয়া অপ্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিস যেমন—রঙিন কাগজের টুকরো, রঙিন অথবা যে কোনো ছবির অংশ, রঙিন কাপড়ের টুকরো অথবা অন্য যে কোনো অতি সাধারণ জিনিস আঠা দিয়ে সেঁটে একটি অর্থবহ চিত্ররূপ সৃষ্টি করাই হল কোলাজ বা কোলাজের ছবি।

• **ফরাসি শব্দ ঃ 'COLLER' (অর্থাৎ আঠা দিয়ে সাঁটা, glue) থেকে কোলাজ শব্দটি এসেছে। একে সাঁটা ছবিও বলে।** বর্তমানে কোলাজের কাজে প্রয়োজনে সামান্য রং তুলির ব্যবহার করে তাকে 'সেমি কোলাজ' আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। কোলাজ নাম দেন পিকাসো, বার্ক।

পটভূমি ঃ "কোলাজ" নামে না হলেও বিভিন্ন দেশে বহু পূর্বেই এর ব্যবহার ছিল। 'কিউবিজিমের' প্রতিষ্ঠাতা স্পেনীয় শিল্পী পাবলো পিকাসো, তাঁর বন্ধু জর্জেস ব্রাক্‌কে সাথে নিয়ে ব্রাউন পেপারের ওপর কালিকলমে একটি ছবি আঁকেন। দুই মাত্রার ছবিতে ত্রি-মাত্রিক ধারণা দেওয়ার জন্য ছবিটির মাঝখানে 'গুয়াশে' আঁকা একটা ছোট্ট ছবি আঠা দিয়ে সেঁটে দেন ১৯০৮ সালে। ছবির নাম Le Reve। বলাবাহুল্য এটাই প্রথম কোলাজ। [সূত্র ঃ অবন ঠাকুরের কুটুম কাটাম আর পিকাসোর কোলাজ ভাস্কর্য—শ্রী শ্যামল

জানা, পশ্চিমবঙ্গ, অবনীন্দ্র সংখ্যা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ বঃ সরকার] 'গুয়াশ পেন্টিং' হল—পাতলা কাগজের মতো চর্মপত্র বিশেষ যাকে বলে 'ভেলাম' বা Vellum, তার ওপর অস্বচ্ছ জল রং দিয়ে বিশেষ কৌশলে আঁকা ছবি। Assembled Painting নাম দিয়ে পিকাসো কোলাজের কাজ শুরু করেন। ১৯১২-১৩ সালে ব্রাক এবং পিকাসো ক্যানভাসে কিছুটা আঁকা একটা তেলরঙের ছবির পাশে একটি রঙিন অয়েল ক্লথের টুকরো আঠা দিয়ে সেঁটে দিয়েছিলেন। এই অয়েলক্লথের ওপর ছাপা ছিল বেতের চেয়ারের বুনন। ডিম্বাকৃতি ছবিটির চারপাশে সেঁটে দিয়েছিলেন মোটা দড়ি। **Still life with chair caning নামে এই কোলাজটি অসাধারণ কোলাজের নমুনা**। এরপর ওঁরা দুজন Assembled Sculpture নাম দিয়ে কোলাজের ভাস্কর্যও করেন। যেমন ১৯৫০-এ করা Goat (গর্ভবতী ছাগল)। খেজুর গাছের শুকনো ডাল, ডাঁটি শুদ্ধ ঝাঁট দেওয়ার ব্রাশ, কাঠের টুকরো, বেতের ঝুড়ি ও আরও কিছু উপকরণ প্লাস্টার অব প্যারিসের সাহায্যে জুড়ে এই অসাধারণ কোলাজের ভাস্কর্যটি করেন। পরে এটি ব্রোঞ্জে ঢালাই করা হয়।

• **উপকরণ ও পদ্ধতি ঃ** কোলাজের কাজে সুতো, দড়ি, তুলো, পাট, গাছের শুকনো ছাল-পাতা, শুকনো খড়, পিচ্‌বোর্ডের টুকরো, কলে কাটা পেনসিলের ছিলকা, ছবির টুকরো, রাংতা, দেশলাই কাঠি, বালির দানা, কাঠের গুঁড়ো, বিভিন্ন মশলাপাতি, শুকনো বীজ ইত্যাদি সবকিছুই উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়—কোন জিনিসটাই বা ব্যবহার না করা যায়? কাগজ, ক্যানভাস, বোর্ড এবং ভালো আঠা তো অবশ্যই প্রয়োজন।

• **পদ্ধতি ঃ** কোলাজের কাজে কোনো ড্রইং করা হবে না। ড্রইং ধরে কোলাজ করলে কোলাজের মজাই নষ্ট। কাগজের অংশ হাতে করে ছিঁড়ে সাঁটা হবে। হাতে করে ছিঁড়লে ধারে যে সাদা অংশ দেখা যায় তা কোলাজের কাজে এক সুন্দর মাত্রা যোগ করে। অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে কাঁচির ব্যবহার করতে হয় এবং ড্রইং ও করে নিতে হয়। শিশুরা শুরু করতে পারে এভাবে—বিভিন্ন ফলের ছবি, পশুপাখির ছবি, ঘর, গাছ ইত্যাদির ছবি হাতে করে ছিঁড়ে সাজিয়ে কাগজের ওপর সাঁটবে। পেনসিলের ছিল্‌কা গোল করে সাজিয়ে কাগজে সাঁটবে। মধ্যে একট লাল টিপ বসিয়ে দেবে। মোটা সুতোয় সবুজ রং করে সরু ডাল হবে। দুদিকে পাতা সেঁটে দেবে। সুন্দর ফুলের কোলাজ হবে। এ দিয়ে গ্রিটিংস কার্ড করা যায়।

মনে মনে কোলাজের চিত্ররূপটি আগে ভেবে নিতে হবে। সেইমতো উপকরণ নিয়ে কাজ শুরু হবে। **ধরা যাক প্রাকৃতিক দৃশ্য করা হবে**। আড়াআড়িভাবে কাগজটি নিয়ে তার চারধারে এক ইঞ্চ জায়গা ছেড়ে পেনসিলের সাহায্যে দাগ দিয়ে নেওয়া হবে—ফ্লেমিং-এর জন্য। এবার আকাশের জন্য **হালকা নীল কাগজ বা সংগৃহীত আকাশের ছবি সাঁটা হবে। তাঁর ওপর সাদা তুলো পাতলা করে সাঁটলে মেঘের আভাস দেওয়া যাবে**। আবার আকাশের কাগজ সাঁটার কিছু পরে একপাশ থেকে কাগজটি যদি টান দিয়ে তোলা হয়, দেখা যাবে কাগজের কিছু অংশে কোথাও উঠে এসেছে অর্থাৎ সেগুলি সাদা মেঘের আভাস দেবে। আবার কোথাও নীল আকাশের রং কাগজে ছিটিয়ে আছে। যাহোক, এবার দূরের গাছ, ঘর হবে। সব শেষে হবে একেবারে সামনের অংশ। **ঘরের চাল খড় দিয়ে, গাছের কাণ্ড শুকনো ছাল দিয়ে হবে। রাতের আকাশে রাংতা, পুঁতি ব্যবহার করা হবে।**

পেপার কাটিং করে কোলাজ ঃ বিভিন্ন রঙের মার্বেল পেপার বা ছবির বিভিন্ন অংশ কাঁচি দিয়ে কেটে অথবা হাতে ছিঁড়ে, কাটা বা ছেঁড়া অংশগুলি কাগজ বা উপযুক্ত তলের ওপর রেখে সাজিয়ে দেখে নিয়ে সেগুলি আঠা দিয়ে সেঁটে সুন্দর কোলাজ হবে। **শিশুরা কোলাজের কাজে খুব উৎসাহ পায়, এতে ড্রইংয়ের ভীতি নেই। কাগজ সাঁটতে সাঁটতে যাহোক কিছু একটা মজার ছবি হয়ে যায়**। জলরঙে আঁকতে গিয়ে ভাবনা আসে কোথায় কী রং দিতে হবে—এক্ষেত্রে সে চিন্তা নেই। হাতের কাছে সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত। পেপার কাটিং এবং কোলাজের জনপ্রিয়তা তাই এত বেশি।

কোলাজের কাজের সংরক্ষণ ঃ কোলাজের কাজে যদি কিছু খসে পড়ার মতো থাকে তাহলে কাজটি স্যালোফেইন কাগজ দিয়ে মুড়ে আটকে দিতে হবে। এছাড়া কাঁচ দিয়ে ফ্রেমে বাঁধাই হবে।

কোলাজের বৈশিষ্ট্য ঃ (বিশেষত্ব)

(১) এর অসংখ্য উপকরণ সহজেই সংগ্রহ করা যায়।

(২) ড্রইং-এর এবং যথোপযুক্ত রং দেবার ভাবনা বা ভীতি নেই। হাতের কাছেই বিভিন্ন রঙিন বস্তু-উপকরণ প্রস্তুত।

(৩) বুদ্ধি খাটিয়ে এবং ধৈর্য সহকারে করলে অসাধারণ ত্রিমাত্রিক ছবি করা যাবে।

(৪) মনের মতো না হলে কাজটি বাতিল করার দরকর নেই। কাজের ওপরেই আবার উপযুক্ত উপকরণ অংশ সেঁটে অনায়াসে সংশোধন করে নূতন রূপ দেওয়া যায়।

(৫) সৃজনক্ষমতা ও সৃজনচিন্তার খুব সহজেই বিকাশ লাভ হয়। অল্প চেষ্টাতেই দক্ষতা অর্জন করা যায়। ফলে সহজেই কর্মপ্রচেষ্টা ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন উপকরণের বহু বিস্তৃত জ্ঞান ও বোধ অর্জিত হয় যা শিক্ষার অন্যতম শর্ত।

(৬) কোলাজ সম্পূর্ণ আলাদা একটি চিত্র-শিল্প মাধ্যম। রং-তুলির ব্যবহার ছাড়াই যে কেউ অতি সহজেই এই কাজ করতে পারে। কোলাজের ব্যাপক চর্চার ও প্রসারের পিছনে এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রধান।

(৭) কোলাজ আলঙ্কারিকও হতে পারে, দৃশ্য বিষয় হতে পারে।

কোলাজের প্রকারভেদ ঃ

কোলাজের কাজ এখন বহুবিস্তৃত। সাধারণভাবে কোলাজ তিন ধরনের হতে পারে।

১। চিত্রধর্মী।

২। অলংকরণ ও সজ্জাধর্মী।

৩। বিষয়বস্তুধর্মী।

১। **চিত্রধর্মী কোলাজ ঃ** কোলাজের বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে যে-কোনো চিত্ররূপ বা ছবি তৈরি করাই হল চিত্রধর্মী কোলাজ। পদ্ধতি আগেই বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে সুন্দর গ্রিটিংস কার্ডও করা যায়।

২। **অলংকরণ ও সজ্জাধর্মী কোলাজ ঃ** কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে স্টেজ সাজানো, ঘর সাজানোর জন্য কাপড়, বোর্ড বা অন্য কোনো উপযুক্ত তলের ওপর বিভিন্ন উপকরণ আঠা দিয়ে সেঁটে সাজানো হয়।

উপকরণ ঃ বিভিন্ন চুম্‌কি, রঙিন ফিতে, কাগজের ফুল, শোলার চাঁদমালা, কাগজে আঁকা কলকা-আলপনা ইত্যাদি বিভিন্ন সজ্জা উপকরণ এবং আঠা। প্রয়োজনে ছুঁচ-সুতো লাগতে পারে।

পদ্ধতি ঃ যেখানে যেটি মানায় সেখানে সেই উপকরণ আঠা দিয়ে সেঁটে অলংকৃত রূপ ফুটিয়ে তুলতে হবে।

৩। **বিষয়বস্তুধর্মী ঃ** নির্দিষ্ট কোনো বিষয়কে আকর্ষণীয় করে বোঝানোর জন্য বিষয় সম্পর্কিত নানান ফটোগ্রাফ, ছবি সাজিয়ে সেগুলি কোনো তলের ওপর সেঁটে Photo montage জাতীয় কোলাজ হয়।

ধরা যাক—নেতাজির দেশপ্রেম সম্পর্কিত কোলাজ হবে এর উপকরণ ঃ

নেতাজির বিভিন্ন কর্মধারার ছবি যা বিভিন্ন খবরের কাগজে ছাপা হয় তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে—সেগুলি সংগ্রহ করা। তাঁর বিভিন্ন ফোটোগ্রাফ, তাঁর সম্বন্ধে লেখার অংশবিশেষ, তাঁর নিজের হাতের লেখার অংশবিশেষ, তাঁর বিভিন্ন উক্তি বিভিন্ন সময় করা ইত্যাদি এবং আঠা।

ফেলে দেওয়া অপ্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে হাতের কাজ
(Craft with waste/discarded materials)

ফেলে দেওয়া অপ্রয়োজনীয় জিনিস বা সহজেই পাওয়া যায় এমন অনেক জিনিস আছে—যা দিয়ে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে অনেক রকমের সুন্দর ক্রাফ্‌টের কাজ করা যায়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা সহজেই এরূপ কিছু কাজ করে শিশুদের শেখাতে পারবেন। শিশুরা নিজ হাতে এসব কাজ করে খুব আনন্দ পাবে। (কিছু কাজ T.L.M. হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে)।

■ **সহজ কিছু কাজ, যেমন ঃ**

১। **গ্রিটিংস কার্ড ঃ** অপ্রয়োজনীয় খাতার শক্ত মলাটের ওপর আঠা দিয়ে সাদা কাগজ সেঁটে গ্রিটিংস কার্ডের মতো তৈরি করে, তার ওপর কলে কাটা পেনসিলের ছিল্‌কা গোল করে বসিয়ে আঠা দিয়ে সেঁটে সুন্দর ফুলের পাপড়ি করা যাবে। মাঝখানে ছোট্ট লাল টিপ বা কাগজের টিপের মতো কেটে বসিয়ে তুলির টানে সবুজ ডাঁটি এঁকে দেওয়া যাবে। পাশে পাতার ছাপ দেওয়া যাবে।

কোলাজ করেও এরূপ কাজ হতে পারে। সুতোতে রং মাখিয়ে সুতোর টানে ছাপ তুলে অথবা পাতার ছাপ তুলে বা স্প্রে করে বা টেনসিল কাট করে ছাপ তুলে সুন্দর কার্ড হতে পারে।

২। **ফুলদানিতে সাজাবার ফুল তৈরি ঃ** ছেঁড়া ঘুড়ির কাগজ বা অন্য রঙিন কাগজের টুকরো দিয়ে আঠার সাহায্যে ফুল হবে। রঙিন ফিতের টুকরো, পাতলা স্পঞ্জ পাপড়ির মতো সাজিয়ে সেলাই করে ফুল হবে। কাঠি গুঁজে দিয়ে ফুলের ডাঁটি হবে। এভাবে ফুলের মালাও হবে।

৩। পুরানো খবরের কাগজ দিয়ে আঠার সাহায্যে ঠোঙা হবে। কাগজের খাম, ফ্ল্যাট ফাইল, কভার ফাইল, ট্রে ইত্যাদি হবে।

৪। কাগজের মুখোশ হবে (কাগজের কাজ দ্রষ্টব্য)

৫। পিচবোর্ডের ওপর আঠা দিয়ে পুরানো শক্ত কাগজ পাহাড়পর্বতের মতো করে আঠা দিয়ে সেঁটে—পর্যায়ক্রমে পর্বত, পাহাড়, মালভূমি, সমভূমি, সাগর ইত্যাদি করা যাবে। প্রয়োজনমতো রং করতে হবে। সর্বোচ্চ স্থানে বরফের সাদা রং, পাহাড়ের কালচে নীল রং, মালভূমির খয়েরি রং, সমভূমির সবুজ রং, সাগরের হালকা নীল রং হবে। ওপর থেকে নদী নেমে এসে সাগরে মিশছে—সরু সাদা রং-এ দেখাতে হবে। এটি ভূগোলের পাঠদানে T.L.M. হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৬। পিচবোর্ডের বা থার্মোকলের সাহায্যে ঘর, বাড়ি, যানবাহন হতে পারে। (T.L.M. হতে পারে) পিচবোর্ডের গোল চাকতির ওপর শক্ত কাগজ আঠা দিয়ে সিলিন্ড্রিক্যালভাবে বসিয়ে পেনস্ট্যান্ড, কাগজের ফুল রাখার ফুলদানি হবে। ফেলে দেওয়া মোটা কাগজের তৈরি দুটো গ্লাস মুখোমুখি আঠা দিয়ে জুড়ে তার গায়ে সুন্দর নকশা করে, জরি চুমকি বসিয়ে ফুলদানি হবে। ওপরটা গোল করে কেটে দিতে হবে।

৭। দোকানের ডিম রাখার ট্রে—পরে যা ফেলে দেওয়া হয় তা সংগ্রহ করে জলে ভিজিয়ে, নরম করে আঠা মিশিয়ে চট্‌কে কাগজের মণ্ড করা যাবে। তা দিয়ে মুখোশ, ফুলদানি, পুতুল, ধূপদানি, বাতিদান বা যেকোনো জিনিস করা যাবে। প্লাস্টিক পুতুলের গায়ে পুরু করে মাটি চাপিয়ে মাটির ছাঁচ করে, তা শুকিয়ে তার মধ্যে মণ্ড টিপে টিপে বসিয়ে, শুকিয়ে দিয়ে বার করে পুতুল করা যাবে।

৮। **ছেঁড়া শাড়ির পাড়ের সুতো দিয়ে বা সেলাই করে কাঁথা সেলাই করে ঃ**

রান সেলাই ঃ সেলাই শিক্ষার প্রথম ফোঁড় দেওয়ার শিক্ষাই হল রান ফোঁড়। নীচ থেকে ফোঁড় তুলে একটু এগিয়ে নীচে নামিয়ে আগের সমদূরত্ব বজায় রেখে আবার ফোঁড় তুলে একই দূরত্ব বজায় রেখে আবার নীচে নামতে হবে। এভাবেই সেলাই চলবে। একটি সরলরেখার মতো সেলাই চলবে। সামনে-পিছনে সেলাই একইরকম দেখতে হবে। কাঁথা সেলাইতে এই ফোঁড় দেওয়া হয়। শাড়ির পাড়ের রঙিন সুতো দিয়ে সেলাই হয়। কয়েকটি বাতিল করা শাড়ি/ধুতি একটির ওপর আরও একটি নিয়ে পুরু করে সেলাই করে নিতে হবে। তার ওপর রান সেলাই করে, নকশা করে সুন্দর কাঁথা তৈরি হবে যা শীতে গায়ে দেওয়া যাবে।

৯। **অপ্রয়োজনীয় ন্যাকড়ার সাহায্যে ন্যাকড়ার পুতুল হবে ঃ**

ন্যাকড়ার পুতুল (Making of Toys, Dolls) ঃ একটি পুতুলের মতো এক ভাঁজ কাপড়ের ওপর এঁকে নিয়ে কেটে নিতে হবে। নীচের দিকে বাদ দিয়ে বাকি অংশে সেলাই করে নিতে হবে। এবার উলটে নিয়ে (সেলাইয়ের দিকের অংশ ভেতরে যাবে) তার ভেতর তুলো, অথবা কাঠের গুঁড়ো ভরে নিয়ে বাকিটা সেলাই করে নিতে হবে। কালো সুতো সেলাই করে চুল, চোখ এবং লাল সুতোর সেলাইয়ে ঠোঁট হবে। নাক সামান্য উঁচু করে নিয়ে সেলাই হবে। এরপর শাড়ি, ঘাঘরা, মাথায় ওড়না দিয়ে সাজানো হবে। গলায়, কোমরে চুমকি বসানো হবে। এভাবে পুরুষ পুতুলও হবে। তার সেইমতো পোশাক হবে।

খালি শিশির মাথায় গুলি বসিয়ে কাগজের সাহায্যে পুতুল তৈরির কথা ‘কাগজের কাজের’ অংশে বলা হয়েছে।

১০। **পাটের পুতুল, তালের আঁটি দিয়ে সিংহ, ডিমের খোলার পেঙ্গুইন ‘পাখি’ সরু বাঁশের পেন স্ট্যান্ড ঃ**

পাটের পুতুল ঃ একগুচ্ছ সোনালি পাট চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে নিয়ে সেই পাট আঙুলের ওপর পাটের মাঝামাঝি অংশ রেখে আঙুলের দুদিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। এবার আঙুলের নীচের অংশ চেপে ধরে বার করে নিয়ে চেপে ধরা অংশ সুতো দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল। এটি মাথা হল। মাথার দুপাশে কিছুটা পাট ঝুলিয়ে গলার কাছে বেঁধে চুল হবে। গলার নীচে কাঁধের কাছে দুপাশে কিছুটা

পাট হাতের মতো করে বাঁধা হল। এবার ন্যাকড়া বা রঙিন কাগজের টুকরো ফেভিকলের আঠা দিয়ে জুড়ে ফ্রক বা অন্য পোশাক করা হল। কালো কাগজের টুকরো এঁটে চোখ, ঠোঁট হল। কালো সুতো বা উল আঠা দিয়ে বসিয়ে চুল হল। শিশির গায়ে পাট দিয়েও হবে এই কাজ।

পিচবোর্ডের বাক্সে চারটি চাকা বসিয়ে গাড়ি হবে।

তালের আঁটি বেশ কিছুদিন মাটিতে পুঁতে রাখার পর তুলে নিয়ে সিংহের মুখ করা যায়। ওর আঁশগুলো সিংহের কেশর হবে। টুকরো কাগজ ফেভিকল দিয়ে বসিয়ে চোখ মুখ হবে।

ডিমের খোলা দিয়ে পেঙ্গুইন, পাখি বা কিছু করা যায়। ডিমের খোলার ভিতর বালি ভর্তি করে (ভারী করার জন্য) সেটি ছোটো একটি মাটির তৈরি প্লেটের বা ফলকের ওপর কিছুটা চেপে বসানো হল। কালো কাগজ দিয়ে আঠা দিয়ে জুড়ে পেঙ্গুইনের লম্বা ঠোঁট, লাল ও কালো মার্বেল কাগজ দিয়ে চোখ হল।

ছাঁচ থেকে মাটি দিয়ে পুতুল করা যাবে। সেগুলি প্রথমে ছাঁচ থেকে তুলে শুকিয়ে সাদা খড়ি রং আঠায় মিশিয়ে রং করে পরে অন্যান্য রং করা যাবে।

আইসক্রিমের চামচ দিয়ে পুতুল ঃ

আইসক্রিম খাওয়ার চামচ ব্যবহার করে বিভিন্ন চরিত্রের পুতুল করা যেতে পারে। এই পুতুলগুলি দিয়ে গল্প বলা যেতে পারে।

উপকরণ ঃ আইসক্রিমের কাঠি বা চামচ, স্কেচ পেন, রঙিন প্রিন্টেড কাগজ, পুরোনো কার্ড, ফেভিকল, কাঁচি, সোনালি কাগজ, পুরোনো ম্যাগাজিন।

পদ্ধতি ঃ প্রথমে আইসক্রিমের চামচের উপরদিকে মুখ, নাক, চোখ আঁকতে হবে। একটি রঙিন বা প্রিন্টেড কাগজ ত্রিভুজাকৃতি করে কাটতে হবে। তারপর মুখের নীচের থেকে পোশাকের মতো করে আঠা দিয়ে আটকে দিতে হবে। মুখের উপরে কালো কাগজ দিয়ে চুল করতে হবে। গলার কাছে সোনালি কাগজ সরু করে কেটে আটকে দেওয়া যায়। প্রয়োজনবোধে অন্য রঙের কাগজ ব্যবহার করা যায়। নিজের ইচ্ছেমতো পুতুলটি সাজিয়ে নেওয়া যায়।

পেনদানি ঃ

ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক বা টিনের কৌটো ব্যবহার করে পেনদানি করা যায়।

উপকরণ ঃ কোল্ড ড্রিংকসের কৌটো, যে-কোনো রঙের কাগজ, রং, প্যাস্টেল রং, তুলি, ফেভিকল।

পদ্ধতি ঃ প্রথমে একটি কাগজ নিয়ে কৌটোকে গোল করে ঢেকে দিতে পারে, সেরকম মাপে কেটে নিতে হবে। এরপর সাদা প্যাস্টেল রং ব্যবহার করে নকশা আঁকতে হবে। এক্ষেত্রে খুব সহজ আকারের নকশা নেওয়া বাঞ্ছনীয়। পাতা, ফুল বা সহজ কয়েকটি রেখা ব্যবহার করা যেতে পারে। এরপর যে-কোনো রঙের পোস্টার কালার বা ওয়াটার কালার নিয়ে কাগজটির উপর ওয়াশ দিতে হবে। এতে সাদা প্যাস্টেলের নকশা তৈলাক্ত হওয়ায় রঙে ঢাকবে না। অর্থাৎ নকশা ফুটে উঠবে। শুকিয়ে যাওয়ার পরে আঠা দিয়ে কাগজটাকে কৌটোর উপরে লাগিয়ে দিতে হবে। তাহলে খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল পেনদানি।

ডিমের ট্রে'র কচ্ছপ ঃ

ডিম রাখার ট্রে দিয়ে সুন্দর কচ্ছপ বানানো যায়। যা দেখতে খুব মজাদার হয়।

উপকরণ ঃ ট্রে, মোটা কার্ড, রঙিন কাগজ, ফেভিকল, কাঁচি, রং, স্কেচ পেন।

পদ্ধতি ঃ প্রথমে ডিমের ট্রে থেকে একটি ডিমের খাপ কেটে নিতে হবে। এই খাপটি সুন্দরভাবে গোল করে কেটে নিতে হবে। এরপর এটার গায়ে কচ্ছপের গায়ের গোল দাগের মতো কাগজ কেটে নিয়ে খাপের গায়ে আঠা দিয়ে লাগাতে হবে। আরও আকর্ষণীয় করতে হলে আগে ডিমের খাপটি রং করে নেওয়া যেতে পারে। মোটা কার্ডের উপর কচ্ছপের মুখ, পা আঁকতে হবে এবং রং করে নিতে হবে। শেষে এগুলি কেটে আঠা দিয়ে আটকে দিতে হবে। এইভাবে সুন্দর কচ্ছপ তৈরি হয়ে গেল।

বাঁধনি ও ফেব্রিক পেন্টিং
(Tie and Dye Fabric Painting)

প্রাচীনকাল থেকে কাপড় রং করা এবং তার উপর কারুকার্য করার পদ্ধতি চলে আসছে। নতুন প্রস্তরযুগে কাপড় রং করার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সেই সময় আয়রন অক্সাইড, কাদা থেকে তৈরি অলংকার ব্যবহার করা হত। চিনে পাঁচ হাজার বছর আগে গাছ, গাছের ছাল থেকে বিভিন্নভাবে রং তৈরি করে ব্যবহার করা হত। পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশে কাপড় রং করার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদারোতেও গাছপালার নির্যাস থেকে কাপড় রাঙানো হত। পেরুতে 500 থেকে 800 খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন ধরনের নকশা সমৃদ্ধ কাপড় রং করার পদ্ধতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। এরা উজ্জ্বল লাল, হলুদ, নীল, সবুজ রং ব্যবহার করত। পশ্চিম আফ্রিকায় Indigo dye করা হত। দ্বাদশ শতকে ইংরেজি শব্দে Dye কথাটা এসেছে। ‘Dye’ বলতে রং করা বোঝায়, এবং Tie and Dye বলতে বেঁধে রং করা বোঝায়।

কোনো কাপড়কে বিভিন্নভাবে ভাঁজ করে ও বেঁধে রং করার পদ্ধতিকে Tie and Dye বলা হয়। জাপানে অষ্টম শতাব্দী থেকে সেলাই করে Dye করা হত। জাপানের ঐতিহ্যবাহী পোশাক কিমোনোর জন্য Tie and Dye-এর মাধ্যমে নকশা করা হত। এই পদ্ধতিতে ছাপাকে বলা হয় শিবোরি। ইন্দোনেশিয়ায় Tie and Dye-কে বলা হয় প্ল্যান্‌জি ও ট্রিটিক। রং করার আর এক পদ্ধতিকে Ikkat বলা হয়।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় কাপড় রং করার পদ্ধতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। বর্তমানে রাজস্থানে কাপড় রং করা কুটিরশিল্প হিসেবে পরিগণিত হয়, যা বাঁধনি নামে পরিচিত। শুধুমাত্র বিভিন্ন রকমভাবে বেঁধে কাপড় রঞ্জন করার পদ্ধতিকে বাঁধনি বলে। রাজস্থানী বাঁধনি বলতে ছোটো ছোটো গোলাকৃতি আকারের নকশাকে বোঝায়। শাড়ি, ওড়না, চুড়িদার ইত্যাদির কাপড়ে এই বাঁধনির নকশা খুবই জনপ্রিয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুটি রঙের বাঁধনি পাওয়া যায়। দু-ধরনের Dye বা রং করার পদ্ধতি পাওয়া যায়। (1) প্রাকৃতিক (Natural) (2) কৃত্রিম যা মানুষ দ্বারা তৈরি অর্থাৎ Synthetic Dye। প্রাচীনকাল থেকে প্রাকৃতিক Dye চলে আসছে। 1856 খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম পারকিন্‌স মভেন Dye আবিষ্কার করেন। প্রাকৃতিকভাবে রংকে স্থায়ী করার জন্য লবণ, ভিনিগার, ফিটকিরি ও অ্যামোনিয়া রঙের সঙ্গে মেশাতে হয়।

প্রাকৃতিক রং দু-রকমভাবে আমরা পাই, যথা—

(ক) খনিজ রং (Inorganic)

(খ) গাছপালা ও জীবজন্তু থেকে প্রাপ্ত রং (Organic)

আবার রঙের চরিত্র অনুযায়ী দু-রকম রং পাই, যথা—

(ক) Dye colour অর্থাৎ যে রং জলের সঙ্গে সহজে দ্রবীভূত হয়ে যায়, যার কোনো তলানি পড়ে না, সেগুলিকে Dye colour বলে। এই রং কাপড় রং করার অর্থাৎ Dye করার কাজে লাগে।

(খ) Surface colour অর্থাৎ যে রং জলে মিশে যাওয়ার পরে জলে তলানি পড়ে তাকে Surface colour বলে। এই রং কাপড় প্রিন্টিং-এর কাজে লাগে।

Dye ও Surface রং নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা অধ্যায় 6-এ ‘রং’-এর অংশে দ্রষ্টব্য।

Dye-এর শ্রেণিকরণ ঃ

বিভিন্ন ধরনের Dye করার পদ্ধতি আছে।

(1) অ্যাসিড ডাই (Acid Dye)

(2) বেসিক ডাই (Basic Dye)

(3) সাবস্টেনটিভ কটন ডাই (Substantive cotton Dye)

(4) সালফার ডাই (Sulphur Dye)

(5) ডরডেন্ট ডাই (Dordant Dye)

(6) ভ্যাট ডাই (Vat Dye)

(7) ডেভেলপিং ডাই (Developing Dye)

বাঁধনি (Tie and Die)

কাপড় বেঁধে বেঁধে করা হয় বলে এই কাজকে বাঁধনি বলে। ভারতবর্ষে রাজস্থানে বাঁধনি কুটিরশিল্প হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। সালোয়ার কামিজ, শাড়ি, ওড়না ইত্যাদিতে বাঁধনির কাজ করা হয়। বাঁধনি অনেক প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে।

বাঁধনির পদ্ধতি ঃ

যে-কোনো সুতির কাপড় নিয়ে মাড় তুলে নিতে হবে। তারপর প্রয়োজন অনুযায়ী মার্বেল, ডাল, মটরদানা ইত্যাদি নিয়ে কাপড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে বাঁধতে হবে। সুতো দিয়ে ঠিকমতো পেঁচিয়ে গিঁট দিতে হবে। যে অংশটা বাঁধা হবে, সেটা সাদা থেকে যায়। যদি আরও রং করা হয় তাহলে আবার বাঁধতে হবে। সবসময় মনে রাখতে হবে বাঁধনির রং করতে গেলে হালকা রং থেকে শেষে গাঢ় রং করতে হবে। অর্থাৎ যদি হলুদ ও মেরুন করা হয়, এক্ষেত্রে হলুদ আগে ও মেরুন পরে করা হবে। বাঁধনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈচিত্র্য আনা যায়। যেমন নারিকেল দড়ি দিয়ে বাঁধলে একরকম, আবার মোটা সুতো বাঁধলে আর একরকম, আবার সেলাই করে এগোলে আর একরকম effect সৃষ্টি হবে। যদি লাঠির ওপর পেঁচিয়ে কাপড়টাকে বাঁধা হয়, তা অন্য effect তৈরি করবে।

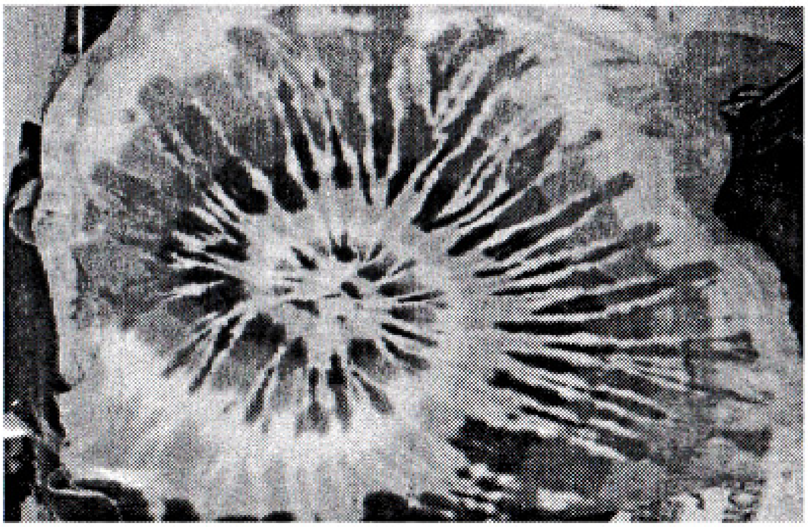

বাঁধনির কাজ

প্রথমে ইন্ডিগো কালারের সঙ্গে গরমজল সামান্য পরিমাণে মেশাতে হবে। এরপর সোডিয়াম নাইট্রেট মেশাতে হবে। এই মিশ্রণটি 4 লিটার ঠান্ডা জলে মেশাতে হবে। প্রায় পনেরো মিনিট রাখার পর কাপড়টিকে ওই মিশ্রণে ভেজাতে হবে। এটি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে কাপড়টির কোনো অংশ যেন মিশ্রণের বাইরে না থাকে অর্থাৎ মিশ্রণে সম্পূর্ণভাবে ডুবে থাকে।

মিনিট কুড়ি মিশ্রণে ডুবিয়ে রাখার পর কাপড়টিকে ছায়াতে শুকোতে দিতে হবে। কাপড় সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে একটি পাত্রে চার লিটার জল ও 10 মিলিলিটার সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে ভালোভাবে নেড়ে দিতে হবে। এবার শুকনো কাপড়টিকে ওই দ্রবণে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর ছায়ায় কয়েকদিন ধরে শুকোতে দিতে হবে। একদম শুকিয়ে গেলে বাঁধনির বাঁধনগুলি ধীরে ধীরে খুলে ফেলতে হবে। দু-তিনরকম রং ব্যবহার করলে আবার বাঁধতে হবে এবং রং-এ ডোবাতে হবে।

বাঁধনি রং করার পদ্ধতি ঃ

বাঁধনি রং করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। যেসব ডাই বা রং বাজারে পাওয়া যায় তা সবই পাউডারের আকারে পাই। নীচে বাঁধুনির রং করার কয়েকটি পদ্ধতির নাম দেওয়া হল।

1. ন্যাপথল/ব্রেনথল (Developed Dyes)

2. ইন্ডিগোসল বা সেলেগুজ (Soluble Vat Dyes)

3. ভেষজ রং (Vegetable Dyes)

ন্যাপথল/ব্রেনথল (Developed Dyes) ঃ

কাপড় রং করার জন্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি উপকরণ দরকার। তা হল—একটি স্টিলের বাটি, চামচ, দুটি বড়ো গামলা, স্টোভ। নীচে রং বা কালার বেস ও কালার সল্টের পরিমাণ দেওয়া হল।

কালার বেস ঃ

ন্যাপথল/ব্রেনথল—1 ভাগ

কাপড় কাচা সাবান বা টার্কি রেড অয়েল বা মনোপল—1 ভাগ

গরমজল—3 ভাগ

কস্টিক সোডা—$1^1/_2$ ভাগ

ফরম্যাল ডিহাইড— 1 ভাগ

একটা স্টিলের বাটিতে কাপড় কাচা সাবানের দ্রবণ বা টার্কি রেড অয়েল নিতে হবে। তারপর এর সঙ্গে ন্যাপথল/ব্রেনথল মেশাতে হবে। এই মিশ্রণের সঙ্গে কস্টিক সোডা মেশাতে হবে। যদি দীর্ঘসময় ধরে রং তৈরি করে রেখে দেওয়ার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে ফরম্যাল ডিহাইড মেশাতে হবে। যদি সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করা হয়; তাহলে ফরম্যাল ডিহাইড মেশাবার প্রয়োজন হয় না। মিশ্রণটি তৈরি হয়ে গেলে কাপড়ের ওজনের দশগুণ বেশি ওজনের জল গামলায় নিতে হবে। তার মধ্যে ন্যাপথল/ব্রেনথলের দ্রবণটি মেশাতে হবে। এইভাবে কালার বেস তৈরি করে নিতে হবে।

কালার সল্ট ঃ

কালার সল্ট—ন্যাপথল/ব্রেনথল যতটা নেওয়া হবে তার $1^1/_2$ থেকে 2 গুণ

খাবার লবণ—কালার সল্টের থেকে 2 থেকে 4 গুণ বেশি

ঠান্ডা জল—কাপড়ের ওজন থেকে 10 গুণ বেশি

কালার সল্ট সহজেই জলে দ্রবণীয়। যা অন্য কোনো রি-এজেন্টের সাহায্য ছাড়াই সরাসরি কাপড়ে দেওয়া যায়। একটা পাত্রে কালার সল্টের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে ঠান্ডা জল মেশাতে হবে। এরপর আর একটি গামলায় কাপড়ের ওজনের থেকে দশগুণ জল নিয়ে তার মধ্যে খাবার লবণ পরিমাণমতো মেশাতে হবে। শেষে উপরোক্ত মিশ্রণটি গামলায় ঢেলে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। সবশেষে মোম লাগানো কাপড়টা একবার কালার বেসের দ্রবণে এবং একবার কালার সল্টের দ্রবণে ডোবাতে হবে। বেশি গাঢ় রং চাইলে কয়েকবার দ্রবণ দুটিতে ডোবাতে হবে। বিভিন্ন রকম রং করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকবার মোম লাগাতে হবে ও ততবার রং করতে হবে। কাপড়ে রং ভালোভাবে ধরাতে হলে মোম লাগানো কাপড়টিকে অন্তত একঘণ্টা ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর জল থেকে কাপড় তুলে জলটা ঝরিয়ে রং করতে হবে। এক মিটার কাপড় রং করার জন্য salt colour-এর চার্ট নীচে দেওয়া হল

1. হালকা হলুদ (Lemon yellow)

(ক) AT—5 গ্রাম

(খ) Scarlet RC or yellow GC—10 গ্রাম

(গ) কস্টিক সোডা—1 চামচ

(ঘ) Monopol Soap— 1 চামচ

2. লাল (Red)

(ক) MN or AS—5 গ্রাম

(খ) Scarlet RC—10 গ্রাম

(গ) কস্টিক সোডা — 1 চামচ

(ঘ) Monopol Soap— 1 চামচ

3. মেরুন (Maroon)

(ক) MN or AS—5 গ্রাম

(খ) GP or Red Salt—10 গ্রাম

(গ) কস্টিক সোডা — 1 চামচ

(ঘ) Monopol Soap— 1 চামচ

4. কালো (Black)

(ক) MN or ON—5 গ্রাম

(খ) Black Salt—1 চামচ

(গ) কস্টিক সোডা — 1 চামচ

(ঘ) Monopol Soap— 1 চামচ

5. সোনালি হলুদ (Golden yellow)

(ক) AT—5 গ্রাম গ্রাম

(খ) GP Salt—10 গ্রাম

(গ) কস্টিক সোডা — 1 চামচ

(ঘ) Monopol Soap— 1 চামচ

6. কমলা (Orange)

(ক) AS—5 গ্রাম

(খ) Orange RC Salt—20 গ্রাম

(গ) কস্টিক সোডা — 1 চামচ

(ঘ) Monopol Soap— 1 চামচ

7. কালচে নীল (Blue Black)

(ক) MN or BN—5 গ্রাম

(খ) Blue Salt—10 গ্রাম

(গ) কস্টিক সোডা — 1 চামচ

(ঘ) Monopol Soap— 1 চামচ

৪. হালকা বাদামি (Light Brown)

(ক) AT—5 গ্রাম

(খ) Blue Salt—10 গ্রাম

(গ) কস্টিক সোডা — 1 চামচ

(ঘ) Monopol Soap— 1 চামচ

ফেব্রিক পেন্টিং

ফেব্রিক রঙ ব্যবহার করে সরাসরি তুলি দিয়ে কাপড় রঞ্জিত করাই হল ফেব্রিক পেন্টিং।

- **উপকরণ ঃ**

ক্লিপসহ ড্রইং বোর্ড, নকশ আঁকা ট্রেসিং পেপার, পেনসিল, কার্বন পেপার, ফেব্রিক রং, সরু তুলি কয়েকটি।

ফেব্রিক রং পোস্টার রঙের মতো শিশিতে কিনতে পাওয়া যায়। এটি জলে গুলে ব্যবহার করা যায়। কিছু রং জলের পরিবর্তে মিডিয়ামের সাথে গুলে ব্যবহৃত হয়। তখন ফেব্রিক রঙের সাথে মিডিয়ামও কিনে নিতে হয়। এছাড়া টিউবের মধ্যে ‘থ্রি-ডি’ নামে ফেব্রিক রং কিনতে পাওয়া যায়। এটি তৈরি রং, সরাসরি নোজলের সাহায্যে অর্থাৎ টিউবের মুখটি দিয়ে টিউব টিপে টিপে নকশার ওপর রং করা হয়। এতে থ্রি-ডাইমেনশন বা ত্রি-মাত্রিক ভাব আনা যায় বলে সংক্ষেপে একে ‘থ্রি-ডি’ রং বলে।

- **পদ্ধতি ঃ** যে-কোনো কাপড়েই কাজ হবে। পুরানো কাপড় হলে ভালো করে সাবান জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিয়ে ইসতিরি করে নিতে হয়। নতুন সুতির হলে আগের রাতে ১২ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রেখে পরে শুকিয়ে নিয়ে ইস্ত্রি করে নিতে হবে।

এরপর কাগজে নকশা এঁকে নিয়ে কার্বনের সাহায্যে কাপড়ের ওপর নকশা তুলে নিতে হবে।

এবার কাপড়টিকে শক্ত বোর্ডের ওপর বেশ টান করে ক্লিপের সাহায্যে আটকে নিতে হবে। জলে বা মিডিয়ামে রংটি ঘন করে গুলে সরু তুলির (০নং, ১ নং বা ২নং) সাহায্যে নকশার ওপর রং দিয়ে নকশাটি ভরিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে নকশায় একাধিক রং ব্যবহার করা যাবে। তবে, বিভিন্ন রঙের জন্য আলাদা আলাদা তুলি দরকার। ছায়ায় একটি রং শুকিয়ে নিয়ে তারপর আবার অন্য রং করতে হবে। রং করা কাপড় সবসময় ছায়ায় শুকোতে হবে।

“থ্রি-ডি” রং ব্যবহার করলে—প্রথমে সরু করে নকশার সীমারেখা ধরে রং দিতে হবে। এরপর মাঝের অংশে ঘন করে রং দিয়ে ভরাট করার পর শুকিয়ে গেলে প্রয়োজনমতো মাঝের অংশে আরও ঘন করে উচ্চতা বোঝাবার মতো রং দিতে হবে। ফেব্রিক প্রিন্ট সাধারণত কাপড়ের একদিকেই করা হয়।

লিনোকাট করে, স্টেনসিলের সাহায্যে বা বাহারি পাতার গায়ে রং দিয়েও প্রিন্ট করা যায়। একটি শক্ত কাগজ যেমন মোটা প্যাস্টেল পেপারে নকশা এঁকে নকশার অংশ সাবধানে কেটে বাদ দিয়ে তারপর কাপড়টির ওপর ওই কাগজটি চেপে ধরে রং করলে নকশাটি চিত্রিত হবে। এটি হল স্টেনসিলের মাধ্যমে কাজ। গ্রাফিক্স লিনোকাট পদ্ধতিতে বলা হয়েছে এই বিষয়ে।

ছাপাই চিত্র—গ্রাফিক্স

- **গ্রাফিক্স বা ছাপাই ছবি কী?**

নকশা বা ছবির একাধিক প্রতিচ্ছবি পাওয়ার জন্য নকশা বা চিত্ররূপ খোদাই করা কাঠ, লিনোসিট, তামা, জিংক ইত্যাদি প্লেটের ওপর রং দিয়ে কাগজে বা অন্য কোনো সারফেসে ছাপ তোলাই হল ছাপাই ছবি। আরও বিভিন্নভাবে ছাপাই ছবি করা সম্ভব।

পাথর বা ওই জাতীয় কোনো প্লেটে নকশা বা ছবি রং করে তার ওপর কাগজ চাপা দিয়ে চাপ দিয়ে লিথোগ্রাম পদ্ধতিতে ছবি ছাপা হয়।

কাঠের ওপর খোদাই করে (Relief Process) অথবা জিংক, তামার প্লেটে এচিং (অ্যাসিড দিয়ে ক্ষয় করানো) করে, অথবা ড্রাই পয়েন্ট, লিনোকাট—সব পদ্ধতিতেই সারফেস বা তলের ওপর রং বা কালি দিয়ে সরাসরি ছাপ তুললে তার উলটো ছাপ বা Impression আসবে। তাই কাঠ, তামা, জিংক, পাথর যে প্লেটের বা তলের ওপর কোনো ছবি আঁকা হবে সেটির রেখাচিত্র বা outline ট্রেসিং পেপারে এঁকে তারপরে ট্রেসিং পেপারটি উলটে নিয়ে প্লেটের গায়ে এঁকে নিতে হবে। এবার ছাপ তুললে সোজা স্বাভাবিক ছাপ পাওয়া যাবে ছবি বা নকশার। রাবার স্ট্যাম্প দেখলে বিষয়টি সহজে বোঝা যাবে।

- **ছাপাই চিত্রশিল্পের ইতিহাস বা পূর্বকথা ঃ**

গ্রিক শব্দ Graphia থেকে Graphics শব্দটি এলেও প্রাচীন মিশরের 'পিরামিডে'র প্ল্যান আঁকার জন্য লাইমস্টোন এবং কাঠের ছাপ ব্যবহার করা হয়েছে। খ্রিঃ পূঃ ৬০০-২৫০ শতকে গ্রিকেরা জ্যামিতিক আকার আকৃতি বোঝাতে, যেমন—বৃত্ত, পিথাগোরিয়ান থিওরেম ইত্যাদি বোঝাতে গ্রাফিক্সের সাহায্য নিয়েছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে Spain-এর Castillo cave-এ বাম হাতের ছাপ দিয়ে বাইসনের চিত্র আঁকা হয়েছে। ছাপ দিয়ে চিত্র রচনার ধারণা হয়ত তার থেকেই আসে।

১০৫ খ্রিস্টাব্দে সম্ভবত চিনে কাগজ আবিষ্কারের পর চিনদেশে কাগজের ওপর কাঠ-খোদাই করে ছাপাইয়ের কাজ শুরু হয়। পাশ্চাত্যেও সেসময় কাঠ খোদাই, এন্‌গ্রেভিং, এচিং-এর কাজ শুরু হয়। ৫ম শতকে মিশরে ফেব্রিক প্রিন্টের কাজও দেখা যায়। ১৫ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ছাপাই কাজ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলে। কত কম খরচে কত বেশি এবং যথাযথ প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় এটাই ছিল লক্ষ্য। বর্তমানে কম্পিউটারের সাহায্যে অতি উন্নত মানের ছাপাই ছবি সহজেই পাওয়া সম্ভব।

- **পাশ্চাত্যে ছাপাই ছবির চর্চা ঃ**

ছাপাই চিত্রশিল্পের ইতিহাস অতি প্রাচীন হলেও সাধারণভাবে ছাপাই শিল্পের প্রসার ঘটতে বহু শতাব্দী পার হয়ে গেছে। ১৬০০ শতকের পর ইউরোপে—রেমব্রান্ট, ডুরার প্রভৃতি প্রখ্যাত শিল্পীরা এই ছাপাই চিত্রশিল্প করেছেন। প্রথমদিকে কাঠের পাটা, পাথর খোদাই করে তাতে বিভিন্ন রং দিয়ে তার পরে কাগজে তার ছাপ তোলা হয়েছে। কখনও বা একাধিক রঙের জন্য একাধিক খোদাই করা কাঠ, পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। খোদাই না করে কাঠ পাথরের গায়ে চিত্র এঁকেও তার ছাপ তুলে ছাপাই ছবি হয়েছে। অধিক সংখ্যক ছবি একসাথে ছাপা হত না, ছাপাই ছবির কিছু আবার নষ্টও হত। এরপর ছাপাইয়ের কাজে ধাতুর ব্যবহারও শুরু হল। ক্রমশ বিভিন্ন পদ্ধতিও শুরু হল ছাপাই শিল্পের কাজে। যেমন—(১) এচিং—তামার প্লেটে অ্যাসিড দিয়ে খোদাই করে ছাপাই হল।

(২) ড্রাই পয়েন্ট—তামার প্লেটে খোদাই করার জন্য বিশেষ ছুঁচের সাহায্যে খোদাই করে বিশেষ ধরনের ছবি ছাপা হল।

(৩) লিথোগ্রাফ—পাথরের ওপর খোদাই করে অথবা পাথরের গায়ে রং দিয়ে ছবি ছাপাই হল।

(৪) লিনোকাট—লিনোনিয়াম শিটে খোদাই করে অথবা যে অংশে রং দেওয়া হবে না তা সামান্য নীচে করে কেটে (যে পদ্ধতিতে রাবার স্ট্যাম্প তৈরি হয়) ছবি ছাপা হল।

(৫) অফসেট প্রিন্টিং-এর মাধ্যমেও সুন্দর ছবি ছাপা হয়েছে।

- **পটভূমি ঃ**

আমাদের দেশে ছাপাই শিল্পের শুরু বলা যায় ১৮০০ শতকের শেষে। সে সময় ইংরেজ কারিগরদের কাছে কাজ শিখে এদেশের মানুষও ছাপাই কাজে দক্ষ হয়ে ওঠেন। বই ছাপার পাশাপাশি ছবি ছাপার প্রেসও গড়ে ওঠে এবং প্রধানত ধাতুপাত্রে এনগ্রেভিং-এর সাহয্যে ছবি ছাপাই হতে শুরু হয়। ১৯ শতকের মাঝামাঝি প্রাচীন কলকাতার বটতলা অঞ্চলে (বর্তমান চিৎপুর অঞ্চল) বিভিন্ন বই ছাপার সঙ্গে চিত্র সম্বলিত বই করার জন্য ছবিও ছাপা হতে লাগল। বটতলায় ছাপা চিত্র সম্বলিত পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, পাঁচালি, গল্প, উপন্যাস এবং বর্ণপরিচয়, ধারাপাত ইত্যাদি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ছাপাই শিল্প প্রসারে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শিল্পী নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, মুকুল দে, রমেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী। পরবর্তীকালে হরেন দাশ, সোমনাথ হোড় প্রমুখ অনেক শিল্পীই নানান পদ্ধতিতে এই শিল্পের প্রসার ঘটান। কলকাতার আর্ট কলেজে এই শিক্ষার

বিশেষ ধারার জন্য লিথোগ্রাফি ছাপার কাজ অনেকটাই প্রসার লাভ করে। কেরলের শিল্পী রাজা রবিবর্মা তাঁর আঁকা পৌরাণিক ছবিগুলি যেগুলি তেলরঙে আঁকা সেগুলি 'ওলিওগ্রাফ' (ধাতুতে খোদাই) পদ্ধতিতে ছাপেন। বোম্বাইতে নিজস্ব একটি ছাপাখানাও করেন। বর্তমানে প্রেসে বা আধুনিক পদ্ধতিতে ছাপা ছবি, নকশা, ইলাসট্রেশন ইত্যাদি ছাপাই ছবির উদাহরণ। Computer-এ Animated cartoon ছবি, অন্যান্য ছবি, ডিজাইন ছাপা হচ্ছে।

- **বিশেষত্ব ঃ** ছাপাই ছবির বিশেষত্ব হল—শিল্পীর আঁকা ছবির প্রতিলিপি অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায় প্রায় মূল ছবিরই মতো. ছাপাই শিল্পের কল্যাণে আজ আমরা বহু দুর্মূল্য এবং দুর্লভ ছবি সহজেই পেতে পারি। বর্তমানে 'কম্পিউটারে'ও রঙিন ছাপাই ছবি পাচ্ছি। এখন আরও উন্নততর পদ্ধতিতে পূর্বাপেক্ষা আরও সহজে খুব উচ্চমানের রঙিন ছবি ছাপা হচ্ছে।

ছাপাখানার কল্যাণে কোনো মুদ্রিত বিষয়বস্তু চিত্রসহযোগে ছেপে ব্যাখ্যা করা হয়। বিষয়টি বুঝতে অনেক সুবিধা হয়। তাই এটির প্রচলন এখন খুবই বেশি। বিজ্ঞাপনের জগতে এটি অপরিহার্য শিল্প (ইলাসট্রেশন)।

- **বিদ্যালয়ের শিশুদের প্রাথমিকভাবে ছাপাই ছবির ধারণা দেওয়ার জন্য** লম্বা লম্বা বড়ো সুতোতে রং লাগিয়ে কাগজের ওপর সুতো পাক দিয়ে দিয়ে বসিয়ে ওপরে অন্য একটি কাগজ হাতের তালুর চাপ দিয়ে সুতোটি টেনে বার করে নিলে সুন্দর ছাপাই ছবি হবে। থার্মোকলে বা লিনোনিয়াম শিটে বা রাবার সোলে, লিনোকাট করে (যে ভাবে রাবার স্ট্যাম্প তৈরি হয় তা দিয়ে ছাপ তোলা যায়। স্টেনসিল কাট করেও ছবি হবে। আবার ধরাযাক একটি বাহারি পাতা কাগজের ওপর চেপে ধরে বা হালকা করে আটকে যদি রং দিয়ে স্প্রে করা যায় (পুরানো টুথব্রাশের সাহায্যে) তাহলেও সুন্দর ছাপাই ছবি হবে। ঢেঁড়শের বোঁটা দিয়েও ছাপা তোলা যায়। এ সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করা হয়েছে।

ছাপাই ছবি
(Graphics)

- **উপকরণ ঃ** বড়ো সুতো, বিভিন্ন রং, পুরানো টুথ ব্রাশ, রাবার বা লিনোসিট, কাগজ, ব্লেড বা ছুরি, পলিথিন প্যাকেট।

বিভিন্ন পদ্ধতিতেই অনেক সহজে সুন্দর ছাপাই ছবি করা যায় এবং তার সাহায্যে গ্রিটিংস কার্ড বা শুভেচ্ছাপত্র, আমন্ত্রণপত্র হয়।

- **সুতোর টান দিয়ে ঃ** একটি ২ ফুট লম্বা সরু সুতোর কিছুটা অংশ লাল, কিছুট অংশ নীল, কিছুটা সবুজ, কিছুটা কালো, কিছুটা হলুদ রং করা হল। হাতে একটি পলিথিন প্যাকেট গ্লাভসের মতো আটকে নিয়ে দুটি আঙুল দিয়ে ঘষে রং করা হবে। এরপর একটি কাগজের ওপর সুতোটি পাক দিয়ে দিয়ে বসাতে হবে। সুতোর দুটি মুখ কাগজের বাইরে ৩″/৪″ মতো বেরিয়ে থাকবে। সুতোর ওপর আর একটি কাগজ চাপা দিতে হবে। বাঁ হাতের তালুতে কাগজটি চেপে ধরে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের চাপে সুতোর একটি প্রান্ত চেপে ধরে ডানহাত দিয়ে সুতোর অপর প্রান্তটি টেনে আস্তে আস্তে পুরো সুতোটি বার করে আনতে হবে। দুটি কাগজেই সুন্দর নকশা ফুটে উঠবে।

রাবার সোল, লিনোসিট-এর ওপর নকশা এঁকে অথবা একটি ঘর, একটি উড়ন্ত পাখি, একটি গাছ ইত্যাদি আলাদা শিটে এঁকে যেভাবে মাটির রিলিফ কাজ কেটে করা হয় অর্থাৎ যেভাবে রাবার স্ট্যাম্প হয় সেইভাবে নকশা বা ছবির পাশ থেকে কিছুটা কেটে নামিয়ে দিতে হবে। এরপর কাগজে জায়গামতো পরপর দুটি ঘরের ছাপ দেওয়া ছাপাই ছবি হল। থার্মোকলের ওপরেও একইভাবে কাজ হবে রংয়ের ছাপে।

- **স্টেনসিল ছাপ ঃ** মোটা কাগজে নকশা এঁকে ব্লেড বা ছুরি দিয়ে নকশাটি কেটে বার করে নিয়ে ওই কাগজটি অন্য একটি কাগজের ওপর রেখে পুরানো টুথব্রাশে লাল রং মাখিয়ে বুড়ো আঙুলের চাপে স্প্রে করলে কাটার ভেতরের অংশে রং হল। একইভাবে এরপর হলুদ, নীল রং হল। এবার নকশা কাটা কাগজটি তুলে নিলে দেখা যাবে সুন্দর স্প্রে প্রিন্টিং হয়েছে। একে বলে স্টেনসিলের সাহায্যে ছাপাই ছবি। এটি স্প্রে না করে তুলি দিয়েও হবে যদি একটা রঙে হয়। আবার, একটি বট পাতা, অশ্বত্থ পাতা কাগজের ওপর চেপে ধরে একইভাবে স্প্রে করলে দেখা যাবে পাতার অংশ সাদা আর বাকি অংশ সুন্দর চিত্রিত। আলুর ওপর

কেটেও ছাপ তোলা যায়। বেগুনের বোঁটা, ঢ্যাঁড়শের বোঁটা, বুড়ো আঙুলের রং দিয়েও ছাপা হবে। বুড়ো আঙুলের ছাপের পর সরু তুলি বা পেন দিয়ে একটু রেখা টেনে খরগোশ, বেড়াল, মানুষের ছাপাই ছবি হবে। ঢ্যাঁড়শের বোঁটায় লাল পোস্টার রং দিয়ে সাদা কাগজের ওপর গুচ্ছ ফুলের মতো সাজিয়ে ছাপ তোলা হল। পাতার ছাপ দিয়ে অথবা হলুদ, সবুজ, কালো রংয়ের সাহায্যে সরু তুলি দিয়ে ডাল, পাতা করা হল। ছবিটি দেখলে বুঝতে সুবিধে হবে। পাতার উলটো পিঠে রং দিয়ে ছাপা হবে।

- **Wood cut ঃ**

- **উপকরণ ঃ** নরম কাঠের ব্লক, সরু ছুরি, পেনসিল, কার্বন পেপার, ট্রেসিং পেপার, ছাপার কালি, মোটা রং, মোটা তুলি, সাদা কাগজ, ন্যাকড়া, বেলন।

কাঠ খোদাই করে ছাপাই ছবি করা ছাপাই ছবির এক বিশেষ পদ্ধতি—কাগজের ওপর প্রথমে পরিষ্কার করে ছবিটি এঁকে নেওয়া হয়। এবার একটি নরম কাঠের ব্লকের ওপর (গামার বা ওই জাতীয় কাঠ) ছবি আঁকা ট্রেসিং পেপারটি উলটো রাখা হয়। এতে সোজা ছাপ পড়বে। তার নীচে থাকে কার্বন পেপার। কাঠের ব্লকের ওপর ছবির ছাপটি তুলে তল থেকে নামিয়ে দিতে হবে। এইভাবে কাঠের ব্লকের উপরে দুটি তলের সৃষ্টি হল। ছবিতে সরু, মোটা রেখা থাকলে রেখার অংশ ছবির রেখার মতো করে খোদাই করে নিলে সাদা রেখার ছাপ পড়বে। অন্যভাবে রেখার ধারের অংশ খোদাই করলে ছাপাই রঙে রেখা ফুটে উঠবে। প্রেসের ছাপার কালিতেও ছাপাই হবে। আবার ঘন অস্বচ্ছ রঙেও ছাপ তোলা যাবে। কাঠের ব্লকের ওপরের তলে কালি বা রং-তুলি দিয়ে সাবধানে সমান করে লাগাতে হবে। রঙের আস্তরণ যেন সর্বত্র সমান হয়। এরপর ব্লকের মাপে ভালো কার্টিজ পেপার ব্লকটির ওপর একটি কোণ ধরে সাবধানে সমস্তটা বসিয়ে, তার ওপর রুটি বেলার কাঠের বেলনার সাহায্যে চাপ দিয়ে রোল করে দিতে হবে। এবার আস্তে আস্তে কাগজটি তুলে নিয়ে ভালো করে শুকিয়ে নিতে হবে। দেখা যাবে সুন্দর ছাপাই ছবি তৈরি হয়েছে। একাধিক রঙে করলে একাধিক ব্লক খোদাই করে নিতে হবে। অর্থাৎ যে রঙের জন্য ব্লকটি নেওয়া হবে, সেই ব্লকটিতে সেই রঙের অংশটুকু ছাড়া বাকি অংশ কেটে নামিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ব্লক সমান মাপের হবে এবং কাগজটি ব্লকের মাপে হবে। তাহলে একটি রঙের পাশে অপর রং ঠিক জায়গামতো ছাপ তুলবে। এইভাবে একাধিক ছাপাই ছবি পাওয়া যাবে। একটি ব্লক থেকেই অন্যভাবে একাধিক রঙের ছাপ দিয়ে ছবি হবে। ব্লকটির ওপরের পারফেসে যেখানে যেমন রং ছবিতে আছে, সেইমতো রং দেওয়া হবে। এবারে কাগজে ছাপ তুললে একাধিক রঙের উঠবে।

কাঠের ব্লকে ছাপ তুলে সুতির ছাপাই শাড়ি হয় যা বাজারে বেশ প্রচলিত।

- **লিনোকাট (Lino Cut) : খোদাই করে ছাপাই ছবি ঃ**

- **উপকরণ ঃ** লিনোনিয়াম শীট, শীট কাটার জন্য সরু ছুরি, পেনসিল, কার্বন ও ট্রেসিং পেপার, ছাপার কালি বা মোটা রং, দুটি রোলার, মোটা তুলি, সাদা কাগজ, ন্যাকড়া ইত্যাদি।

- **পদ্ধতি ঃ** ট্রেসিং পেপারে আঁকা ছবি লিনোনিয়াম শীটের ওপর উলটো করে বসিয়ে তলায় কার্বন পেপার রেখে তার ছাপ তোলা হবে। কালিতে ছাপা হলে সেটির সোজা ছাপ উঠবে (যেমন রাবার স্ট্যাম্প হয়)। ছাপা ছবির যেসব অংশ কালিতে বা রঙে ছাপা হবে সেগুলি বাদ দিয়ে বাকি অংশ ছুরি দিয়ে সাবধানে কিছুটা গর্ত করে কেটে বাদ দিতে হবে।

এভাবে শীটের ওপর দুটি তল হবে। এবার প্রেসের ছাপার কালি (তেল মাধ্যমযুক্ত) বা মোটা জল রং বা তেল রং রোলারের গায়ে মাখিয়ে সেটি শীটের ওপর রোল করে নিলে উঁচু অংশে রং ধরবে। মোটা তুলি দিয়েও সমান করে রং লাগানো যায়। রং যেন কম বেশি না হয়। এরপর শীটের ওপর সাদা কাগজ সাবধানে রেখে রোলার দিয়ে বা রুটি বেলার কাঠের বেলন দিয়ে সাবধানে রোল করে দিতে হবে। কাগজটি সাবধানে তুললে দেখা যাবে সুন্দর ছাপা ছবি হয়েছে। বহুবর্ণে করলে যেখানে যেমন রং দরকার তেমনভাবে শীটে রং দিতে হবে। তবে সাধারণত কালো রঙেই এই ছবি ছাপা হয়। অর্থাৎ Mono Colour Print। আচার্য নন্দলাল বসুর আঁকা ‘‘সহজপাঠের’’ ছবি এই লিনোকাট পদ্ধতিতে ছাপা।

- **আলুর ছাপ ঃ**

- **উপকরণ ঃ** বড়ো শক্ত আলু, ছুরি, রং, তুলি, প্যালেট, সাদা কাগজ।

• **পদ্ধতি ঃ** আলুটিকে মাঝামাঝি কেটে তার অর্ধাংশে ছুরি দিয়ে সাবধানে নক্সাটি সামান্য চাপ দিয়ে কাটা হবে। প্রথমে পেনসিল দিয়ে খুঁদে নেওয়া যায়। যে অংশে ছাপ পড়বে না সেই অংশ গর্ত করেকেটে বাদ দিতে হবে। এবার আলুর উঁচু অংশে তুলি দিয়ে রং লাগাতে হবে। পোস্টার রং-এ ভালো হবে। সাদা কাগজে এবার আলুর ছাপ তোলা হবে। এভাবে সুন্দর গ্রিটিংস কার্ড হবে।

Mono Print ঃ যে কোনো শক্ত মসৃণ তলের উপর রং দিয়ে একবার মাত্র ছাপ তোলা হয়।

ছোটো মসৃণ কাঁচের ওপর বা অন্য কোনো ওই ধরনের মসৃণ তলের ওপর মোটা তুলি দিয়ে গাঢ় করে পছন্দমতো রং লাগাতে হবে। এরপর একটি সরু কাঠি দিয়ে ইচ্ছামতো ড্রইং করে নিতে হবে। কাঠির মুখে রং উঠে এসে রং-এর মাঝে রেখার ড্রইং হবে। এবার একটি কাগজ তার ওপর সাবধানে বসিয়ে সমানভাবে চাপ দিতে হবে, যেন নড়ে না যায়। এরপর একটা কোণ ধরে আস্তে আস্তে কাগজটি তুলে নিলে দেখা যাবে খুব সুন্দর ছাপাই ছবি হয়েছে। এভাবে একবার মাত্র ছাপ তোলা যায় বলে একে Mono Print বলে।

অন্যভাবে Mono Print ঃ ছোটো কাঁচ বা ওইরূপ কোনো মসৃণ তলের ওপর রং তুলি দিয়ে মোটা লাইনে ছবি এঁকে সাথে সাথে (যাতে শুকিয়ে না যায়) ওই ছবির ওপর একটি কাগজ বসিয়ে সবদিকে সমান চাপ দিতে হবে। সাবধানে তুলে নিলে সুন্দর ছাপাই ছবি হবে।

ক্যালিগ্রাফি

• **লেখাঙ্কন বা ক্যালিগ্রাফি (Calligraphy) (নান্দনিক লিখন শৈলী) ঃ**

সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হাতের লেখাই হল লেখাঙ্কন বা ক্যালিগ্রাফি। ‘লেখাঙ্কন’ কথাটি বলার তাৎপর্য হল চিনদেশে ও পরে জাপানে কালো কালি এবং তুলির সাহায্যেই প্রথম শৈল্পিক লিপির লিখন শুরু হয়; অর্থাৎ সুন্দর লেখ্য চিত্ররূপ।

ক্যালিগ্রাফি শব্দ মূলত গ্রিক শব্দজাত। অভিধান সূত্রে দেখা যাচ্ছে—Kallos অর্থে Beauty বা সৌন্দর্য এবং Graphein অর্থে to write বা লেখা। এককথায় সুন্দর এবং দৃষ্টিনন্দনরূপে লেখা।

আলংকারিক বা শৈল্পিক লিখন ঃ বিভিন্ন অক্ষরকে আলংকারিক রূপবিশিষ্ট করে অথবা আলোছায়ার সমন্বয়ে ত্রি-মাত্রিক রূপ দিয়ে যখন লেখাংকন করা হয় তখন তাকে আলংকারিক লেখা বা শৈল্পিক লিখন বলে। সরু বা মাঝারি তুলি এবং কালো কালি বা অন্য রঙের সাহায্যে এই আলংকারিক লেখা হয়। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে, পোস্টারে অথবা বিভিন্ন বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আলংকারিক লেখার ব্যবহার হয়। হাতে করে তুলির সাহায্যে ত্রিমাত্রিক লেখা যেমন হয়, উন্নত ধরনের ছাপার কৌশলেও এরূপ আলঙ্কারিক লেখা হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়—আগেকার পুঁথি লেখার মধ্যেও চিত্রিত সুন্দর লেখার সন্ধান পাওয়া যায়। ছাপখানা আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত কালো কালি ও পাখির পালক বা সরের কলম দিয়ে যাবতীয় লেখালেখির কাজ হত এবং সেগুলির শিল্পনৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় আজও সেই অপূর্ব নিদর্শনগুলি দেখা যায়।

• **সূচনা ঃ** অরণ্যচারী মানুষের শিকার করা বন্য জন্তুই ছিল প্রধান খাদ্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ সে সময় পাহাড়ের গায়ে এঁকেছে বিভিন্ন জীবজন্তু এবং শিকারের ছবি। এই ছবির মাধ্যমেই তারা মনের ভাব ব্যক্ত করেছে। পরবর্তীকালে এই সমস্ত ছবির একান্ত ইঙ্গিতবাহী বা অর্থবহ অংশটুকুই আঁকা হয়েছে ছবির বহুলাংশ বাদ দিয়ে। যেমন—প্রথমে আঁকা হয়েছে শিংওয়ালা জন্তুর বর্শাবিদ্ধ ছবি। দীর্ঘকাল পরে ইংরেজি ‘U’ (ইউ)-এর মতো এঁকে মধ্যিখানে একটি রেখা আঁকা হয়েছে—ɣ এইরূপ। অর্থাৎ দুটি শিংয়ের মাঝে একটি বর্শা বিদ্ধ হয়েছে। দেওয়া হল শিকারের ইঙ্গিত। এখান থেকেই হল লিপির সূচনা। তারপরে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতে শুধুমাত্র অতিসংক্ষিপ্ত খুব ছোটো ছোটো রেখাচিহ্ন ব্যবহৃত হল। মুখের ভাষায় ভাবপ্রকাশে ব্যবহৃত শব্দ, অক্ষরের সর্বজনীন লেখ্য রূপ পেতে এল বিভিন্ন লিপি। তুলি দিয়েই এই সমস্ত কাজের শুরু। আজও চিন, জাপানে তুলির সাহায্যে লিপির লিখন বা ক্যালিগ্রাফি কোথাও কোথাও প্রচলিত। নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এসেছে ব্রাহ্মীলিপি, খরোষ্ঠী লিপি, দেবনাগরী লিপি, রোমান লিপি। সম্রাট অশোকের সময় পাহাড়ের গায়ে খোদিত ব্রাহ্মীলিপির নিদর্শন পাওয়া যায়। তখন ব্রাহ্মীলিপিতে লেখাপড়ার কাজ হত। ব্রাহ্মীলিপির সামান্য নিদর্শন দেওয়া হয়েছে। কাল অতিক্রম করে এগুলির থেকেই আবার এসেছে আরবি, উর্দু, হিন্দি, বাংলা, ওড়িয়া, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষার বহুবিধ লিপি।

অক্ষর বিন্যাসেও ছোটো-বড়ো অক্ষর, আলংকারিক অক্ষর ইত্যাদি অর্থবহ হয়ে এসেছে। এছাড়াও গাণিতিক ধারণার সাথে তার লেখ্য রূপও এসেছে। শ্রুতির যুগ পেরিয়ে লেখ্য রূপ পেতে লিপির আবির্ভাব যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে দিল।

• **বিভিন্ন ধরনের লেখা ঃ** দেবনাগরী, বাংলা, ওড়িয়া, ইংরেজি লিপি লেখা শুরু হয় বাঁদিক থেকে এবং ক্রমশ তা ডানদিকে যায়। আরবি কিন্তু ডানদিক থেকে বাঁদিকে লেখা হয়। সম্পূর্ণ বাক্য শেষে বাংলায় দেওয়া হয় দাঁড়ি চিহ্ন, ইংরেজিতে ফুলস্টপ বা ফুটকি। বাক্যের মধ্যে খুবই স্বল্প বিরাম, অল্প বিরাম বোঝাতে কমা, সেমিকোলন, কোলন ইত্যাদি যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়, যেমন (, ; ঃ)। এছাড়া জিজ্ঞাসা চিহ্ন (?), আশ্চর্যবোধক চিহ্ন (!) ইত্যাদি যতি চিহ্ন ইংরেজি বাংলায় একইভাবে ব্যবহৃত হয়। বাংলা অক্ষরমালায় কিছু বর্ণ পূর্ণমাত্রাযুক্ত, কিছু অর্ধমাত্রাযুক্ত, কয়েকটি মাত্রাহীন বর্ণ রয়েছে।

সুন্দর অক্ষর লিখন শৈলী ঃ বিভিন্ন ধরনের হস্তলিপি অর্থাৎ ক্যালিগ্রাফি—বাংলা শব্দমালা লেখার সময় বর্ণের মাত্রা, মাত্রাহীন বর্ণের দিকে নজর দিয়ে একই ছন্দে (অর্থাৎ কোনোটি সোজা কোনোটি ডাঁয়ে-বাঁয়ে হেলানো অথবা ছোটো-বড়ো এরূপ না করে) প্রতিটি বর্ণের এবং শব্দের মধ্যে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ফাঁক রেখে দুটি সমান্তরাল রেখার মধ্যবর্তী স্থানে সমান মাপে এবং অক্ষরের গড়ন ঠিক রেখে সুস্পষ্ট, সুখপাঠ্য ও সুন্দর হস্তাক্ষর রচনা করে লেখা হবে।

• **দ্রুত ও টানা লেখা ঃ** বাংলা লেখার পদ্ধতি হল 'ক্লক ওয়াইজ' পদ্ধতি অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা ডানদিক দিয়ে যেমন ঘোরে () ইংরেজি ছোটো অক্ষর লেখায় হবে বিপরীত পদ্ধতি। কিন্তু অন্য নিয়ম সব একই। প্রথমে পেনসিলের সাহায্যে, () পরে কালি-কলমে লেখা অভ্যাস করতে হবে। আলংকারিক অক্ষর, ইংরেজি বড়ো অক্ষর লিখতে সরু তুলি দিয়ে কমবেশি চাপ দিয়ে লিখলে সুন্দর লেখা হবে। সুন্দর অথচ দ্রুত লিখনের জন্য সামান্য ডানদিকে হেলিয়ে একটি অক্ষরের সাথে পরের অক্ষরটির প্রায় কলম না তুলে সংযোগ ঘটিয়ে লিখলে ভালো হবে। তবে এইভাবে লিখতে অবশ্যই নজর রাখতে হবে যাতে অক্ষরের গড়ন আকার আকৃতির কোনোভাবে না বিকৃতি ঘটে। ছাপার অক্ষরে লিখলে গোল ধরনের বর্ণের ওপর-নীচ অংশ সামান্য বড়ো হয়।

ইংরেজি বাক্য লেখার শুরুতে প্রথম অক্ষরটি 'ক্যাপিটাল লেটার' বা বড়ো হাতের অক্ষর হবে। তারপর সব ছোটো হাতের অক্ষর বা Small Letter হবে। বাংলা লেখায় এরূপ কোনো ব্যাপার নেই। এছাড়া আলো-ছায়া সংযোগে ত্রিমাত্রিক ও টাইপ লেখা হয়। বিভিন্ন কৌশলে শৈল্পিক হয়। সেই হিসাবে ক্যালিগ্রাফিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১। যন্ত্র প্রযুক্তির সাহায্যে Computer-এ বা অন্য মুদ্রণযন্ত্রে ত্রিমাত্রিক ও আলংকারিক শৈল্পিক লিখন হয়। আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এর যথেষ্ট ব্যবহার।

২। সাধারণ কলমের সাহায্যে অসাধারণ শৈল্পিক লিখন হয়। প্রসঙ্গত ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে তাঁর হাতের লেখা থেকে।

৩। কলমের বিশেষ ধরনের নিবের সাহায্যে (সরু, চ্যাপ্টা/চওড়া) কালি দিয়ে সরু মোটা করে শৈল্পিক লিখন হয়।

৪। তুলির সাহায্যে সরু-মোটা করে এক বা একাধিক রঙে ত্রৈমাত্রিক ও আলংকারিক লিখন হয়। কার্ড, পোস্টার, বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এর বহুল ব্যবহার। লেখায় বর্ণের space, style, size যেন যথোপযুক্ত হয়। ত, অ, বর্ণগুলি লক্ষণীয়।

Calligraphy/ Prints

বিভিন্ন ধরনের আলংকারিক ছাপার অক্ষর

ছাপাখানার মুদ্রণশিল্প বা Typography-তেও নানান ছাঁদে, দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক আলংকারিক type ব্যবহার করে সুন্দর ছাপা হয়। সেগুলি দেখে তুলির সাহায্যে নকল করলেও বিভিন্ন ধরনের লেখা রপ্ত হবে।

শিশুদের সুন্দর হাতে লেখা করানোর জন্য—(বাংলা ও ইংরেজি) স্লেটে বড়ো করে অক্ষর লেখার জন্য দুটি সমান্তরাল রেখা টেনে দিতে হবে। বাংলা অক্ষর হলে প্রতিটি অক্ষরে মাত্রা, অর্ধমাত্রা বা মাত্রাহীন যেটির যেরূপ হবে সেইমতো এবং অক্ষর মধ্যবর্তী স্থান ঠিক রেখে লিখে দেওয়া হবে। শিশুরা তার ওপর লিখবে। কিছুটা রপ্ত হলে তারা নিজেরা লেখার অভ্যাস করবে। ইংরেজি বর্ণ লেখার ক্ষেত্রে একইভাবে 'ক্যাপিটাল' ও ওপরে 'স্মল' লেটার লেখার অভ্যাস করাতে হবে। উঁচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের কাগজে পেনসিলের সাহায্যে টানা হাতের লেখা অভ্যাস করতে হবে—অক্ষরের ছন্দ, গড়ন, আকার আকৃতি ঠিক রেখে। কালি দিয়ে লেখার সময় সরের কলম বা নিবের কলম ব্যবহার করা হবে। ডট পেন ব্যবহার করা হবে না। মনে রাখতে হবে যথাযথ সুন্দর হাতের লেখাই হল আদর্শ লিপি।

উপসংহার

মানব সভ্যতার উন্মেষ ঘটার সাথে সাথে শিশুশিক্ষা থেকে উচ্চতর শিক্ষা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যক্তি তথা সমাজ-দেশ, বিশ্বজগৎকে জীবনমুখী করে তোলার একমাত্র প্রধান পথ এবং সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ ও সুন্দরের আরাধনা-ই হচ্ছে মূল বিষয়।

জীবনকে সজীব ও প্রাণবন্ত ও আদর্শায়িত করার প্রয়াস অত্যন্ত জরুরি। এর জন্য কর্ম নির্ধারণ হয় ব্যক্তির বাহ্যিক জীবনের জন্য। অপরটি হল সুন্দরের আরাধনা করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় জলের কলসী — এর প্রয়োজন পানীয় জলের জন্য যা দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য। কিন্তু কলসীর গায়ে নান্দনিক দৃষ্টি ভঙ্গির প্রতিফলনের ফলে কলসীর গায়ে নকশা, ফুল-পাতা ইত্যাদি দিয়ে অলঙ্করণ করার ফলে ওই জলের আধারটি সুন্দর হয়ে উঠল, যেন জীবনের প্রতিটি ছন্দে ছন্দে সুন্দরের স্থান করে নিল। ব্যাবহারিক জীবনের সাথে সাথে জীবনকে প্রাণবন্ত করে তোলাই হচ্ছে নান্দনিকতার আর এক দিক। এই নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গীর উৎস হচ্ছে — শিল্পবোধ, শিল্পকর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ভালো লাগা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনার মাধ্যমে আয়ত্ব ও আত্মস্থ করা। এই শিল্প বোধ জাগ্রত হয় শৈশবকাল থেকে। সে কারণে নান্দনিক দিকটির উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ে শিল্প সাধনা বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। যা সবকিছুকে সুন্দর পবিত্র করে তোলে। সভ্যতার প্রতিটি সোপানে শিল্পের স্পর্শ, অনুভূতি বিরাজ করছে। এই শিল্প চেতনাকে আদর্শায়িত করাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য। দৈনন্দিন জীবনের কর্ম, উৎসব, অনুষ্ঠান, পূজাপার্বন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, গৃহ পরিবেশকে সুন্দর করে তোলে।

এই কারণে Visual art ও Performing art-এর যুগল মিলনই সুন্দর থেকে সুন্দরতর করে তুলেছে। রং-রেখা ছন্দময় হয়েছে, গতিময় হয়েছে।

আবার আন্তর্জাতিক শিশুশিক্ষা শুরু হয়েছে শিল্পের মাধ্যমে এবং একটি নীতি তৈরি হয়েছে। তার মূল শ্লোগান "Education through art" — এখানে শিল্পকলার মাধ্যমে শিক্ষাদান শুরু চিত্রের মাধ্যমে, সঙ্গীত, অভিনয়, হাতের কাজ বা খেলনা প্রভৃতি সামগ্রী শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

চিত্র ভাষা

শব্দের অর্থ পরিবর্তন, অর্থের বিস্তার ইত্যাদি নানা কারণে ঘটে থাকে। বহুক্ষেত্রেই শব্দের মূল উদ্দেশ্য লুপ্ত হয়ে পরিবর্তিত বা বিস্তৃত অর্থই প্রতিষ্ঠা পায় ও প্রচলিত হয়। শিল্প প্রসঙ্গে মাস্টার পিস্ শব্দটির মূল অর্থের পরিবর্তন ও বিস্তার এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। মাস্টার পিস্ শব্দটির ইতিহাসানুগ বাংলা অর্থ গুরুদক্ষিণা।

মনুমেন্টাল কোয়ালিটি বা মনুমেন্টালিটি, চিত্র বা মূর্তিকলার ব্যাখ্যায় ইমারতের বিশেষ গুণ বোঝায়। আর্কিটেক্টনিক — চিত্রে ও মূর্তিকলার স্থাপত্য গুণ বোঝায়।

ইমারতকে শুদ্ধতম শিল্প একারণে বলা হয় যে ইমারত কোনো সাদৃশ্য তৈরী করে না। উল্লম্ব, অনুভূমিক, কর্ণ ও বঙ্কিম — এই চারটি মূল গতির ছন্দ সুষমায় ইমারত গড়ে ওঠে। এই গতিগুলির ব্যবহার টানাপোড়েনজাত মজবুতিসহ স্থায়ী হলে একটি ইমারত আমাদের চোখে সম্পূর্ণতা পায়। ইমারত যেমন নির্দিষ্ট এক খণ্ড জমির উপর বিভিন্ন গতির ছন্দ সুষমায় সম্পূর্ণ ও দৃঢ় বলে প্রতিভাত হয়, চিত্রপটের নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে উত্থাপিত রূপবন্ধে যদি সেই সম্পূর্ণতা ও স্থায়িত্ব লক্ষিত হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত চিত্রটির নির্মাণকে আর্কিটেক্টনিক বলা হয়।

ইংরাজি ক্যালিগ্রাফিক শব্দের বাংলা পরিভাষা হিসাবে লেখাঙ্কন শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গ্রিক ক্যালোস্ (সুন্দর) ও গ্রাফেইন (লেখা) শব্দের অন্বিত রূপ ক্যালিগ্রাফিয়া থেকে ইংরাজী ক্যালিগ্রাফি। ড্রইং-এর ক্ষেত্রে হাতের লেখার মতো কলমে টানা স্বচ্ছন্দ, ভারমুক্ত ও স্ফূর্ত রেখার পূর্ণ হিসাবে এবং চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে তুলিতে টানা স্বচ্ছন্দ, ভাবমুক্ত ও স্ফূর্ত রেখার গুণ হিসাবে ক্যালিগ্রাফিক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। রূপবন্ধ বা কর্ম-এর ক্ষেত্রে রেখার সদৃশ অনুকরণ অপেক্ষা রেখার স্বচ্ছন্দ গুণ দেখা গেলেই এই বিশেষণটি ব্যবহৃত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা গদ্য রচনাকালে নূতন সংঘটিত শব্দের প্রয়োজন বারবার অনুভব করেছিলেন এবং 'শব্দ চয়ন' নিবন্ধে সংস্কৃত শব্দভান্ডার থেকে সন্ধান করে তিনি একটি পরিভাষা তৈরি করেছিলেন। এই তালিকায় অপ্রভ (অবস্কিয়োর), অবেক্ষা (অব্জারভেশন), আঙ্গিক (টেক্নিক্), কারুকারক শিল্পজীবী (আর্টিজান্), পরিলিখন (আউটলাইন, স্কেচ্), প্রেক্ষণিকা (এক্জিবিশন্),

মুদ্রালিপি (লিফোগ্রাফ্) শিল্পবিধি (রুলস্ অফ আর্ট), শিল্পালয় (আর্ট ইনস্টিটিউট) সৎকলা (এ ফাইন্ আর্ট) প্রভৃতি শিল্প সম্পর্কিত শব্দ পাওয়া যায়। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় যে সব নূতন সংঘটিত শব্দ পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার করেছেন, সেগুলির মধ্যে রয়েছে — আলোকধর্মী (ভবান্যাশ), আকার, গড়ন (ফর্ম), আমেজ (টিন্ট্), প্রতিমারূপ (ইমেজ), বুনোট (টেক্শ্চার), সাদৃশ্য (অ্যাসোসিয়েশন্) প্রভৃতি। নন্দলাল বসু যে সব অভিব্যক্তি ব্যবহার করেছিলেন সেগুলির মধ্যে রয়েছে — স্বভাব (নেচার), পরম্পরা (ট্রাডিশন), স্বকীয়তা (ওরিজিন্যালিটি), প্রমাণ (প্রপরশন্) ভারসাম্যতা (ব্যালান্স্), বস্তুঘেঁষা (রিয়েলিস্টিক), মনগড়া (কনভেনশন্যাল), কাঠামো (কনস্ট্রাকশন), ঘনত্ব (ভল্যুম), মনোবেগ (ইমোশন) প্রভৃতি।

বাংলা ভাষার শিল্পালোচনার সূত্রে আরও যে-সব অভিব্যক্তি পাওয়া গেছে ঃ– বিমূর্ত (অ্যাবস্ট্রাক্ট্), অনুরূপ, সমধর্মী (অ্যানালোগাস্), বর্ণিকাভঙ্গ (কল্ব্ঙ্কিম), বহিঃরেখা, পরিণাহ, সীমারেখা (কনটুর), খোদাই, তক্ষণ (এনগ্রেহ্বিং), রীতিবাদ, রীতি সর্বস্বতা, রূপসর্বস্বতা, বিধিবত্তা (কর্ন্যালিজম্), বর্ণনাম, বর্ণাভা (হিউ), স্পৃশ্যগুণ, ঘনত্বস্রষ্টা (ট্র্যাক্টাইল), চিত্রিকা (মিনিয়েচার), প্রকাণ্ড, বিস্ময়কর (মনুমেন্টাল্) কাট্টম (মোজাইক্)।

অনুশীলনী (Exercise) :

- শিল্পকলা বলতে কি বোঝায়? উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা কর।
- ললিতকলা ও ব্যাবহারিক শিল্প – কাকে বলে? ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে, শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রতিফলন সম্বন্ধে উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করো।
- চারুশিল্প ও কারুশিল্প তুলনামূলক ব্যাখ্যা করো।
- প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদি মানব কীসের প্রয়োজনে ও কী মাধ্যমে ও কীভাবে চিত্র রচনা করেছিল?
- চারুশিল্প-এর জন্য বিভিন্ন মাধ্যমের জন্য কী কী উপকরণ প্রয়োজন, তার ধারাবাহিক ব্যাখ্যা করো।
- মডেল ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করো। মডেলের জন্য কী কী উপকরণ ও ভাস্কর্যের জন্য কী কী উপকরণ প্রয়োজন?
- জল রং ও তেল রং-এর সাহায্যে চিত্র রচনার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি কী কী?
- কী কী উপায়ে চিত্র সংরক্ষণ করা হয়?
- মিনিয়েচার পেন্টিং কাকে বলে? রাজপুত চিত্রকলা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করো উদাহরণ সহকারে।
- মোঘল মিনিয়েচার পেন্টিং-এর উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল? আকবর-এর সময় এর চিত্রকলার উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা করো।
- ‘‘স্থাপত্য ভাস্কর্য ও চিত্র’’ — অজন্তা গুহা সম্বন্ধে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।
- চিত্র রচনায় উষ্ণ রং ও শীতল রঙের প্রয়োগ – ঋতুভিত্তিক আলোচনা করো। (গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শীত, বসন্ত)
- দ্বি-মাত্রিক চিত্র ও ত্রিমাত্রিক চিত্র কী? (উদাহরণ)
- পরিপ্রেক্ষিত (Perspective) বলতে কী বোঝায়? দৃশ্য চিত্রে রঙের পরিপ্রেক্ষিতে কী কী রং ও কী পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়?
- Base Line, Eye Level ও Vanishing Paint কাকে বলে?
- ভাস্কর্য শিল্পে — Rhythm, Balance সম্বন্ধে অল্প কথায় ব্যাখ্যা করো।
- দ্বিমাত্রিক চিত্র সম্বন্ধে কী জান? অজন্তা মুরাল চিত্র-এ রং ও রেখা সম্বন্ধে উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করো।
- চিত্র রচনা (Composition) কী কী শর্ত মেনে চলা উচিত?

    চিত্রে দিগন্ত বিস্তৃত পরিবেশ বোঝাতে গেলে পটভূমির (যেমন কাগজ) অনুপাত কী হওয়া উচিত?

- চিত্রে আলো ও ছায়ার ব্যবহারের ফলে চিত্র কোন পর্যায়ভুক্ত হয়?
- চিত্রে ১। হল রং-এর ব্যবহার
  ২। তেল রং-এর ব্যবহার তুলনামূলক আলোচনা করো।
- প্যাস্টেল রং-এর বৈশিষ্ট্য কী কী?
- জল রং-এর সুবিধা ও অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা করো।

- নক্সা ও আলপনার বৈশিষ্ট্যগুলি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ, আলোচনা করো।
- কোনো একটি উৎসব বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আল্পনার জন্য কী কী বিষয় উপকরণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করো।
- মাটির কাজের জন্য কী কী সমস্যার সৃষ্টি হয়? মাটিকে কাজের উপযুক্ত করে তোলার জন্য কী করা উচিত? এই কাজের জন্য কী কী উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয়?
- কাগজের মণ্ড কীভাবে তৈরি করা যায়? এই মণ্ড দিয়ে কোন শিল্পকর্ম কীভাবে বা পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করো।
- কোলাজ কাকে বলে? কোলাজ চিত্র রচনার জন্য কী কী উপকরণ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করো।
- ব্যক্তি ও সমাজে হাতের কাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করো।
- Tie & Dye কাকে বলে? কোন রাজ্যে এর বহুল প্রচলন দেখা যায়? Tie & Dye এর জন্য উপকরণ ও কৌশল ব্যাখ্যা করো।
- ফেব্রিক পেন্টিং-এর উপকরণ ও পদ্ধতি আলোচনা করো।

গ্রন্থপঞ্জী

- চিত্রভাবন — ডঃ শোভন সোম
- শিল্প, শিল্পী ও সমাজ — ডঃ শোভন সোম
- শিল্প ও শিল্পী — (১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড, ৩য় খণ্ড) — শ্রীকৃষ্ণলাল দাস
- শিল্পচর্চা — শ্রী নন্দলাল বসু
- চিত্রপ্রকরণ — ডঃ নির্বাণ আশ
- ছবি কাকে বলে — শ্রী অশোক মিত্র
- চিত্রদর্শন — শ্রী অলোক মুখোপাধ্যায়
- নন্দন তত্ত্ব — ডঃ সুধীর কুমার নন্দী
- ভারত শিল্প — শ্রী নির্মল ঘোষ
- চিত্রকর (১ম খণ্ড) — শ্রী বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়
- চিত্রদর্শন — শ্রী কানাইলাল সামন্ত
- রবীন্দ্র চিত্রকলা — শ্রী মনোরঞ্জন গুপ্ত
- যুগে যুগে ভারত শিল্প — শ্রী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
- ভারত শিল্প ও আমার কথা — শ্রী অর্দ্ধেন্দু শেখর গাঙ্গুলী
- পাশ্চাত্য শিল্পের কাহিনী — শ্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
- Education Through Art — Herbert Read
- Meaning of Art — Herbert Read
- History World Art — E.M. Wingert, P.S. Wingert, Mchler, Oxford University Press. 1949.
- A Concise History of Indian Art — Roy C. Craven.

অধ্যায় ৬

কৃৎ কলা শিল্পের উপস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষণ এবং শিক্ষাগ্রহণ

১. ভূমিকা ঃ

লেখাপড়ার সঙ্গে নাটকের একটা ঝগড়া আছে, এ কথা শুরুতেই বলে নেওয়া ভালো। নাটক আমরা দেখতে যাই, শুনতে যাই। কী দেখি? কতকগুলো ঘটনা। ঘটনাগুলো আমাদের সামনে আসে কী করে? কিছু ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে, ইংরেজিতে যাকে বলে action, যে বা যারা সেই ক্রিয়াগুলো করে তাকে বা তাদের বলে actor। আর পড়াশোনাটা দাঁড়িয়ে আছে প্রমাণ, যুক্তি বিশ্লেষণ আর সিদ্ধান্তের ওপর ভর করে। এ দুয়ের মধ্যে কেমন করে মিল ঘটানো যায়? আর একটা কথা আছে। সাহিত্য বা শিল্প ছাড়া অন্য যে কোনো পড়াশোনা খুব নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চায়, আবেগ, ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দকে সে পাত্তা দেয় না। কিন্তু নাটকের কাজ মানুষের ওই ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতিগুলোকে জাগিয়ে তোলা। পড়াশোনা নিয়ে নাটক লিখতে বসে এই ঝগড়াটা মেটানো যাবে কী করে?

মেটানোর চেষ্টা না করে আমরা শুধু তথ্যগুলোকে দৃশ্য আর সংলাপরূপ দেবার চেষ্টা করেছি। এ কথা মনে রাখতে বলব, নাটক হল ধরে নেওয়ার জগৎ, অর্থাৎ আমরা যদি কোনো একটা অসম্ভব কিছুকেও সত্যি বলে ধরে নিই, তাহলে দর্শকও সেটা তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করবে। উদাহরণ দিয়ে বলি, পাঁচটা ছেলেমেয়ে যদি গোল হয়ে দাঁড়িয়ে বলে এইটা আমাদের দেশ, তাহলে তারা তো বটেই, দর্শকও বিশ্বাস করে নেবেন এইটা সত্যিই একটা দেশ। এই ধরে নেওয়ার সুবিধেটুকু মাথায় রেখে সোজা করে বোঝাবার জন্যে আমরা ক্লাসে যে সব উদাহরণ দিই সেই রকম উদাহরণ দিয়ে তৈরি করা যায় ছোটো নাটক, শুধু মনে রাখতে হবে, উদাহরণগুলো যেন দেখবার এবং শোনবার যোগ্য হতে পারে। কথা না বাড়িয়ে আমরা বরং দুটো নাটক সামনে রাখি। পড়াশোনার বিষয় থেকে নাটক তৈরি করার এটাই একমাত্র পথ এমনটা কিন্তু নয়, আরো নানা পথ ভাবনা চিন্তা করে নিজে নিজে বার করে নিতে পারবেন আশা করি।

১.১ অতীত ও ঐতিহ্য

ষষ্ঠ শ্রেণি

৫ (জনপদ থেকে মহাজনপদ)

(সূত্রধার এসে বোর্ডে লেখেন—ষোড়শ মহাজনপদ)

সূত্রধার।। যা লিখলাম তাতে কী কী শব্দ আছে কী কী শব্দ?

ছাত্র ১।। ষোড়শ।

ছাত্র ২।। মহাজন।

সূত্রধার ।। কেন, মহা বলে আলাদা শব্দ হয় না?

ছাত্র ৩।। হয় হয়। মহাবীর।

ছাত্র ৪।। মহাযোগী।

সূত্রধার।। আর মহাদুষ্টু?

(সবাই—হ্যাঁ, মহাপাজি, মহা বাঁদর, মহাবিচ্ছু ইত্যাদি বলতে থাকে)

সূত্রধার।। বেশ। তাহলে মহা একটা আলাদা শব্দ। মানেটা নিশ্চয় বলে দিতে হবে না। এইবার জন। জন দিয়ে কোনো শব্দ মনে পড়ছে?

ছাত্র ১।। জনস্থান।

ছাত্র ২।। জনবসতি।

ছাত্র ৩।। জনতা।

ছাত্র ৪।। জনগণ।

সূত্রধার।। এই তো, অনেকগুলো শব্দ বেরিয়ে এল। তাহলে এর থেকে জন শব্দের মানে কী দাঁড়াচ্ছে?

সবাই।। মানুষ।

সূত্রধার।। জনপদ মানে? পদ মানে কী?

সবাই।। পা।

সূত্রধার।। তাহলে, জন, মানে জনতা, জনগণ যেখানে পা রাখে, সেটা হল জনপদ। ঠিক আছে?

(ছাত্ররা ছোটো ছোটো লাফ দিয়ে এক একটা জায়গায় দাঁড়ায় আর মুখে বলে)

ছাত্র ৫।। এটা আমার জনপদ।

ছাত্র ৬।। এটা আমার।

ছাত্র ৭।। কিন্তু ষোড়শ জনপদ কেন?

সূত্রধার।। বলছি বলছি। তার আগে একটা খেলা শুরু করা যাক।

সবাই। খেলা?

সূত্রধার।। হ্যাঁ। সবাই চলে এসো। পাঁচজন মিলে এক একটা গোল করে দাঁড়াও।

(পাঁচজন করে ছাত্র এক একটা বৃত্ত তৈরি করে, ধরা যাক এই রকম পাঁচটা বৃত্ত তৈরি হয়।)

সূত্রধার।। এক একটা গোল হল এক একটা জনপদ। ঠিক আছে?

সবাই।। ঠিক আছে।

সূত্রধার।। (প্রত্যেক বৃত্তের কাছে গিয়ে বলতে থাকেন) এইটা তোমার জনপদ। তোমার দেশ। আর কারুর নয়, তাই তো?

ছাত্ররা।। তাই।

(প্রথম বৃত্তের ছাত্ররা অভিনয় শুরু করে)

১মা।। নাঃ, আমাদের জনপদটা ছোটো হয়ে গেছে।

২য়া।। সে তো হবেই। লোক বাড়ছে, থাকবার জায়গায় টান পড়ছে।

৩য়া।। শুধু থাকবার জায়গা? চাষের ক্ষেত কত কমে গেছে দেখেছ? যা ফসল হয় তাতে এতগুলো লোক বেঁচে থাকতে পারে?

তিনজন।। অসম্ভব।

৪র্থ।। আরে শুধু হা হুতাশ করলে হবে? এ সবের থেকে বাঁচবার কিছু একটা উপায় বার করো।

৫ম।। আমি একটা কথা বলব?

সবাই।। কী কথা?

৫ম।। আমরা যদি পাশের জনপদটা দখল করে নিই?

২য়।। দখল করে নেব?

৫ম।। হ্যাঁ, তাহলে ওটাও আমাদের হয়ে যাবে।

১ম।। হ্যাঁ। এটা ভালো বুদ্ধি। তাহলে অনেকটা জমি পাব, অনেক ক্ষেত।

সবাই।। ঠিক ঠিক। একদম ঠিক। চলো, যুদ্ধ।

(যুদ্ধের বাজনা বেজে ওঠে। নাচের তালে যুদ্ধের অভিনয় হচ্ছে। দেখা গেল প্রথম বৃত্তটায় আরো তিনজন যোগ দিয়েছে, বৃত্তটা বড়ো হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বৃত্তে দু-তিনজন মাত্র। সে বৃত্তটা ছোটো হয়ে গেছে। সূত্রধার হাত দেখিয়ে থামতে বলে। সবাই থেমে যায়।)

সূত্রধার।। এমনি করে ছোটো ছোটো জনপদগুলো বড়ো হয়ে উঠতে লাগল। আর এত বড়ো জনপদকে কি শুধু জনপদ নামে ডাকলে চলে?

(প্রথম বৃত্তের অভিনেতারা)

১ম।। এখন থেকে আর জনপদ নয়, আমাদের বলতে হবে ম-হাজনপদ।

সবাই।। হ্যাঁ, ম-হাজনপদ।

২য়।। কিন্তু ভাইসব, এখানেই থেমে গেলে হবে না। আমাদের সীমানা আরো বাড়াতে হবে।

৩য়।। ঠিক। আমাদের ক্ষমতা আরো বাড়াতে হবে।

৪র্থ।। আর তার জন্যে দরকার—

৫ম।। আরো যুদ্ধ। আরো আরো যুদ্ধ।

সবাই।। যুদ্ধ।

(আবার শুরু হয় যুদ্ধ)

সূত্রধার।। যিশুখ্রিস্ট জন্মাবার দুশো বছর আগে এই রকম করে করে ষোলোটা জনপদ, থুড়ি মহাজনপদ তৈরি হয়ে উঠল। ষোলকে ভালো বাংলায় বলে ষোড়শ, তাই ষোড়শ মহাজনপদ। কিন্তু অতগুলো কি আর রইল? তাদের মধ্যেও চলতে থাকে যুদ্ধ। রাজ্য দখল। ষোলোটা মহাজনপদ শেষে চারটেতে এসে দাঁড়াল।

(ছাত্ররা চারটে বড়ো বড়ো বৃত্ত তৈরি করল।)

সূত্রধার।। তোমরা কে কোন্ জনপদের লোক, বলো।

(বৃত্ত২ এর ছাত্ররা)

সবাই।। মগধ।

(বৃত্ত ৩)

সবাই।। আমরা অবন্তী।

(বৃত্ত ৪)

সবাই।। আমরা হচ্ছি বৎসদেশের লোক।

(বৃত্ত ১)

সবাই।। আমরা কোশল।

একদল।। মগধ।

দ্বিতীয় দল।। অবন্তী।

তৃতীয় দল।। বৎস।

চতুর্থ দল।। কোশল। আমরা সকলের ওপরে।

(সবাই বলতে থাকে—আমাদের জনপদ সবচেয়ে ভালো। তুমুল হট্টগোল)

সূত্রধার।। তাহলে আর কী? কার রাজ্য সবচেয়ে ভালো তা বোঝার সবচেয়ে ভালো উপায় তো ওই একটাই। যুদ্ধ।

(আবার যুদ্ধের নাচ। যুদ্ধের শেষে একদল চিৎকার করে বলে)

সবাই।। আমরা জিতেছি। আমরা শ্রেষ্ঠ। আমরা মগধের লোক। মগধ।

(সবাই লাফালাফি করতে থাকে। সূত্রধার বলে)

সূত্রধার।। আরে দাঁড়াও। শ্রেষ্ঠ বললেই তো হবে না। তোমরা কেন শ্রেষ্ঠ সেটা বুঝিয়ে দাও।

১ম।। আমাদের মগধ পাহাড় আর জঙ্গল দিয়ে ঘেরা। বাইরে থেকে শত্রু ঢুকতেই পারে না।

(সবাই চিৎকার করে সমর্থন জানায়)

২য়।। পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। মাটি কী? বীজ ছুঁড়ে দিলেই ফসলে মাঠ ভর্তি। তারপর ধরো নদী দিয়ে জলপথে ব্যবসা করতে যাওয়া যায়।

(বলার সঙ্গে সঙ্গে বাকিরা মূকাভিনয় করে দেখায়)

৩।। আর জঙ্গল। ওই জঙ্গলে সব বড়ো বড়ো হাতি পাওয়া যায়। ধরে বশ করো।

(কয়েকজন হাতি সেজে চলতে থাকে। বাকিরা দৌড়ে গিয়ে লাফিয়ে তাদের পিঠে চাপে।)

৫ম।। এই হাতিগুলোকে নিয়ে কী করা যাবে?

২য়।। কত কিছু করার আছে। চলো, এদের পিঠে চেপে যুদ্ধ করব। যে সামনে আসবে তাকেই পায়ের তলায় পিষে দেবে।

সবাই।। পিষে দেবে।

(হাতির পিঠে চেপে যুদ্ধযাত্রার অভিনয় করতে থাকে। অন্যরা ভয় পেয়ে পালায়। কেউ কেউ পায়ের তলায় পড়ে যাবার অভিনয় করে।)

৪র্থ।। শুধু কি তাই? আমাদের জনপদে কতগুলো লোহা আর তামার খনি আছে বলো তো?

সবাই।। খনি খনি। লোহার খনি, তামার খনি।

২য়।। লোহা থেকে—

সবাই।। অস্ত্র হয়—

৩য়।। তামা থেকে।

সবাই।। অস্ত্র হয়।

৪র্থ।। খনির ভেতর ঢোক। তামা তোল। লোহা তোল।

সবাই।। তামা তোল, লোহা তোল।

(খনির তলা থেকে তামা লোহা তুলে আনার অভিনয় করে সবাই।)

৫।। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, আমাদের রাজা। আমাদের রাজা গোটা জনপদটাকে কেমন করে চালাচ্ছেন বলো। জয় মহারাজের জয়।

সবাই।। জয় মহারাজের জয়।

(আরেকটা বৃত্ত থেকে কথা শুরু হয়)

১ম।। মানি না, মানি না।

২য়।। আমাদের কোনো রাজার দরকার নেই।

৩য়।। আমরা নিজেরা মিলেই আলোচনা করে রাজ্য চালাব।

সবাই।। আমরা নিজেরা মিলেই রাজ্য চালাব।

সূত্রধার।। বাবা, তোমরা তো গণতন্ত্রের কথা বলছ গো। রাজা থাকবে না, প্রজারা মিলেই আলোচনা করে রাজ্য চালাবে। যেমন আমাদের দেশে হয়। অতদিন আগেও এমনটা ছিল?

সবাই।। নিশ্চয়।

সূত্রধার।। সবাই থাকতে পারত সে সব আলোচনায়?

৪।। সবাই। অবশ্য মেয়েদের আর দাসেদের সে অধিকার ছিল না।

৪র্থ।। সেই জন্যেই তো আমাদের রাজ্যকে ইতিহাসে বলে গণরাজ্য।

সূত্রধার।। তা তোমাদের গণরাজ্যের নাম কী?

সবাই।। বৃজি। বজ্জিও বলতে পার। একেবারে মগধের পাশে।

২।। অন্য রাজ্যরা কম চেষ্টা করে আমাদের জনপদটাকে দখল করে নিতে?

৫ম।। এ রকম আর একটা গণরাজ্য আছে, মল্ল।

সবাই। মল্ল।

২।। কেমন করে রাজ্য চালাতে হয় সেটা আমাদের কে শিখিয়েছেন জানো?

সূত্রধার।। কে বলো তো?

সবাই।। গৌতম বুদ্ধ। বুদ্ধদেব।

দলের মধ্যে একজন বুদ্ধদেবের ভঙ্গীতে বসে পড়ে। বাকিরা তার চারপাশে বসে।

সূত্রধার।। বুদ্ধদেব? কী শিখিয়েছেন?

৩।। সে অনেক সব নিয়ম। যেমন ধরো—

বুদ্ধদেব।। রাজ্য চালাতে হবে সভা করে।

২য়।। আর সভায় যা ঠিক হল, তা সবাই মিলে একজোট হয়ে করতে হবে।

৩য়।। সে তো বটেই।

৪র্থ।। আমাদের আছে নিজেদের বানানো আইন।

৩য়।। সেই আইন সবাইকে মানতে হবে, সে যেই হোক।

বুদ্ধদেব।। যাঁরা বয়স্ক মানুষ, মেয়েরা, মন্দিরের দেবতা—

২য়।। গাছপালা পশুপাখি সবাইকার যত্ন নিতে হবে।

সূত্রধার।। বা, এ তো দারুণ সব নিয়ম।

বুদ্ধদেব যে সেজেছিল সে উঠে পড়ে

১ম।। কিন্তু কতদিন রাখতে পারব জানি না।

সূত্রধার।। এ কথা বলছ কেন?

৩।। অন্য অন্য রাজ্যগুলো আমাদের আক্রমণ করছে। তাদের সঙ্গে লড়তে গেলে সৈন্য লাগবে। অস্ত্র লাগবে।

৪।। তার টাকা কোথায় পাব?

২য়।। সবাইকার ওপর কর বসাতে হয়। তাতে মানুষজন রেগে যায়। ঝগড়া হয়।

১ম।। তবু, চেষ্টা তো করতেই হবে।

সবাই।। ঠিক, চেষ্টা তো করতেই হবে।

(সবাই স্থির হয়ে যায়, শুধু সূত্রধার এগিয়ে আসে।)

সূত্রধার।। এরা সবাই একদিন ছিল। বেঁচে ছিল আমাদেরই মতো। আজ তারা নেই। কিন্তু যদি তাদের নিয়ে আসা যায়? নাটকের মধ্যে দিয়ে। যেখানে নিজেদের কথা তারা নিজেরাই বলবে? কেমন হয় বলো তো তাহলে?

(অভিনেতারা এগিয়ে এসে দর্শককে নমস্কার করে)

১.২ মানুষের খাদ্য

(অংশ)

(একটি বলশালী ছেলেকে সামনে রেখে অনেকে মিলে আবৃত্তি করছে)

সবাই।। খেলার ছলে ষষ্ঠীচরণ/হাতি লোফেন যখন তখন/দেহের ওজন উনিশটি মন/শক্ত যেন লোহার গঠন।

(আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠীচরণ সেইমত আচরণ করছিল, যেমন হাতি লোফালুফি করা, মুগুর ভাঁজা ইত্যাদি। পরের লাইনগুলো অভিনয় করে দেখাতে হবে)

সবাই।। একদিন এক গুণ্ডা তাকে বাঁশ বাগিয়ে মারল বেগে/ভাঙল সে বাঁশ শোলার মতো/মট করে তার কনুই লেগে।

(একজন গুণ্ডা হয়ে অভিনয় করে। বাঁধ ভেঙে যেতে গুণ্ডা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়। ষষ্ঠীচরণও মঞ্চ থেকে চলে যায়। গুণ্ডা ঢোকে, উল্টোদিক থেকে ঢোকে আর একজন। ধরা যাক তার নাম ডন।)

ডন।। আরে কাঁদছিস কেন? মার খেয়ে কেঁউ কেঁউ করে তো পালিয়ে এলি, এবার ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লজ্জা করছে না?

গুণ্ডা।। কী করব? বেদম মেরেছে যে।

ডন।। প্রতিশোধ নে। রিভেঞ্জ।

গুণ্ডা।। ওরে বাবা, আমার চোদ্দ পুরুষেও পারবে না। বলে কনুই দিয়ে বাঁশ ভেঙে দিচ্ছে।

ডন।। হুঁ। মাথায় একটা মতলব এসেছে।

গুণ্ডা।। কী মতলব। আমি কিন্তু আর ওর কাছে যেতে টেতে পারব না বলে দিলাম।

ডন।। যাবি, যাবি। গিয়ে কেঁদে কেঁদে বলবি—

(ডন চলে যায়। উল্টোদিক থেকে ঢোকে ষষ্ঠীচরণ। গুণ্ডা তার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ে)

ষষ্ঠী।। কী হল? আরে কী হল?

গুণ্ডা।। আমাকে মেরে ফেলবে।

ষষ্ঠী।। মেরে ফেলবে? কে?

গুণ্ডা।। আমার ডন। বলে তুই একটা লোকের কাছে মার খেয়ে ফিরে এলি, আজ তোকে মেরেই ফেলব। বলে কে ষষ্ঠীচরণ? বাঁ হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে তাকে পটকে দিতে পারি।

ষষ্ঠী।। বটে? এত মস্তানি? আয় তো দেখি। তার কাছে নিয়ে চল আমাকে।

গুণ্ডা।। আসুন, আসুন।

(দুজনে মঞ্চে একটা চক্কর দিয়ে নেয়।)

ষষ্ঠী।। কোথায় তোর ডন?

গুণ্ডা।। আছে। ধারে পাশেই আছে। আপনি একটু বসুন, আমি ডেকে নিয়ে আসছি।

(ঘর থেকে বেরোবার আগে যেন দরজা বন্ধ করে দেয়)

ষষ্ঠী।। দরজা বন্ধ করলি কেন? কী হল, দরজা বন্ধ করলি কেন?

ডন।। (ঢুকে একপাশে দাঁড়ায়, যেন ঘরের বাইরে থেকে কথা বলছে।) ওইখানেই তুমি থাকবে। খেতে দেব না। এক ফোঁটা জল দেব না। দেখি, বীরত্ব কতদিন থাকে। অ্যাঁ। হাতি লোকেন যখন তখন। তোর হাতি আমি লোকাচ্ছি।

(সবাই এগিয়ে আসে। ছড়া বলে, সুর করে গানও গাইতে পারে।)

একদিন গেল দু দিন গেল তিনদিন হল পার

পেটের মধ্যে খিদের জ্বালা পারছে না তো আর

চারদিন গেল পাঁচদিনের দিন মাথা ভোঁ ভোঁ করে

হাতি লোফা ষষ্ঠীচরণ এলিয়ে যে পড়ে।

এমনি করে খাবার যদি না খায় পেট ভরে

রাজ্যের যত অসুখ বিসুখ পাকড়ে তাকে ধরে।

(কান্নার রোল পড়ে যায়। ষষ্ঠীচরণ উঠে দাঁড়িয়ে বলে)

ষষ্ঠী।। কিন্তু এর মানে কি?

সবাই।। কিসের মানে?

ষষ্ঠী।। মুখ দিয়ে খাচ্ছি না বলে শরীরের যা কিছু অঙ্গ টঙ্গ আছে সব এলিয়ে পড়বে? যত সব রোগ বালাই ঢুকে পড়বে? এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্কটা কোথায়?

ডন।। দেখো দেখো। শুধু খেতেই জানে। খাওয়ার সঙ্গে শরীরের সম্পর্কটা কী তা জানে না।

ষষ্ঠী।। না জানি না। তাই নিয়ে ফুট কাটবার কী হয়েছে? জানাও।

ডন।। ওরে গাধা, খাবারের মধ্যে দিয়ে অনেকগুলো জিনিস তোমার শরীরের মধ্যে ঢোকে, এটাও শোন নি?

ষষ্ঠী।। খাবারই তো ঢোকে। আবার কী ঢুকবে?

ডন।। ভাত খাও না রুটি খাও?

ষষ্ঠী।। দুটোই খাই। দিনে ভাত রাত্তিরে রুটি।

ডন।। তার মাধ্যমে তোমার শরীরে ঢুকছে শর্করা। মানে কার্বোহাইড্রেট। শুধু ভাত রুটিতে নয়, ফল দুধ এই সব কিছুতেই আছে ওই—

ষষ্ঠী।। থাক থাক। কী বিকট দাঁতভাঙা নাম।

গুন্ডা।। কার্বোহাইড্রেট।

(তিন চার জন দৌড়ে ঢুকে পড়ে একসঙ্গে গায়।)

আখ মধু পাকা আম পাকা কলা আঙুর আপেল

চাল গম জোয়ার বাজরা বীট গাজর কি আলু শাঁকআলু

লাল শাক নটে শাক মুসুর মুগ ও মধু দুধ

সব কিছু শরীরেতে নিয়ে যায় কার্বোহাইড্রেট

কার্বো ১।। আমরা হচ্ছি সেই কার্বোহাইড্রেট। এই পেটের মধ্যে ঢুকে গেলাম। (দৌড়ে ষষ্ঠীর পেছনে চলে যায়। তারপর বেরিয়ে এসে।) হজম হলাম। (ষষ্ঠী হেউ করে ঢেকুর তোলে।) ছোটো ছোটো কণা হয়ে গেলাম।

কার্বো ২।। তখন আমাদের নাম হল—

সবাই।। গ্লুকোজ।

(গ্লুকোজেরা ষষ্ঠীর চারপাশে ছুটোছুটি করছে)

ষষ্ঠী।। আরে আরে, একি? একি করছ?

গ্লুকোজেরা।। বুঝতে পারছ না?

গ্লুকোজ ১।। রক্তের মধ্যে সাঁতার কেটে কেটে আমরা পৌঁছে যাচ্ছি শরীরের ভেতরে ভেতরে।

গ্লুকোজ ২।। শরীরের মধ্যে হাওয়া থেকে নেওয়া অক্সিজেন আছে, তার সঙ্গে মিশে যাই, ব্যস, তৈরি হয়ে ওঠে—

সবাই।। (লাফিয়ে উঠে বলে) শক্তি।

ষষ্ঠী।। ব্যস, শক্তি ফিরে পেলে আর কিছু চাই না।

গ্লুকোজ ১।। আর যদি তোমার শরীরের কোশগুলো দরজা বন্ধ করে দেয়?

ষষ্ঠী।। কোশগুলো দরজা বন্ধ করে দেবে? তার মানে?

গ্লুকোজ ২।। আহা, এ তো সোজা কথা। শরীরের কোশের ভেতর অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে ঢুকব, ঘুরে বেড়াব, তবে না শরীরে শক্তি আসবে? তা কোশগুলো যদি ভেতরে ঢুকতেই না দেয়?

গুন্ডা।। (ভেংচে) এ হে হে। ঘুরে বেড়াব। যেন পুজোর ছুটিতে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছে সব।

গ্লুকোজ ১।। ঠাট্টা নয় স্যার। আমাদের ঢুকতে না দেওয়া মানে মধুমেহ।

ষষ্ঠী।। মানে। মধু টধু খাওয়াবে নাকি? কী আনন্দ!

ক্লুকোজ ২।। মধুমেহ মানে ডায়বেটিস। আপনার হার্ট গোলমাল করবে, কিডনি গোলমাল করবে, চোখ খারাপ হবে, পা ফুলে যাবে—

ষষ্ঠী।। এই, ভয় দেখাবে না বলে দিচ্ছি।

ডন।। সেই জন্যেই বলছি, এই মধুমেহ থেকে বাঁচবার উপায় হল বাড়াবাড়ি রকমের খাওয়া নয়, ঠিক ঠিক খাওয়া। আর—

ষষ্ঠী।। আর?

গুন্ডা।। নিয়মিত ব্যায়াম করা।

ষষ্ঠী।। সে আর আমাকে বলে দিতে হবে না। উনিশ মন ওজনটাই শুধু দেখো না হে, হাতি লোফার খাটনিটাও মাথায় রেখো।

ডন।। একটা কথা জিজ্ঞেস করি। ভাত রুটি দুধ ফল ছাড়া আর কি কি খাও? মাছ, মাংস, ডিম?

ষষ্ঠী।। (জিভের জল টেনে) উহুহু, খিদের মুখে কেন মনে করিয়ে দিলে?

গুন্ডা।। ও সবের মধ্যে দিয়ে শরীরে ঢোকে প্রোটিন।

ষষ্ঠী।। কিসের টিন?

ডন।। এই মূর্খটাকে কে এখানকার ঠিকানা দিয়েছে রে? টিন টালি অ্যাসবেস্টাস কিচ্ছু নয়। প্রোটিন।

ষষ্ঠী।। কী হয় তা শরীরে ঢুকলে?

গুন্ডা।। ঢুকলে কী? তোমার শরীরময় তো প্রোটিন ঢুকে বসে আছে।

ষষ্ঠী।। কী রকম?

ডন।। (ছড়ার মতো করে) মাথার চুলে হাতের নোখে পায়ের নোখে।

সবাই।। ঢুকেছে কেরাটিন।

ডন।। এই যে তুমি মাসল ফোলাও এতে আছে।

সবাই।। অ্যাকটিন, মায়োসিন।

গুণ্ডা।। শরীর জুড়ে ছুটছে যত রক্ত, লোহিত কণিকা।

সবাই।। তার মধ্যে মিশে আছে হিমোগ্লোবিন।

গুণ্ডা।। প্লাজমা আছে রক্তে মিশে প্লাজমা আছে বুকের দুধে।

সবাই।। তার মধ্যে মিশে আছে গ্লোবিউলিন আর ফাইব্রিনোজেন।

ডন।। হার মজ্জায় মিশে আছে আরেক প্রোটিন—

সবাই।। কোলাজেন।

(ষষ্ঠী দরাম করে পড়ে যায়। সবাই কী হল কী হল করে ছুটে আসে)

ষষ্ঠী।। এই যে একগাদা নাম বললে, এগুলো কী?

ডন।। এরা সবাই প্রোটিন। নানা রকম প্রোটিন।

ষষ্ঠী।। এই সব বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি নামের প্রোটিন আমার শরীরে ঢুকে বসে আছে?

গুণ্ডা।। ভাগ্যিস আছে। আরে প্রোটিন ছাড়া শরীর তৈরি হবে কী করে? মাসল তৈরি হবে না। অল্প অসুখেই কেৎরে পড়বে, কোথাও কেটে গেলে আর সারবে না।

ডন।। এমন কি ভালো করে নিশ্বাস নিতে গেলেও প্রোটিনের দরকার। বুঝলে?

ষষ্ঠী।। জানি তো, জানি তো। সেই জন্যেই তো দুবেলা মাংস, মাছ, ডিম সব গবগব করে না খেলে আমার ঠিক ইয়ে হয় না, মানে প্রোটিন হয় না।

ডন।। সয়াবিন খাও?

ষষ্ঠী।। ন্যাঃ।

গুণ্ডা।। ডাল, গম?

ডন।। মটরশুঁটি, সীম, কাঁঠালের বিচি?

ষষ্ঠী।। না না।

অন্য কেউ।। বাজরা, ভুট্টা?

আরেকজন।। রসুন, লবঙ্গ, এলাচ, ধনে হলুদ?

আরেকজন।। ছানা, পনির, কাঁকড়া?

ষষ্ঠী।। হ্যাঁ, কাঁকড়া।

ডন।। না, সবগুলো। সবগুলোয় প্রোটিন আছে। সবগুলো খাওয়া জরুরি।

ষষ্ঠী।। সবগুলো না খেলে কী হয়েছে? আমি তো প্রোটিন খাচ্ছি। মাছ, মাংস, ডিম, কাঁকড়া—

ডন/গুণ্ডা।। বেশি প্রোটিন কিন্তু ভালো নয়।

ষষ্ঠী।। কী হবে, বেশি খেলে?

ডন।। কিডনিতে স্টোন।

গুণ্ডা।। বাতও হতে পারে। ব্যথায় নড়তে পারবে না।

ষষ্ঠী।। ও বাবা, বেশি খেলে এখানেও অসুখ?

সবাই।। মাপমত না চললেই নানা রোগ ব্যাধি।

ষষ্ঠী।। আচ্ছা, কার্বোহাইড্রেট আর প্রোটিন ছাড়া আর কী কী কোন্ কোন্ খাবারের মধ্যে দিয়ে শরীরে ঢোকে।

ডন।। সে সাত কাণ্ড রামায়ণ। ফট করে বললে আর চট করে বুঝে গেলে তা হবে না।

গুণ্ডা।। হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকে বাড়ি যাও, পরে আর একদিন সে সব নিয়ে কথা বলা যাবে। তাহলে—

সবাই।। টা টা, বাই বাই।

(ষষ্ঠী যেতে গিয়ে মুখ ফেরায়)

ষষ্ঠী।। ভাগ্যিস গুণ্ডায় ধরেছিল। কত কথা যে জানা হল আজকে!

অনুশীলনী : পাঠ্য বিষয়ের যে কোনো একটি অংশ নিয়ে একটি ছোটো নাটক লিখতে হবে এবং সেটির প্রযোজনা করতে হবে।

অধ্যায়

৭

স্বাস্থ্য শিক্ষা (Health Education)

৭. ভূমিকাঃ

পৃথিবীতে অন্যান্য জীবের মতই মানুষের আবির্ভাব তার সহজাত জৈব প্রকৃতি নিয়ে। সেই জৈব প্রকৃতিকে মনুষ্য প্রকৃতিতে রূপান্তর ঘটাতে হয়। জীবত্ব থেকে মনুষ্যত্বে উত্তরণের প্রক্রিয়ার অপর নাম শিক্ষা।

বৃদ্ধি ও বিকাশের দিক থেকে মানুষের শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের সময়কালে যখন শক্তি ও দক্ষতার উন্মেষ, ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশ, ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সামাজিক সত্তার সমন্বয়ের মাধ্যমে সামাজিকীকরণ ও সামাজিক গুণাবলী আয়ত্বকরার উপযুক্ত সময়। পরিকল্পিত শিক্ষার পরিবেশ, সুনির্বাচিত শিক্ষাসূচী এবং সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষকের সাহায্যে ও সহযোগিতায় তা অর্জন করতে হয়। বর্তমানে পরিকল্পিত শিক্ষাক্রমে প্রয়োজনীয় ভাব বিনিময়ের মাধ্যম, পরিমিতি বোধ ও যুক্তি বিকাশের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান, বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিজ্ঞানচর্চা, পরিবেশ পরিচিতির সুযোগ আছে তেমনই প্রয়োজন শারীরশিক্ষা, সুন্দর দেহ আর সুন্দর মনের সাধানার মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়।

‘Orandum est ut sit, means sana incorpore sauo.’ Let it be prayed that there be a sound mind in a sound body.

শারীরশিক্ষার অভিজ্ঞতায় যে সমস্ত সামাজিক গুণাবলী আয়ত্ব করা সম্ভব তা একজন ব্যক্তি মানুষকে সামাজিক ও উপযুক্ত নাগরিক হতে সাহায্য করে। সুতরাং শারীরশিক্ষা সার্বজনীন, সর্বকালের, সর্বস্তরের।

৭.১ উদ্দেশ্য ঃ

প্রাথমিক শিক্ষায় শারীরশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নাতীত। শারীরশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শুধুমাত্র আমাদের দেশেই নয় প্রত্যেকটি উন্নতিকামী দেশই শারীরশিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার অন্যতম বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছে। শারীরশিক্ষার মাধ্যমেই অনায়াসে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও চরিত্র গঠনের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে- শুধুমাত্র সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গণিতচর্চার মাধ্যমে ব্যক্তি সত্তার বিকাশের সকলগুণ আহরণ করা সম্ভব নয়- যার মাধ্যমে ব্যক্তির সুষম বিকাশ সম্ভব। কারণ, শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের পাশাপাশি তার মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশে শরীরশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শিশুর মনের বিকাশ নির্ভর করে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, খাদ্য অভ্যাস, পিতা-মাতার আচার-আচরণ, সমবয়সীদের আচার-আচরণের উপর। সুতরাং শারীরশিক্ষার লক্ষ্য হল মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটানো অর্থাৎ শারীরশিক্ষার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ—শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক দিকগুলির বিকাশ ঘটানো।

শারীরশিক্ষা ঃ

৭.২ শারীরশিক্ষা: শারীরশিক্ষার আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা হলো- শারীরিক ক্রীয়াকলাপের মাধ্যমে শিক্ষা (Education through physical activity)।শারীরশিক্ষা হল সামগ্রিক শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এটি এখন একটি প্রচেষ্টা যা শারীরিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রাক্ষেভিক দিকগুলির উন্নয়নের মাধ্যমে সামগ্রিক বিকাশ ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা।

জে.এম.উইলিয়ামসের মতে, শারীরশিক্ষা হল মানুষের সেইসব যাবতীয় শারীরিক ক্রিয়াকলাপের যোগফল যেগুলি নির্বাচিত হয় পদ্ধতি হিসাবে এবং পরিচালিত হয় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে। অর্থাৎ শারীরশিক্ষার সেইসব শারীরিক ক্রিয়াকলাপকে নির্বাচিত করা যায় যাতে অংশগ্রহণের মাধমে ব্যক্তির শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, গুণগুলির বিকাশ ঘটিয়ে ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ লাভ সম্ভবপর হয়।

চার্লস.এ.বিউকার-এর মতে, শারীরশিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার সেই প্রক্রিয়া যা নিজস্ব লক্ষ্য হল নির্বাচিত শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে মানুষের দক্ষতার উন্মেষ ঘটানো।

আজও অনেকেই শারীরশিক্ষা বলতে শুধুমাত্র ক্রীড়াচর্চা বা বিভিন্ন ক্রীড়ার ক্রীড়াশৈলী (skill) প্রকাশ করাকে শারীরশিক্ষা হিসাবে মনে করেন। এই ধারণাটি একেবারেই ঠিক নয়। অবশ্য যে-কোনো ধরণের ক্রীড়া বা খেলা শারীরশিক্ষার সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপের একটি অংশ মাত্র। আনন্দদায়ক ক্রীড়া (Recreational sport) অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অর্থাৎ শারীরশিক্ষায় লব্ধ মৌলিক ক্রীয়াকলাপের অভিজ্ঞতাকে সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ে (Excellence in sport) নিয়ে যাওয়া শারীরশিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগ।

৭.২.১ শারীরশিক্ষার লক্ষ্য ঃ

শারীরশিক্ষার মূল লক্ষ্য হল –ব্যক্তি বা মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটানো অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিত্বের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক ও বৌদ্ধিক (Intellectual) গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো। তার জন্য প্রয়োজন দক্ষ নেতৃত্বদানের মাধ্যোমে শারীরিক ক্রিয়াকলাপগুলিকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে ব্যক্তি বা দলগতভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী তৃপ্তি ও আনন্দের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ইত্যাদি গুণগুলির বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পায়।

জে.বি.ন্যাস্-এর মতে, শারীরশিক্ষা সেই পর্যায়ের শিক্ষা যাহা মূলতঃ মানবশরীরের বৃহৎ পেশীসমূহের ক্রীয়াকলাপের মাধ্যমে এবং তাহার সহিত জড়িত শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিক্রিয়া (response) দ্বারা প্রকাশ পায়।

শারীরশিক্ষায় পাঠ্যসূচীর মূল আলোচ্য প্রধানত: নির্ভর করে তার Domain গুলির উপর:

১. Psycho-motor Domain মূলতঃ স্নায়ু-পেশীর সমন্বয় স্থাপন।

২. Cognitive Domain মূলতঃ বুদ্ধি বৃত্তির উন্নয়ন সংক্রান্ত।

৩. Affective Domain ব্যবহারিক দিকগুলির উত্তরণের মাধ্যম।

তাহলে শারীর শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল: শারীরশিক্ষা হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যার নিজস্ব লক্ষ্য হল নির্বাচিত শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে মানুষের দক্ষতার উন্নতি ঘটানো।

শারীরশিক্ষার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় স্বাস্থ্য। কারণ-যে কোনো দেশের আর্থিক উন্নতি, সমৃদ্ধি ও বিকাশ নির্ভর করে সেই দেশের নাগরিকদের সুস্বাস্থ্যের উপর দেশের স্বাস্থ্য বলতে বোঝায় জনগণের স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যচর্চার উপকরণগুলি হল নিয়মিত সুষমখাদ্য, বিশ্রাম, ও ঘুমের প্রয়োজন এবং তার সঙ্গে প্রয়োজন শারীরশিক্ষার চর্চা। স্বাস্থ্য তৈরীর মাধ্যম হিসাবে শারীরশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৭.২.২ উদ্দেশ্য ঃ শারীরশিক্ষার উদ্দেশ্য :

১. সুস্বাস্থ্য লাভ

২. সুঅভ্যাস গঠন

৩. শারীরিক পটুতা অর্জন

৪. স্নায়ু ও পেশীর সমন্বয় সাধন

৫. ব্যক্তিত্বের বিকাশ

৬. জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা

৭. সামাজিকতার বিকাশ

৭.২ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য (Personal health) ঃ

শারীরশিক্ষার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়-স্বাস্থ্য। কারণ, যে কোন দেশের আর্থিক উন্নতি নির্ভর করে সেই দেশের মানব সম্পদের উপর (Human Resource)। ভারতের মতো পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশের মানব সম্পদের সঠিক ব্যবহার দেশের অর্থনীতিকে উন্নত করতে পারে। Heatlh in wealth -এই তত্ত্বটির সঠিক বিচার বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে সুস্থ ও সবল মানব সম্পদ দেশকে কোন উচ্চতার শিখরে পৌঁছাতে পারে। উদাহরণ হিসাবে আমরা বর্তমান সংযুক্ত জার্মানীর কথা উল্লেখ করতে পারি।

জনসংখ্যার বিচারে জার্মানী ছোট হলেও প্রকৃতপক্ষে মানবসম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করে উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে। শারীরিক ও মানসিকভাবে সেই দেশের নাগরিকরা অন্যান্য অনেক দেশের থেকে এগিয়ে আছে। যার মূলতত্ত্বটি নিহিত আছে স্বাস্থ্যের উপর। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, সমাজচর্চা, ক্রীড়াচর্চা সকল ক্ষেত্রেই সামগ্রিকভাবে অবস্থান অনেক দৃঢ়। সুতরাং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে।

সাধারণভাবে রোগমুক্ত (নিরোগ) শরীরের সাথে সুস্থ, সবলভাবে নিজেকে সক্রিয় রেখে মানসিকভাবে প্রয়োজনীয় করে তোলার বিষয়টি স্বাস্থ্যের অনুঘটক। যার উপাদান গুলি হল- নিয়মানুবর্তীতার ও শৃঙ্খলার সাথে স্বাস্থ্যনীতি মেনে চলার ব্যবস্থাপনাকেই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বলা হয়। বিশেষত স্বাস্থ্যের নির্ধারক বিষয়গুলি যেমন– বেঁচে থাকার জন্য সুষম খাদ্যগ্রহণ, বিশ্রাম ও নিদ্রার সামঞ্জস্য এবং তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় নিয়মিত স্বাস্থ্যচর্চার যার মূল বিষয়টি নিহিত আছে শারীরশিক্ষার বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে।

৭.২.১ স্বাস্থ্যচর্চার মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নজর দেওয়া জরুরি ঃ

শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখা ঃ ব্যক্তির সহনশীলতা, স্নায়ুপেশীর সমন্বয়, শক্তির বিকাশ, গতি, নমনীয়তা, ক্ষিপ্রতা ইত্যাদি পরিমানগত ও গুণগত বৃদ্ধির মাধ্যমে নিজেদেরকে অধিক সক্রিয় হিসাবে গড়ে তোলা।

অঙ্গের সুস্থতা ঃ এর জন্য প্রয়োজন ব্যবহৃত শারীরিক যন্ত্র ও তন্ত্রের সঠিক ব্যবহার বা প্রয়োগ ও বিশ্রামের মাধ্যমে পুনরায় কার্যকরী অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। তার সঙ্গে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের যত্ন নেওয়া। চোখ, কান, নাসিকা, ত্বক, নখ ইত্যাদির যত্ন নেওয়া অভ্যাসে পরিণত করা।

রোগমুক্ত শরীর ঃ সঠিক স্বাস্থ্যবিধি পালনের মাধ্যমে রোগমুক্ত শরীর গঠনে নিয়মানুবর্তীতা ও শৃঙ্খলার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

সাধারণ ভাবে বলা হয়ে থাকে ঃ সুস্থ শরীরে সুস্থ মন বাস করে, সাধারণত সঠিক ও পদ্ধতিগত ভাবে শরীরের কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করতে প্রয়োজন ব্যক্তির সঠিক স্বাস্থ্যবিধির। স্বাস্থ্যবিধি বলতে বোঝায় শরীরের পরিচ্ছন্নতা (Cleaninees of the body)। শরীরের উপরিতলের পরিচ্ছন্নতা ও সঠিকগঠন মানুষকে বিভিন্ন ধরণের রোগ সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে। কোন কোন ক্ষেত্রে এটিকে অবমাননা করলে কিছু কিছু অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে ওঠে। শিশুদের বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে যে অভ্যাস গড়ে ওঠে তা মূলত শৈশবকাল থেকে তৈরি হতে হতে এক ধরণের কঠিন শিখরের আকার নেয়। যা মূলত পরবর্তী সময়ে সরিয়ে ফেলা কষ্টকর। ভারতীয় Phylosophy এর রীতি অনুযায়ী এটা মানুষের সেই শরীর যার মাধ্যমে সে জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়। এই বক্তব্য মানুষকে উৎসাহিত করে থাকে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যকে সফল করার জন্য।

স্বাস্থ্যনীতির উপাদান সমূহ ঃ

১. ভালো ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাস তৈরি

২. মানবশরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথা চুল, চোখ, কান, দাঁত, নাক ও গলার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।

৩. নখ ও আঙ্গুলের পরিচ্ছন্নতা

৪. পরিচ্ছন্নতা, পরিষ্কার রাখা দরকার জামাকাপড় ও পায়ের জুতোর

৫. ভালো ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাসকে মানুষের দ্বিতীয় প্রকৃতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

৭.৪ স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Hygiene) ঃ

Hygiene is the science of health অর্থাৎ বিজ্ঞানের ফলিত নীতির উপর নির্ভর করে শারীরচর্চার মাধ্যমে রোগমুক্ত শরীর গঠন। অর্থাৎ বিজ্ঞানের যে বিশেষ জ্ঞান শারীরশিক্ষার প্রয়োগিক বিষয়কে মুক্ত করে রাখতে সাহায্যে করে তাকে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে পরিবার, সমাজের বিভিন্ন অংশকে সেই বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করাটা বিশেষ জরুরি।

'Healthy mind lives in a healthy body' এই তত্ত্বটির মাধ্যমে মানব বিকাশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের সামনে চলে আসে। সেগুলি হল-শারীরিক বিকাশ ও মানসিক সুস্বাস্থ্য।

৭.৪.১ দাঁতের সুরক্ষা (Care of the teeth) ঃ

(i) ইহা মূলত খাদ্যবস্তু চর্বনে সাহায্যে করে। সেই কারণে প্রতিদিন সকালে ও রাত্রে খাবার পর দাঁতের পরিষ্কার করা বাঞ্ছনীয়।

(ii) দাঁতের সুরক্ষায় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সুষম খাদ্যাভ্যাস। বিশেষত ভিটামিন C পুষ্ট খাদ্য বেশী করে খাবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

(iii) নরম ব্রাশ ব্যবহার করা উচিত।

(iv) দাঁতের সক্ষমতা বজায় রাখার জন্য আখ, ডাল, ছোলা, মটর, ডাঁটা জাতীয় খাবার নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখা উচিত।

(v) দাঁতের পক্ষে ক্ষতিকারক নেশা জাতীয় পানীয় ও বস্তু যথা পান, জর্দা ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নয়।

তাছাড়াও মাঝে মাঝে দাঁতের সঠিক স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। দাঁতের একটি বিশেষ রোগ পাইওরিয়া (Pyorrhoea) দেখা দিলে যা দাঁত ও পাকস্থলীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

৭.৪.২ চোখের সুরক্ষা (Care of the eyes) ঃ

চোখ মানব শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। চোখের মাধ্যমে আমরা বহির্জগতের সৌন্দয্যের রূপ কে উপভোগ করি। একজন শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ব্যক্তির শিক্ষার আধার, কর্মকাণ্ড, চেতনার বিকাশ সর্বাঙ্গিন বিকাশ ও ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই অঙ্গ সংস্থানের উপর নির্ভরশীল। তাই চোখের যত্ন নেওয়া অনস্বীকার্য। নিম্নলিখিত নিয়মগুলি চোখের সুরক্ষায় নেওয়া দরকার ঃ

(i) শিশুদের সর্বদা চোখ পরিষ্কার রাখার জন্য উৎসাহিত করা উচিত। সেই কারণে দিনে ২-৩ বার পরিষ্কার জীবানুমুক্ত জল দিয়ে চোখ পরিষ্কার করা উচিত।

(ii) শিশুদের নোংরা জিনিষের সঙ্গে চোখের সংশ্রব না রাখা দরকার।

(iii) উপযুক্ত আলোতে পড়াশুনোর মতো কাজ করা উচিত।

(iv) প্রকৃত চোখের দৃশ্যমানতার জন্য সুষম খাদ্যের তালিকায় ভিটামিন-**A** ও ভিটামিন **C** ব্যবহার করা উচিত। এগুলি হল সাধারণত দুধ, মাখন ও শাকসবজিতে পাওয়া যায়।

৭.৪.৩ কানের যত্ন (Care of the Ears) ঃ

কান হল অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবেদনশীল অঙ্গ বা শ্রবণেন্দ্রিয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে আমরা সারা পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারি। সমস্ত রকমের কথাবার্তা আমরা কানের মাধ্যমে অনুধাবন করতে পারি তার পরিবর্তে উপযুক্ত সাড়া আমরা দিয়ে থাকি। কানের মধ্যে যে যন্ত্রাংশ থাকে তার যথাযথ পরিচর্চা দরকার সবসময়। কারণ কান শরীরের নরম ও সুক্ষ্ম যন্ত্রাংশ এবং সামান্যতম আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যদি কান সর্বদা পরিষ্কার রাখা না যায় তাহলে তার থেকে বিভিন্ন রকম রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। সেই কারণে কানের জন্য বিভিন্ন রকমের স্বাস্থ্যবিধি মানা দরকার।

(i) কান নিয়মিত মেডিকেটেড বাড্ দ্বারা পরিষ্কার রাখা উচিত।

(ii) শব্দের তীব্রতার মাত্রা অনুযায়ী কানের যত্ন নেওয়া দরকার। যেমন অতিরিক্ত শব্দ সৃষ্টিকারী বিষয়গুলির থেকে ব্যক্তির দূরত্ব বজায় রাখা দরকার।

(iii) কানের সুরক্ষার জন্য স্ক্যাল-ক্যাপ Skull-cap ব্যবহার করা যেতে পরে।

(iv) শীতকালে মূলত কানের সুরক্ষার জন্য কানকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস দ্বারা ঢাকা রাখার ব্যবস্থা করা উচিত।

(v) স্নানের সময় জল সঠিকভাবে পরিষ্কার করা উচিত যাতে জল কানের মধ্যে জমতে না পারে তাহলে বিভিন্ন রকমের রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

৭.৪.৪ নখের সুরক্ষা (Care of the Nail) ঃ

নখের সুরক্ষা সুস্থ জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নখকে সাধারণত আঙ্গুলের রেক্ষাংশ বলা হয়ে থাকে। নখ সাধারণত এক বিশেষ ধরনের কলা (Tissue) দ্বারা তৈরি। নখের বৃদ্ধি প্রতিনিয়ত হতে থাকে। তাই নিয়মিত নখের অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলে নখকে পরিষ্কার রাখা উচিত। অধিকাংশ শিশুদের মধ্যেই বাল্যকাল থেকে মুখে আঙ্গুল দেওয়া ও নখ কাটার মত খারাপ অভ্যাস দেখা যায়। যার থেকে শিশুদের বিরত রাখতে হবে। সেই কারণে কিছু নিয়ম মানা বাধ্যতামূলক।

(i) খাদ্যগ্রহণের পূর্বে ও পরে হাত সাবান দিয়ে পরিষ্কার রাখা উচিত। সম্ভবহলে চামচ দিয়ে খাবার অভ্যাস তৈরি করাতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

(ii) নখের প্রতিনিয়ত সাবান দিয়ে পরিষ্কার ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত নখের অংশ কেটে ফেলা উচিত। অন্যকোন সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

৭.৪.৫ নাকের সুরক্ষা (Care of the Nose) ঃ

নাক মানবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইন্দ্রিয় যার মাধ্যমে ঘ্রান নেওয়া হয়। নাক সবসময় পরিষ্কার রাখা দরকার। নাক আমাদের স্বাস-প্রয়াসের একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নাক সঠিকভাবে পরিষ্কার না করা হলে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। সাধারণত শিশুদের Chest congesation হলে নাক সবসময় পরিষ্কার রাখা উচিত বিভিন্ন ধরনের নাকের ঔষধ দিয়ে (Nasal drop)। নাকের সুরক্ষার জন্য কিছু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা উচিত।

(i) প্রতিদিন ৩-৪ বার মুখ ও নাক পরিষ্কার জল দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত।

(ii) পরিষ্কার রুমাল ব্যবহার করা উচিত।

(iii) বিভিন্ন ধরনের আসনের (Yogasana) মাধ্যমে যথা পদ্মাসন, বক্রাসন, ও প্রাণায়ামের মাধ্যমে শ্বাস প্রশ্বাসের সঠিক রীতি রপ্ত করা।

(iv) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধুমপানের থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা উচিত।

(v) নাকের ময়লা পরিষ্কারের নির্দিষ্টি নিয়ম মেনে হাল্কাভাবে নাকের উপর চাপ দিয়ে নাক পরিষ্কার করা উচিত। প্রয়োজনে পরামর্শ নেওয়া দরকার।

৭.৪.৬ Care of clothing and bathing :

আমাদের দেশে মৌসুমী বায়ুর পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন ঋতুর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। সেই ঋতু পরিবর্তনের উপর আমাদের পোশাকও পরিবর্তিত হয়। ফলতঃ ঋতু পরিবর্তনের নিরিখে আমাদের গ্রীষ্মকাল, শীতকালে ভিন্ন ভিন্ন পোষাক পরিধান করতে হয়।

পোষাকের ব্যবহারে একদিকে যেমন আমাদের সৌন্দর্যের প্রকাশ পায় তেমনই ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে সুনিশ্চিত করে। কিন্তু পোষাক সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের কাজের পেশাগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পোষাক নির্ধারণ করা উচিত। তা না হলে কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তির কর্মকুশলতা প্রকাশে অসুবিধা হয়। এক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মানা উচিত।

(i) পেশাগত বৈশিষ্ট্য ও ঋতু বৈষম্য অনুযায়ী পোযাক পরিধান করা উচিত।

(ii) শিশুদের সবসময় অন্তর্বাস পরিষ্কার রাখতে উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়া উচিত- তা না হলে বিভিন্ন জীবাণুর সংক্রমণ হতে পারে।

(iii) হালকা ও নরম সাবান দিয়ে পোশাকগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করা উচিত।

(iv) সাধারণত বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শৈশব থেকেই শিশুদের আরামদায়ক ও আঁটোসাঁটো না হয় এমন পোষাক পরানো উচিত। রাত্রে শোয়ার সময় হাল্কা পোষাক পরা উচিত।

পোষাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণত প্রতিনিয়ত পরিষ্কার জলে দিনে অন্ততঃ দুবার স্নান করা উচিত। বিশেষতঃ কোন কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পর হাত ও পা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা উচিত যাতে বিভিন্ন ধরনের রোগের সংক্রমণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

৭.৫ Chart for Communicable diseases and its Prevention :

সংক্রামক ব্যধির তালিকাসমূহ ও তার সুরক্ষা ঃ

যে সকল রোগ সংক্রামিত ব্যক্তির (affected person) দেহ হতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শারীরিক সংস্পর্শ বা অন্য কোন মাধ্যম দ্বারা সুস্থ মানুষের দেহে সংক্রামিত হয় তাকে সংক্রামক ব্যধি বলা হয়। মাধ্যমগুলি মানুষ থেকে মানুষের মধ্যে, পশু থেকে মানুষের মধ্যে, পশু থেকে পশুতে বা পরিবেশের বিভিন্ন মাধ্যমে (জল, বায়ু) এবং বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ দ্বারা সংক্রমিত রোগ জীবাণুর প্রকাশ পায়।

উদাহরণ হিসাবে উন্নতশীল দেশের মধ্যে একসময় ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা, প্লেগ ইত্যাদি রোগের সংক্রমণ ছিল উল্লেখ করার মতো। বর্তমানের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও শিক্ষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সংক্রামিত রোগ থেকে সুরক্ষার বিভিন্ন ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়েছে। যেমন প্রতিনিয়ত সংক্রামিত রোগ সংক্রান্ত তথ্য জনসমাজে প্রচার ও পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার কাজ চলছে। বিভিন্ন স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও NGO-গুলি স্বাস্থ্যচর্চার বিভিন্ন বিষয়ে মানুষকে সচেতনতার বিহিত ফল লাভ করেছ।

তথাপি সংক্রামিত রোগের সংক্রমণ একেবারেই বন্ধ করা যায়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এদের সংক্রমণ দেখা দিলেও তা পূর্বের মতো মহামারির আকার নিতে পারে না। এক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে তৈরি হওয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে স্থানীয় সরকারের (Local Government) প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মানুষকে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য করে।

৭.৫.১ সংক্রমণের মাধ্যম ও মাত্রা ঃ

সংক্রমণের মাধ্যম ও মাত্রাকে তিনভাগে ভাগ করা যায় —

(i) দ্রুততার সাথে সংক্রমণ (Fast Spreading) – কলেরা, আন্ত্রিক, প্লেগ, বসন্ত

(ii) মধ্যমাত্রার সংক্রমণ (Medium Spreading) – ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা

(iii) দীর্ঘদিনের সংক্রমণ (Long term Infection) – হুপিং কাফ, কাশি

৭.৫.২ সংক্রমণের পদ্ধতি ঃ

1. **প্রত্যক্ষ কারণ ঃ** সরাসরি সংক্রামিত ব্যক্তির থেকে সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রমণের জন্য শারীরিক সংস্পর্শ যেমন : শারীরিক যৌন সম্পর্ক, চুম্বন, অনেক ক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রক্তদানও এর কারণ হতো। কিন্তু বর্তমানে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে এবং সংক্রামিত দেহের ব্যবহৃত niddle or syringe (Use and Throw System) ব্যবহার শেষে ধ্বংস করার পদ্ধতি চালুর ফলে সংক্রমণ কমেছে।

2. **পরোক্ষ কারণ ঃ**

   (i) মশা, মাছি, আরশোলা, পোকামাকড়, ইঁদুর, ছুঁচো ইত্যাদির মাধ্যমে রোগ সংক্রামিত হয়।

   (ii) বায়ুবাহিত মাধ্যম ঃ সাধারণভাবে ঋতু পরিবর্তনের খামখেয়ালীপনার উপর বায়ুবাহিত রোগের সংক্রমণ মাত্রা পরিলক্ষিত হয়। আবহাওয়ার হঠাৎ হঠাৎ পরিবর্তন জীবাণুগুলিকে শক্তিশালী করে তোলে। আমরা জানি যে, অধিক তাপমাত্রায় জীবাণুগুলি সাধারণতঃ ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। যেমন – নিউমোনিয়া, সর্দি, কাশি, কফ ইত্যাদি রোগ ছাড়াও হালকা মাত্রায় চিকেন পক্স, ইনফ্লুয়েঞ্জা আমাদের মতো দেশে প্রায়শই দেখা যায়।

(iii) জলবাহিত রোগ ঃ জল বা তরল বাহিত রোগের মাধ্যম হিসাবে জল, দুধ, শাক সবজীতে ব্যবহৃত অতিরিক্ত জল, কাঁচাফল ঢাকা না দিয়ে রাখা বিষয়গুলি খুবই জরুরী। যেমন – ডাইরিয়া, কলেরা, হেপাটাইটিস, আর্সেনিক সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগ ইত্যাদি।

৭.৫.৩ Mode of transmission : (মাধ্যম)

(i) সরাসরি সংক্রমণ (Direct Contact)

(ii) বায়ুবাহিত সংক্রমণ (air-borne disease)

(iii) জলবাহিত সংক্রমণ (water-borne disease)

(iv) Dropht

(v) Biting of animals

(vi) Dead animals (infected)

৭.৫.৩ Prevention :

প্রতিরোধ :

(i) Identification of disease, its source, controlling, its treatment

(ii) Notification from the health related public organization or NGO's

(iii) Isolation of the patient for further spreading of disease

(iv) Treatment

(v) Immunization

(vi) Investigation of the cause

(vii) Public health

(viii) Health awareness regarding specific disease

৭.৬ Preparation for Charts for School Health Programme—Campus Cleaning

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচী একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা যা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সঠিকভাবে সাধিত করতে সাহায্য করে। বিদ্যালয় শিক্ষায় মূলতঃ শিশু-কিশোরের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। শিক্ষার যে মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গিন বিকাশ তা মূলতঃ নির্ভর করে শিশু-কিশোরের চেতনার বিকাশ, সঠিক শিক্ষাদান পদ্ধতি, বাড়ির পরিবেশ, স্কুলের পরিবেশ তথা স্বাস্থ্য কর্মসূচী এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও Peer group আচার-আচরণ ইত্যাদির উপর। স্কুলের পরিবেশ বলতে শুধু বিদ্যালয় ভবনটিকে বোঝা না। তার সাথে সাথে বিদ্যালয়ের নানাবিধ সুবিধা : যেমন শৌচালয়ের ব্যবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, সাপ্তাহিক বা মাসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি স্কুলের আদর্শ অবস্থানকে সূচিত করে। ইহা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিবেশ নির্মল ও পরিচ্ছন্ন, বায়ু-জল-শব্দ দূষণ, শ্রেণীকক্ষের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার সঠিক ব্যবস্থা, আলো-বাতাসের উপস্থিতি, পানীয় জলের ব্যবস্থা, খেলার মাঠ বিদ্যালয়ের পরিবেশকে যথেষ্ট উচ্চমাত্রায় পৌঁছাতে সাহায্য করে।

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচী বলতে যাহা বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত শিশু বা কিশোরের খাদ্য বা পুষ্টি, পরিচ্ছন্নতা, ব্যায়ামের সুযোগ সৃষ্টি, বিশ্রাম, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা রোগ সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের চিত্রকে আলোকিত করে এবং যাহা পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য আহরণে সমর্থ হয়।

বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচীকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় :

(i) স্বাস্থ্য পরিষেবা

(ii) স্বাস্থ্য পরামর্শ বা নির্দেশ

(iii) স্বাস্থ্য পরিদর্শন

৭.৬.১ স্বাস্থ্য পরিষেবা ঃ

1. বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল স্বাস্থ্য পরিষেবা। যা মূলত নির্ভর করে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে। সেই কারণে বিদ্যালয়ে সম্ভব হলে চিকিৎসক, সেবিকা বা স্বাস্থ্য সহায়ক নিয়োগ করা হয়। যারা ছাত্র-ছাত্রীদের Maturity অনুযায়ী স্বাস্থ্য পরিষেবা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উপদেশ দান করে। সংক্রামক ব্যাধির কারণ, প্রতিরোধের ব্যবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা, দ্বিপ্রাহরিক আহারের (Mid-day Meal) ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা যায়। শিশুদের স্বাস্থ্যের মূল্যায়ণের জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য কার্ড -এ সেই সমস্ত বিষয় নথিভূক্ত করার দায়িত্ব নিতে হবে। তাতে ছাত্রদের স্বাস্থ্য সূচকের বিষয়গুলি (Health History) এক নজরে সামনে আনা যায়।

২. পরিচ্ছন্ন খেলার মাঠ, গ্রন্থাগার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের তারতম্য অনুসারে দক্ষিণ দিক খোলা শ্রেণীকক্ষ হওয়া প্রয়োজন।

৩. আসবাবপত্র : পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত শ্রেণীকক্ষের পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা, যাতে ধূলো বালি জমতে না পারে।

৪. পানীয় জল : বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজনে সরকারি জল সরবরাহ কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। কারণ বর্তমানে অনিয়ন্ত্রিতভাবে মাটির নিচের জল তোলার ফলে আর্সেনিক সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে।

৫. শৌচালয় ও স্নানাগার : পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৬. ডাস্টবিন : বিদ্যালয়ের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য যত্রতত্র খাবারের অংশ, কাগজপত্র ইত্যাদি ফেলা বন্ধ করতে হবে। এই কারণে সম্ভব হলে প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষের পার্শ্ববর্তী কোন জায়গায় ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. পরীক্ষাগার, ফার্ম ও ওয়ার্কসপ্ : এগুলি বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের মতো প্রতিদিন পরিষ্কার করতে হবে। পরীক্ষাগারে রাসায়নিক দ্রব্য রাখার জন্য সুরক্ষিত ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং পরীক্ষাগার ব্যবহারের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮. অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র : সম্ভব হলে স্কুলের অভ্যন্তরে অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা নিকটবর্তী অগ্নি-নির্বাপক কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হবে।

৭.৬.২ 2. স্বাস্থ্য পরামর্শ বা নির্দেশ ঃ

যে কোন বিদ্যালয়ে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে স্বাস্থ্য শিক্ষাদান এবং ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তত্ত্বের ও নিয়মাবলীর তাৎপর্য এবং স্বাস্থ্যসম্মত আচার-আচরণ ও সুঅভ্যাস গড়ে তোলাকে স্বাস্থ্য পরামর্শ বা নির্দেশ বলা হয়।

উদাহরণ হিসাবে সংক্রামক ব্যাধির সংজ্ঞা, তার প্রতিরোধ, ব্যায়ামের উপকারিতা, ঔষধের ব্যবহার, খাদ্য ও পুষ্টি, ড্রাগ সম্বন্ধে ধারণা প্রদান এবং সর্বশেষে প্রাথমিক প্রতিবিধানের যথাযথ ও সঠিক ধারণা প্রদান করা স্বাস্থ্য পরামর্শের উদ্দেশ্য। বিদ্যালয়ের চিকিৎসক বা শিক্ষক মহাশয়গণ এবং স্বাস্থ্যবিদ্যা সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই দায়িত্ব পালন করবেন।

৭.৬.৩ 3. স্বাস্থ্য পরিদর্শন ঃ

কোন কাজ বা পরিকল্পনা সঠিকভাবে (Health Supervision) পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করাকে স্বাস্থ্য পরিদর্শন বলা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুলের পরিচালনা সংস্থার (Inspector of Schools) সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে জেলা বা ব্লক স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবা সংস্থার (Govt. Hospital) সাহায্যও নেওয়ারও ব্যবস্থা করতে পারেন। এর জন্য সরকারী সকল সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়।

সরকারী বিদ্যালয়গুলির স্বাস্থ্য পরিষেবা কর্মসূচীকে আরোও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বিদ্যালয়গুলিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে বিদ্যালয়গুলি স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিভাবকদের পরামর্শে স্কুলের অভ্যন্তরেই স্বাস্থ্য টীকা কর্মসূচীর ব্যবস্থা করতে পারেন।

৭.৭ Campus Cleaning :

বিদ্যালয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশের মাধ্যমে শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ। এই উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে হলে প্রয়োজন বিদ্যালয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। মূলতঃ শিশুরা বা ছাত্র-ছাত্রীরা দিনের অধিকাংশ সময়টা স্কুলে উপস্থিত থাকে। সেই কারণে বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা জরুরি। সেই কারণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নজর দেওয়া বাঞ্ছনীয়ঃ

(i) বিদ্যালয়ের অবস্থান ঃ নির্মল পরিবেশ, বায়ু দূষণ ও শব্দ দূষণ মুক্ত পরিবেশ হওয়া প্রয়োজনীয়।

(ii) বিদ্যালয়ের গৃহ ঃ শ্রেণীকক্ষে যথেষ্ট জায়গা থাকা দরকার। পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

৭.৭.১ স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা (Sanitation) ঃ

সাধারণভাবে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে যথেষ্ট পরিমাণে বা সংখ্যায় শৌচাগার (Urinal & Latrine) ও স্নানাগারে যথেষ্ট পরিমাণেয় জলের সরবরাহ থাকা উচিত। এখন আমাদের দেশে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শৌচাগার ও প্রস্রাব করায় পৃথক জায়গা নেই। আবার থাকলেও তা অস্বাস্থ্যকর ও অপরিষ্কার। এমনকি অনেক বিদ্যালয়ের জল সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। সুতরাং অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন শৌচাগার বিদ্যালয়ের পরিবেশ অধিক মাত্রায় দূষিত করে। গ্রামাঞ্চলে যে সকল স্কুলে সুলভ শৌচালয় নেই বা মলমূত্র ত্যাগ করার জায়গা নেই-যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করে সেখান থেকে তারা বিভিন্ন রোগের শিকার হয়ে থাকে।

এই ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষ অনেকে নিজ দায়িত্বে সুলভ শৌচালয়ের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন রাজ্যের প্রাথমিক ও এলিমেন্টারি স্কুলে সুলভ শৌচালয় বাধ্যতামূলক করিয়াছে এবং আর্থিক সাহায্য দেওয়া শুরু করেছে। শিক্ষক মহাশয়দের নিজ দায়িত্বে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বা Personal hygine সম্বন্ধে সম্যক ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হয়েছেন। সাবান দিয়ে হাত-পা ধোয়া ইত্যাদি এখন অভ্যাসে পরিণত করা হয়েছে।

1. বায়ুদূষণ : বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী স্থানে গাড়ি চলার ফলে তার নির্গত কার্বন অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে কার্বন মনো-অক্সাইড গ্যাস তৈরি করছে যা ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকারক। নিকটবর্তী কল-কারখানা থেকে বিভিন্ন গ্যাস প্রতিনিয়ত নির্গত হয়। এই সকল গ্যাস বায়ুকে দূষিত করে- যার থেকে শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগ, হাঁপানী, ফুসফুসের ক্যান্সার ইত্যাদি ভয়ঙ্কর রোগ দেখা দিচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে গাড়ির দূষণ শংসাপত্র দেওয়া শুরু হয়েছে যাতে বায়ুদূষণ কম হয়। স্কুলের পরিমন্ডলের চারপাশে গাড়ির যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

2. শব্দদূষণ : শহরের বিভিন্ন স্থানে শব্দদূষণ সর্বাধিক। রাস্তাঘাটে, গাড়ির অতিরিক্ত হর্ন বাজানো, কলকারখানার আওয়াজ, বাজি ফাটার শব্দ, বোমের শব্দ ও রেডিও, টিভি ও মাইক্রোফোনের শব্দ 65 ডেসিবেল ছাড়িয়ে শব্দকে প্রতিনিয়ত দূষিত করছে। যা প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক পরিবেশকে নষ্ট করছে ও প্রতিনিয়ত ও দীর্ঘকালীনভাবে এই অসুবিধার কারণে শ্রবণেন্দ্রীয় জনিত বিভিন্ন রোগ দেখা দিচ্ছে। বর্তমানে বনসৃজন প্রকল্পের মাধ্যমে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শহরের জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক পুস্তিকা বিলি করা হচ্ছে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় মানুষ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আর সমস্যায় না পড়ে। পুলিশ বিভিন্ন উৎসব চলাকালীন বিভিন্ন শব্দবাজীর ব্যবহারের উপর নজরদারী শুরু করেছে। এইভাবে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

3. জলদূষণ : গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন নালা-নর্দমার (খোলামুখ) সাথে বিভিন্ন জলাশয়ের সংযোগ থাকে। যার মাধ্যমে জলাশয়ের জল দূষিত হয়। বর্তমানে কৃষিকার্যে উন্নত বীজের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের Pesticides/রাসায়নিক সার ও ঔষধ ব্যবহার করার ফলে উচ্চ ফলনের সঙ্গে সঙ্গে কীট-পতঙ্গ থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই সমস্ত সার ও ঔষধ মাটির উপর পড়ে থাকে এবং পরবর্তীতে বৃষ্টির জলে বা কোনভাবে জলের সঙ্গে মিশে ঐ জলকে দূষিত করছে যা পরোক্ষভাবে নদী ও নালার জলকেও দূষিত

করছে যাহা পরোক্ষভাবে নদী ও নালার জলকেও দূষিত করছে। জলদূষণের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার এখন PHE নামক সরকারি সংস্থা মাটির গভীর থেকে জল তুলে পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করছে। তাছাড়াও জনসাধারণকে সবসময় জল ফুটিয়ে খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যাতে জলবাহিত রোগ যথা- কলেরা, আন্ত্রিক ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৭.৮ Special Activities (Physically Challenged Children) ঃ

অভিযোজিত শারীরশিক্ষা : Adapted Physical Education ঃ

জন্মগতভাবে বা কোন তাৎক্ষণিক ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ শিশু বা কিশোরের সর্বাঙ্গিন বিকাশের লক্ষ্যে এই বিশেষ তত্ত্বটি শিক্ষার আঙ্গিনায় এসেছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নতির বিচারে এখনও আমরা অনেক শিশুকেই সুস্থ জীবনদানে ব্যর্থ। সুতরাং তাদের সর্বাঙ্গিন বিকাশের লক্ষ্যে এবং তাদের মধ্যে যাতে কোন অবসাদগ্রস্ত অবস্থা তৈরি না হয় তার স্বার্থে অভিযোজিত শারীরশিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। অভিযোজিত শারীরশিক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিশু-কিশোরের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও পরিস্ফুটনের লক্ষ্যে তাদের সক্ষমতার বিচারে শারীরিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা — এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

সাধারণভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে সমস্যামুক্ত শিশু বা কিশোর একটি স্বাভাবিক শিশু বা কিশোর তুলনায় কম সক্ষম। অর্থাৎ যে সমস্ত শিশু স্বাভাবিকভাবে কথা বলা, অঙ্গ সঞ্চালনে অক্ষম, মানসিকভাবে ও নানাবিধ আচরণের প্রকাশে অসমর্থ তাকে শারীরিক প্রতিবন্ধী বলা হয়।

সাধারণত বিকলাঙ্গতার মাত্রা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশেষ শিশু বা কিশোর'-কে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

(1) Physically handicapped : শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী

(2) Hearing impaired : শ্রবণজনিত প্রতিবন্ধকতা

(3) Visually impaired : দৃষ্টিজনিত প্রতিবন্ধকতা

(4) Mentally Retarded : মানসিক প্রতিবন্ধী

(5) Cerebral Palsy : মস্তিষ্ক ও স্নায়ু সঞ্চালনজনিত প্রতিবন্ধী

৭.৮.১(i) শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী (Physically handicapped) ঃ মৌলিক অঙ্গসঞ্চালনে (Fundamental movement) অক্ষম প্রতিবন্ধী শিশু বা কিশোরদের শারীরিক প্রতিবন্ধী বলে। শারীরশিক্ষার কর্মসূচী যেমন – Wheel-Chair Table Tennis, সাঁতার, দাবা, ক্যারাম, টুইন বাস্কেটবল ইত্যাদি দেওয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া নাচ, গান, নাটক, হাতের কাজ ও মাটির কাজ ইত্যাদি।

৭.৮.২(ii) শ্রবণজনিত প্রতিবন্ধকতা (Hearing Impaired) ঃ সাধারণভাবে বংশগত কারণ, জন্মগত কারণ, অপুষ্টি ইত্যাদি কারণে জন্মকাল থেকে Hearing impaired শিশুদের পরিচর্চা করা দরকার। দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবন্ধকতার বৈশিষ্ট্য ও মাত্র অনুযায়ী বাস্কেটবল, ফুটবল, ক্রিকেট, অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার ইত্যাদি খেলা শেখানো যায়। তবে সাধারণভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত শারীরশিক্ষার শিক্ষক এক্ষেত্রে বিভিন্ন রঙের পতাকা বা সংকেতের মাধ্যমে তাদের খেলা পরিচালনা করে থাকেন।

৭.৮.৩(iii) দৃষ্টিজনিত প্রতিবন্ধকতা (Visually Impaired) ঃ সাধারণত: শ্রবণজনিত প্রতিবন্ধকতা যে কারণে ঘটে থাকে এক্ষেত্রে তা visual impaired এর ক্ষেত্রে দেখা যায়। প্রাণায়ম, যোগাসন, যোগমুদ্রা, সংগীত ইত্যাদি করানো হয়। তাছাড়াও শব্দ সৃষ্টিকারী ও থ্রোবল পরিবর্তিত নিয়মে করানো হয়।

৭.৮.৪(iv) মানসিক প্রতিবন্ধী (Mentally Retarded) ঃ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী মৌলিক অঙ্গ-সঞ্চালন, গতি-সংক্রান্ত, কৌশল রপ্ত করানো, ফুটবল, সাঁতার, প্রাণায়ম, যোগাসন, Picnic, camping ইত্যাদি কর্মসূচী তাদের করানো যায়।

৭.৮.৫(v) মস্তিষ্ক সঞ্চালন ও স্নায়ুপেশীর সঞ্চালনজনিত সমস্যা (Cerebral Palsy) ঃ শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানো, মৌলিক

অঙ্গ সঞ্চালন রপ্ত করানো, নিজের সম্বন্ধে ধারণা তৈরি করা, Breathing exercise-এর জন্য ব্যায়ম ও প্রাণায়াম ও দলগত খেলার অংশগ্রহণে সুযোগ দেওয়া।

Good habits for maintenance of posture-sitting on the floor, chair, desk, during reading, standing, walking, stair climbing, picking up an object from the floor.

Posture is the indicator of one's personality – তার অর্থ কোন ব্যক্তির দেহভঙ্গিমা তার ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। চিকিৎসক Posture বলতে Musculo-skeletal structure কে বোঝান। তেমনি কোন আর্টিস্ট বা কলা বিশারদের কাছে তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও আবেগের বহিঃপ্রকাশকে বোঝেন। শারীরশিক্ষাবিদরা Posture বলতে শারীরিক, সামাজিক, মানসিকদিক থেকে উন্নত এবং যে কোন কাজে তার পারদর্শিতার প্রকাশকে সূচিত করে।

দেহভঙ্গিমা বলতে কোন ব্যক্তির কোন একটি বিশেষ অবস্থার সাপেক্ষে দেহের অবস্থান, হাঁটা বা দাঁড়ানোর অবস্থান, শরীরের ওজনকে সঠিকভাবে বহন করার ব্যবস্থাপনাকে বোঝায়। কারণ স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষার চর্চার ক্রীড়াশৈলী হল সেই জিনিসটি যাহা একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খেলোয়াড় সবচেয়ে কম শক্তি (energy) খরচ করে তার শৈলীকে প্রকাশ করতে পারে।

Performance in the process of manoeuvreing certain action with minimal expenditure of energy. সুতরাং শারীরশিক্ষায় দেহভঙ্গিমা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

শারীরিকভাবে ব্যক্তি মানুষ কোন অবস্থার সাপেক্ষে সহজেই দেহের অঙ্গ সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন তাকেই সুস্থ ও সবল দেহভঙ্গিমা বলা হয়। অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ অবস্থার সাপেক্ষে কোন ব্যক্তির দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থান, হাঁটা, দৌড়ানো, লাফানো ইত্যাদি বিষয় সহজেই প্রকাশ করতে পারেন। কারণ সঠিক দেহ-ভঙ্গিমা মুক্ত মানুষের গোটা শরীরের উপর চাপকে (Stress) সুচারু রূপে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর আনতে পারে। ফলতঃ কোন বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

বসার ভঙ্গিমা ঃ সাধারণভাবে বসায় সময় শরীরের ওজন সমভাবে বহন সহায়ক (উরু ফলকের) অঙ্গের উপর আনতে হবে। পা দুটিকে 90° কোণে মাটির নীচে স্থাপন করতে হবে। শিরদাঁড়া (Spinal Cord) সোজা রেখে চেয়ারের হাতলের উপর হাত দুটিকে রাখতে হবে। মাথা এমনভাবে রাখতে হবে যাতে গলা ও ঘাড়ের উপর বেশী চাপ না পরে।

পড়াশুনোর সময় চেয়ার-টেবিল ব্যবহার করলে ভালো হয়। বাড়িতে তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। সাধারণত ডেস্কের উপর শরীরের থেকে ন্যূনতম ৮-১২ ইঞ্চি দূরে বই রাখতে হবে।

দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা : দাঁড়ানোর সময় শরীরের ওজনকে সমানভাবে দুই পায়ের উপর রাখতে হবে। এক্ষেত্রে Base of Support সঠিকভাবে দুই পায়ের মধ্যে ব্যবধানের উপর নির্ভর করে। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কাজ থাকলে মাঝে মধ্যে পায়ের বুড়ো আঙুলটিকে মাঝে মধ্যে নাড়াতে হবে। নচেৎ কোন সময় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মাঝে মধ্যে হাতের মুভমেন্ট করতে হবে।

হাঁটার ভঙ্গিমা : হাটার ক্ষেত্রে Heal-Ball-Toe এই পদ্ধতিতে হাঁটতে হবে। শিরদাঁড়া সোজা থাকবে ও দৃষ্টি দূরে থাকবে। যাতে ঘাড় ও গলার উপর চাপ না করে। বুক উচিয়ে (Chest-up) রাখতে হবে।

শোয়ার ভঙ্গিমা : শোয়ার ভঙ্গিমায় সাধারণভাবে সবাসনের মতো মুখ আকাশের দিকে থাকা উচিত। কারণ বাতাস নিতে সুবিধা হয়। যদি বিশ্রামের বা ঘুমানোর সময় অধিক রক্ত চলাচল হয় পেটের অঞ্চলে। মস্তিস্কে রক্ত চলাচল তুলনামূলকভাবে কম হয়। পাশ ফেরার সময় সম্ভব হলে ডানদিকে ঘুরে শোয়া যেতে পারে। যাতে বাঁদিকে হৃৎপিন্ডের উপর চাপ তৈরি না হয়।

৭.৯ Body Mass Index (BMI) : মানুষের শরীরের সঠিক বৃদ্ধি সূচিত করে তার উচ্চতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি ও তার সাথে সাথে তার মাংসপেশীর গুণগত বিকাশে। BMI কথাটি দ্বারা শিশুর সঠিক বৃদ্ধির চিত্রকে প্রকাশ করা যায়। অর্থাৎ বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের উচ্চতা ও শরীরের ওজন বৃদ্ধি পায়। যা মূলত নির্ভর করে তার খাদ্যাভাষ (Nutrition সমৃদ্ধ খাদ্য), বিশ্রাম ও নিদ্রা ও শারীরিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের মাত্রার উপর।

সুতরাং বৃদ্ধির সঙ্গে বিকাশের (Growing along with development) সামঞ্জস্য বিধান করা স্বাস্থ্যচর্চার বিশেষ পাঠ্যসূচী। বৃদ্ধি ও বিকাশের সামঞ্জস্য শিশুর সুস্বাস্থ্যের দিককে সূচিত করে।

$$\text{BMI} = \frac{\text{Weight}}{\sqrt[2]{\text{Height}}}$$

BMI সূচকের মাধ্যমে বৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে শিশুর শরীরের অতিরিক্ত মেদের সম্বন্ধেও ধারণা করা যায়। সাধারণভাবে BMI 18 এর নিচে হলে সেই শিশুকে underweight বলা হয়। 18-24 হলো স্বাভাবিক ও 24 এর উপর তুলে overweight ও 30 এর উপর হলে মোটা বা স্থূল বলা হয়।

৭.১০ বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সুযোগ সুবিধা (Facilities) ঃ

সাধারণভাবে প্রত্যেক বা অধিকাংশ বিদ্যালয়ের খেলার প্রমাণ সাইজের মাঠ আছে। প্রমাণ সাইজের মাঠ বলতে যে মাঠে 400 মিঃ দৈর্ঘ্যের Athlethic Track markings করা যায়। ধরাযাক একটি 400 মিঃ দৈর্ঘ্যের ট্রাকের প্রয়োজন আছে। সেই কেমনভাবে তৈরি করা হয়।

ট্রাকের একটি নির্দিষ্ট অংশ (2/5 অংশ) সরলরেখায় (Straight) দৌড়াতে হয় এবং বাকী অংশ curve এ দৌড়াতে হয়। গাণিতিক নিয়মে তার বিশ্লেষণ করা হল ঃ

<u>400 mtr. Track</u>

$$\text{Straight} = \frac{2}{5}\text{th of Total Track distance}$$

$$= \left(\frac{2}{\cancel{5}} \times \overset{80}{\cancel{400}}\right) \text{mtr.}$$

$$= 160 \text{ mtr.}$$

$$\text{Curve} = (400 - 160) \text{ mtr বা } \frac{3}{5}\text{th of the track distance}$$

$$= 240 \text{ mtr.}$$

আমরা Straight কে Calculation এর সুবিধার জন্য 158 mtr নিলাম ও curve area কে 242 নিলাম।

$$2\pi r = 242$$

$$\therefore r = \frac{242}{2 \times \pi}$$

$$= \frac{\overset{11}{\cancel{\overset{121}{\cancel{242}}}} \times 7}{\cancel{2} \times \underset{2}{\cancel{22}}} = \frac{77}{2} = 38.50 \text{ mtr.}$$

Curve radius = 38.50 mtr.

কিন্তু যখন একজন খেলোয়াড় চক্রাকার পথে দৌড়ায় তখন যে চুনের দাগ (markings) বড়াবড় দৌড়াতে পারে না। সেই 10 cm বাদ দেওয়া হয় curve radius এবং আরো 20 cm বাদ দেওয়া হয় raised boarder এর জন্য। সুতরাং actual marking radius হল ঃ (38.50 – .30) mtr

= 38.20 mtr

এখন সাধারণভাবে 400 mtr track এর ক্ষেত্রে 8টি লেন (Lane) ব্যবহার করা হয়।

সুতরাং এখন যদি বলা হয় যে 8টি লেন সহ 400 mtr Track তৈরি করার জন্য দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের দিকে কতটা জায়গা প্রয়োজন।

$$\text{Length} = \left(\frac{1}{2} \times 158 \text{ mtr}\right) + (2\times38.20) + (2\times8\times1.22)$$

$$= 79 + 76.40 + 19.52 = 174.92 \text{ mtr.}$$

$$\text{Breadth} = (174.92 - 79) \text{ mtr}$$

$$= 95.92 \text{ mtr.}$$

(2) Stagger distance বার করার নিয়মাবলী ঃ

$$2\pi\{w(n-1) - .10\}$$

$$= 2\pi\ \{1.22\ (1-1) - .10\}$$

$$= 2 \times \frac{22}{7}\ \{(1.22\times0) - .10\}$$

$$= \frac{44}{7} \times 0$$

$$= 0 \text{ (First Lane Stagger distance)}$$

[এখানে :

$\pi = \frac{22}{7}$

w = Width of the lane = 1.22 mtr

n = Lane number [1........8]

2nd Lane এর জন্য :

$$2\pi\{w(n-1) - .10\}$$

$$= 2 \times \frac{22}{7}\ \{1.22\ (2-1) - .10\}$$

$$= \frac{44}{7} \times \{(1.22 - .10\}$$

$$= \frac{44}{7} \times 1.12$$

$$= 44\times.16 = 7.04 \text{ mtr}$$

Relay Race এর প্রত্যেকটি Changing Zone marking এর জন্য নিম্নলিখিত সূত্র ব্যবহার করা হয় (400 mtr track এর ক্ষেত্রে)

$$\text{1st Zone : } \frac{\text{TCD} - \text{DCPR}}{\text{TCD}} \times \text{Full Stagger (2nd Lane)}$$

$$= \frac{240 - 100}{240} \times 7.04$$

$$= \frac{\overset{7}{\cancel{140}}}{\underset{12}{\cancel{240}}} \times 7.04$$

$$= 4.10 \text{ mtr.}$$

$$\text{2nd Zone : } \frac{\text{TCD} - \text{DCPR}}{\text{TCD}} \times \text{Full Stagger}$$

TCP = 240 mtr

DCPR = 120 mtr

$$\text{3rd Zone : } \frac{\text{TCD} - \text{DCPR}}{\text{TCD}} \times \text{Full Stagger}$$

TCD = 240 mtr

DCPR = 220 mtr

অধ্যায় ৮

প্রাথমিক প্রতিবিধান (First Aid)

৮. প্রাথমিক প্রতিবিধানে ধারণা ঃ

কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনায় ডাক্তার আসার আগেই আহত বা অসুস্থ ব্যক্তির জীবনরক্ষায় আশেপাশের ব্যক্তিরা যে সাহায্য করে থাকেন তাকেই বলা হয় প্রাথমিক প্রতিবিধান। মনে রাখতে হবে, যে ব্যক্তি প্রাথমিক চিকিৎসা করবেন তাকে সে ব্যাপারে দক্ষ হতে হবে অন্যথায় রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হবে এমনকি জীবন সংশয় পর্যন্ত হতে পারে। প্রাথমিক প্রতিবিধানের প্রধান উদ্দেশ্য হল—(a) অসুস্থতার প্রকৃতি ও তীব্রতা নির্ণয় (b) প্রাথমিক চিকিৎসার ধরণ ও পদ্ধতি নির্ধারণ (c) আহত বা অসুস্থ ব্যক্তিকে নিরাপদে দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তরণ। একজন প্রাথমিক চিকিৎসকের আবশ্যিক কর্তব্যগুলি হল—(i) দুর্ঘটনাগ্রস্থ বা অসুস্থ ব্যক্তির সাহায্যের ডাকে দ্রুত সাড়া দেওয়া। (ii) পদ্ধতিমত আহতের সেবা করা। (iii) রোগীর জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে যে কারণগুলির জন্য সেগুলিকে দ্রুত নিরশন করা। যেমন শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হলে দ্রুত তা চালানোর ব্যবস্থা করা (iv) হাতের কাছে যে সমস্ত উপকরণ পাওয়া যায়, তাকে প্রাথমিক প্রতিবিধানের কাছে সেগুলিকেই ব্যবহার করা ও দ্রুত রোগীর কষ্ট উপশম করা (v) পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পরিবেশ, আলো, বাতাস প্রভৃতির উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। (vi) আতঙ্কগ্রস্থ না হয়ে শান্তভাবে করনীয় কর্তব্যগুলি সম্পাদন করতে হবে। (vii) আহত অবস্থার যাতে আরও অবনতি না হয় বা জীবন সংশয় না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য যতটুকু করা প্রয়োজন তা করতে হবে। অতি আগ্রহী হয়ে বেশি কিছু করা নিস্প্রোয়জন। (viii) আহত ব্যক্তির চারিদিকের জমায়েত বা ভিড় কমানো প্রয়োজন। (ix) প্রয়োজনমত উপস্থিত ব্যক্তিদের সাহায্য নিতে হবে ও আহত ব্যক্তিকে যথাসম্ভব কম নড়াচড়ার সাহায্যে স্নায়বিক আঘাত থেকে রক্ষা করতে হবে। (x) যত শীঘ্র সম্ভব আহত ব্যক্তিকে নিকটবর্তী ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

FIRST AID কথাটির মধ্যেই প্রাথমিক প্রতিবিধানের অর্থ অন্তনির্হিত আছে। নীচে শব্দটিকে ভেঙে প্রাথমিক প্রতিবিধানের অর্থ নির্ধারণ করা হল—

F — Fast ঃ অর্থাৎ দ্রুত।

I — Investigation ঃ আহত ব্যক্তিকে পরীক্ষানিরীক্ষা করা।

R — Relief ঃ অর্থাৎ আহত ব্যক্তির কষ্ট লাঘব করা।

S — Symptom ঃ অর্থাৎ অসুস্থতার লক্ষণগুলি নির্ধারণ করা।

T — Treatment ঃ অর্থাৎ চিকিৎসা করা।

A — Arrange ঃ অর্থাৎ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

I — Immediate ঃ অর্থাৎ যতদ্রুত বা শীঘ্র সম্ভব তা করা।

D — Disposal ঃ অর্থাৎ রোগীকে ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা।

৮.১ প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স (First Aid Box) ঃ

প্রাথমিক চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত সমস্ত সরঞ্জামগুলিকে দ্রুত হাতের কাছে এক সাথে সহজে পাবার জন্য, এগুলিকে একটি নির্দিষ্ট বাক্সে একত্রে রাখা হয়। প্রাথমিক প্রতিবিধানের সরঞ্জাম রাখার এই বাক্সটিকেই বলা হয় ফার্স্ট-এইড-বক্স। এই বাক্সটির রং সাধারণত সাদা হয় এবং উপরে ওপাশে লাল রঙের যোগ চিহ্ন '+' বা রেড ক্রশ আঁকা থাকে। এই বাক্সটিতে যে আবশ্যক সরঞ্জামগুলি রাখা হয় তা হল—

1. **ব্যান্ডেজ ঃ** রোলার ব্যান্ডেজ, ট্র্যাঙ্গুলার ব্যান্ডেজ, ক্রেপ ব্যান্ডেজ।
2. **তুলো ঃ** ক্ষত স্থান পরিষ্কার করার জন্য ও ড্রেসিং করার জন্য।

3. **গজ** ঃ ক্ষতস্থান চাপা দেওয়ার জন্য।

4. **টুর্নিকেট** ঃ রক্তপাত বন্ধ করার জন্য এবং সর্প দংশন স্থানের উপরে বাঁধন দিয়ে রক্ত চলাচল বন্ধ করার জন্য।

5. **জীবাণুনাশক পদার্থ** ঃ রেক্টিফায়েড স্পিরিট, মারকিউরোক্রোম, KM_nO_4 লোশন, ডেটল, বেনজিন, টিনচার আয়োডিন, বার্ণল, সেভলন, নিউস্পোরিন মলম ইত্যাদি এই সব পদার্থ দিয়ে ক্ষতস্থানে জীবাণু প্রতিরোধ করা হয়।

6. **ধাতব যন্ত্র** ঃ ছুরি, ব্লেড, কাঁচি, চিমটি প্রভৃতি যন্ত্রগুলি ব্যান্ডেজ, গজ, কাটার জন্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে লাগে।

7. **লিউকোপ্লাস্ট** ঃ ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজকে সঠিক স্থানে আটকে রাখার জন্য ও বাইরের আবহাওয়া থেকে ক্ষতস্থানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য।

সঠিকভাবে ও সুন্দরভাবে প্রাথমিক প্রতিবিধান করার জন্য প্রতিবিধানকারী ব্যক্তির জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের দরকার হয়। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সারা বছর ধরে প্রাথমিক প্রতিবিধানের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স করান। এই সমস্ত প্রশিক্ষণ কোর্স করা ব্যক্তিগণ প্রাথমিক প্রতিবিধান করার জন্য প্রশিক্ষিত ও দক্ষ বলে বিবেচিত হন। এরকম কয়েকটি সংস্থা হল—আন্তর্জাতিক রেড ক্রশ সংস্থা, সেন্ট জুনস্ অ্যাম্বুলেন্স, রোটারী ক্লাব, লায়নস্ ক্লাব, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, বিশঅব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), ইউনিসফ (UNICEF), কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর প্রভৃতি। স্কুলস্তর থেকে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্পর্কে অবগত ও দক্ষ করে তোলার জন্য স্কুল কার্যক্রমে বিষয়টির পঠন-পাঠন ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

৮.২ ক্ষত (Wound) ঃ

বাইরে থেকে আঘাতজনিত কারণে যখন চামড়া ছিঁড়ে যায় বা কেটে যায় বা ফেটে যায় তখন তাকে বলে ক্ষত। ছুঁরি, কাঁচি প্রভৃতির আঘাত, পড়ে থেঁথলে যাওয়া, হোঁচট খাওয়া, জন্তু-জানোয়ার আঁচড়ে দিলে বা কামড়ে দিলে, পেরেক বা কোনো ছুঁচালো বস্তু চামড়া ভেদ করে দেহের ভিতর প্রবেশ প্রভৃতি কারণে ক্ষত সৃষ্টি হয়। কারণ অনুযায়ী ক্ষত বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। অর্থাৎ কি কারণে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তার উপর নির্ভর করে ক্ষতের প্রকৃতি ও গভীরতা। সাধারণত যে সব ক্ষত আমরা দৈনন্দিন জীবনে দেখি সেগুলি হল—

(1) **ইন সাইজড্ (Incised)** ঃ ছুরি, কাঁচি, ব্লেড, কাঁচ প্রভৃতির আঘাতে কেটে গেলে যে ধরণের ক্ষত সৃষ্টি হয় তাকে ইনসাইজড্ ক্ষত বলে।

(2) **কনটিউসড্ (Contused)** ঃ হোঁচট খেয়ে পড়ে থেঁথলে গেলে এই ধরণের ক্ষত সৃষ্টি হয়।

(3) **ল্যাসারেটেড (Lacerated)** ঃ কোনো জন্তু-জানোয়ারের আঁচড় বা কামড়ের ফলে এই ধরণের ক্ষত সৃষ্টি হয়।

(4) **পাংচারড্ (Punctured)** ঃ ছুঁচ, পেরেক প্রভৃতি তীক্ষ্ণ জিনিস বিদ্ধ হয়ে এই ধরণের ক্ষত সৃষ্টি হয়।

● **ক্ষতের প্রাথমিক প্রতিবিধান (Treatment of Wounds)** ঃ

(1) প্রথমে পরিষ্কার তুলো দিয়ে বা অন্য কোনো পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে রক্তপাত বন্ধ করতে হবে।

(2) পরিস্কার তুলো দিয়ে রক্তমাখা স্থানটি পরিষ্কার করে মুছতে হবে। ডেটল বা রেকটিফআয়েড স্পিরিট দিয়ে তুলো ভিজিয়ে নিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

(3) ক্ষতস্থানে জীবাণু-প্রতিষেধক ওষুধ লাগিয়ে গজ, ড্রেসিং প্যাড, তুলো দিয়ে চাপা দিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে।

(4) নিকটবর্তী ডাক্তারখানা বা হাসপাতালে আহত ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করতে হবে।

৮.৩ রক্তক্ষরণ (Haemorrhage) ঃ

আঘাতের ফলে ক্ষত সৃষ্টি হলে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। রক্তক্ষরণ বিভিন্নভাবে হতে পারে। রক্তক্ষরণ আঘাতের বা ক্ষতের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যেমন আঁচড়ের ফলে রক্তজালক কেটে যায়, এক্ষেত্রে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত ক্ষরণ হয়। যদি আঘাতের ফলে শিরা কেটে

যায় তাহলে কালচে লাল রঙের রক্ত গলগল করে বের হয়। আবার যদি ধমনী কেটে যায় তাহলে উজ্বল লাল রঙের রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে বের হয়। আঘাতের ফলে সৃষ্ট ক্ষত যদি গভীর হয় তখন তীব্র বেগে রক্ত ক্ষরণ হতে থাকে। এই রক্তক্ষরণ যত শীঘ্র সম্ভব বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে ক্ষতস্থানের উপর বা আশে পাশে সাধারণত দুই ভাবে চাপ প্রয়োগ করা হয়—

প্রত্যক্ষ চাপ ঃ সরাসরি ক্ষতস্থানের উপর চাপ দিয়ে রক্ত ক্ষরণ বন্ধ করাকে বলে প্রত্যক্ষ চাপ।

পরোক্ষ চাপ ঃ প্রত্যক্ষ চাপে অনেক সময় রক্তপাত বন্ধ হয় না। তখন ক্ষতস্থানের 'প্রেসার পয়েন্টে' চাপ দিয়ে রক্তপাত বন্ধ করা হয়। একে পরোক্ষ চাপ বলে।

সাধারণত পরোক্ষ চাপ দেওয়া হয় যে প্রেসার পয়েন্টগুলিতে সেগুলি হল (1) ক্যারোটিড প্রেসার পয়েন্ট ঃ গলা বা নিম্ন চোয়ালের কাছে (2) সাবক্ল্যাভিয়ান প্রেসার পয়েন্ট ঃ কাঁধ ও ঊর্দ্ধবাহুর সংযোগস্থলের কাছে (3) ব্রাকিয়াল প্রেসার পয়েন্ট ঃ বাহুর নীচের ব্রাকিয়াল ধমনীর উপর (4) ফিমোরাল প্রেসার পয়েন্ট ঃ কুঁচকির কাছে ফিমার অস্থির নিকটে।

- **৮.৩.১ রক্ত ক্ষরণের প্রাথমিক প্রতিবিধান (Treatment of Haemonrrage) ঃ**

(1) প্রথমেই ক্ষতস্থানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপ দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রক্ত ক্ষরণ বন্ধ করতে হবে।

(2) যে স্থান থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে তা উঁচুতে তুলে ধরলে দ্রুত রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়।

(3) যদি ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়ে থাকে তবে তা অপসারণ করা যাবে না।

(4) ধুলো, বালি বা বাইরের নোংরা জিনিস লেগে থাকলে তা রেকটিফায়েড স্পিরিট ও গজ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

(5) আহত স্থান নাড়ানো যাবে না এবং আহত ব্যক্তিকে দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হবে।

৮.৪ অস্থি ভঙ্গ (Fracture) ঃ

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আঘাতে বা সহসা মাংসপেশীর সংকোচনজনিত প্রবল বলের দ্বারা অস্থি বা হাড়ের বিচ্ছেদকে বলা হয় অস্থি ভঙ্গ। অস্থি ভঙ্গের প্রধান কারণ হল—অস্থির উপর প্রবল মানের অসম বলের (uneven force) প্রয়োগ। অসম বলের কারণে হাড়ের উপর প্রচণ্ড জোরে আঘাত লাগে তার ফলে অস্থি ভঙ্গ ঘটে।

৮.৪.১ অস্থি ভঙ্গের প্রকারভেদ ঃ মানব দেহে নিম্নলিখিত প্রকারের অস্থিভঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়

(1) **সরল অস্থিভঙ্গ (Simple fracture) ঃ** এই রকম অস্থি ভঙ্গে শুধুমাত্র হাড়টি ভেঙে যায়। চারপাশের শিরা, উপশিরা কিংবা মাংসপেশী ও তন্তু ঠিক থাকে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। এই ধরণের অস্থি ভঙ্গকে সিম্পল ফ্রাকচার বা সরল অস্থিভঙ্গ বলে।

(2) **মিশ্র অস্থিভঙ্গ (Compound fracture) ঃ** এই ধরণের অস্থিভঙ্গে হাড় ভাঙার পর শিরা, মাংসপেশী ও চামড়া ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে। তাই এই ধরণের অস্থিভঙ্গকে 'ওপেন ফ্রাকচার' বা মুক্ত অস্থিভঙ্গও বলা হয়।

(3) **জটিল অস্থিভঙ্গ (Complicated fracture) ঃ** এই ধরণের অস্থিভঙ্গের ফলে শরীরের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন যন্ত্র যেমন—কিডনী, লিভার, ফুসফুস, মেরুদণ্ড প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং দেহ অভ্যন্তরে জটিল অবস্থা সৃষ্টি হয় বলে একে জটিল অস্থিভঙ্গ বা কমপ্লিকেটেড ফ্রাকচার বলে।

(4) **বহুভঙ্গ (Comminuted fracture) ঃ** এই ধরণের অস্থিভঙ্গের ক্ষেত্রে অস্থিটি বহু সংখ্যক খণ্ডে বিভক্ত হয়। অর্থাৎ অস্থিগুলি খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়।

(5) **পরস্পর সংবিদ্ধ অস্থিভঙ্গ (Impacted fracture) ঃ** এই জাতীয় অস্থিভঙ্গের পর হাড়ের অগ্রভাগগুলি পরস্পরের মধ্যে ঢুকে যায় বা সংবিদ্ধ হয়। তাই এই ধরণের অস্থিভঙ্গকে ইমপ্যাকটেড ফ্রাকচার বলে।

(6) **গ্রীনস্টিক অস্থিভঙ্গ (Green Stick fracture) ঃ** শিশুদের অস্থি সুদৃঢ় নয় বলে তাদের অস্থি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে না গিয়ে বেঁকে যায় বা ফেটে যায়। নরম অস্থির জন্যই এরূপ হয়।

(7) **ডিপ্রেসড অস্থিভঙ্গ (Depressed fracture) ঃ** অনেক সময় আঘাতের ফলে শরীরের কোনো নরম হাড় সম্পূর্ণভাবে না ভেঙে থেঁথলে যায় এবং ভাঙা অংশ ভিতরে চলে যায়। যেমন—মাথার খুলির অস্থি।

অস্থি ভঙ্গের লক্ষন ঃ (i) আহত স্থানে প্রবল ব্যথা অনুভূত হয়, (ii) অস্থি ভঙ্গের স্থানের চারপাশ ফুলে ওঠে, (iii) অস্থিভঙ্গ হলে সংশ্লিষ্ট জায়গার রং বিকৃত হয়ে ওঠে, (iv) আঘাত স্থানে রক্ত জমে যায়, (v) অস্থিভঙ্গের ফলে অঙ্গের নাড়াচাড়া করার শক্তি লোপ পায়। (vi) চামড়ার নীচে অসমান ভগ্নস্থান হাতের স্পর্শে অনুভব করা যায়। (vii) ভাঙা জায়গায় বিকৃতি দেখা যায়। (viii) অস্থি ভঙ্গের স্থানের সঞ্চালন অস্বাভাবিক হতে দেখা যায়।

- **৮.৪.২ অস্থি ভঙ্গের প্রাথমিক প্রতিবিধান (Treatment of fracture) ঃ**

(1) অযথা নাড়াচাড়া করানো উচিত নয়। অস্থিভঙ্গের স্থান যথাসম্ভব স্থির রাখার চেষ্টা করতে হবে।

(2) ক্ষত সৃষ্টি হলে রক্তপাত প্রথমেই বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(3) আহত ব্যক্তিকে চিৎ করে শোয়াতে হবে। যদি জ্ঞান হারায় তাহলে মুখে চোখে জল ছিটিয়ে জ্ঞান ফেরানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(4) অস্থি ভঙ্গের স্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধা অত্যন্ত জরুরী। কখনও কখনও পাতলা কাঠের সাপোর্ট দিয়ে ভগ্নস্থান নিরাপদ রাখা হয় একে স্পিলিন্ট (splint) বলে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে কাঠের বাঁধন যেন এমন দৃঢ় না হয় যে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

(5) অযথা সময় নষ্ট না করে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো উচিত।

৮.৫ অস্থি সন্ধিস্থলের বিচ্যুতি (Dislocation) ঃ

তীব্র বাহ্যিক শক্তি সম্পন্ন ধাক্কা বা আঘাতের ফলে অস্থিসন্ধিস্থলে যখন অস্থিবা হাড়ের স্বাভাবিক অবস্থান থেকে বিচ্যুতিমঘটে বা হাড় সরে যায় তখন তাকে অস্থিসন্ধিস্থলের বিচ্যুতি বা ডিসলোকেশন বলে। এক্ষেত্রে সন্ধিস্থল ফুলে যায় এবং প্রচণ্ড যন্ত্রনা অনুভূত হয়। অস্থিসন্ধি একদম নড়াচড়া করতে পারা যায় না। জোড় করে নড়াচড়া করলে যন্ত্রনা ও আঘাত বেড়ে যায়।

- **৮.৫.১ সন্ধিস্থলের বিচ্যুতির প্রাথমিক প্রতিবিধান (Treatment of Dislocation) ঃ**

(1) বিচ্যুত অস্থিকে চেপে আগের জায়গায় বসিয়ে দিয়ে ব্যান্ডেজ দিয়ে স্থির করতে হবে। দেখতে হবে যেন নাড়াচাড়া কম হয়।

(2) বিচ্যুত জায়গায় বরফ জলের সেঁক দিতে হবে। এই ঠাণ্ডা সেঁক ফুলো কমায় এবং আরাম দেয়। ২৪ ঘণ্টা ঠাণ্ডা সেঁক দেওয়ার পর গরম জলের সেঁক দেওয়া দরকার হয়।

(3) বিচ্যুতি বসানোর পর স্প্লিন্ট (Splint) বা পাতলা কাঠের পাটা দিয়ে বেঁধে সন্ধিস্থলকে স্থির রাখা হয় যাতে অতিরিক্ত নড়াচড়া সন্ধিস্থলে না হয়।

(4) অতি দ্রুত অস্থি বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.৬ স্নায়বিক আঘাত (Shock) ঃ

সেহ যন্ত্র সমূহের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ যখন গভীর অপকর্ষের (deep depression) ফলে ব্যাহত হয় তাকে স্নায়বিক আঘাত বা শক বলে। শক লাগলে মূলত মস্তিষ্কে স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া ব্যাহত হয়। স্নায়বিক আঘাতের ফলে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে। মূর্ছাভাব বা আচ্ছন্ন অবস্থা সৃষ্টি হয়। গায়ের রং ফ্যাকাশে হয়ে যায়, বমি ভাব হয়, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। গুরুতর স্নায়বিক আঘাতের ফলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। শক সাধারণত দুই প্রকারের হয়। যথা—

(1) **প্রাইমারী শক ঃ** প্রাইমারী শক আবার তিন প্রকারের হয়—

(a) স্নায়বিক শক (Nervous Shock)

(b) রক্তক্ষরণজনিত শক (Haemorrhagic shock)

(c) বিষজনিত শক (Toxic shock)

(2) **সেকেন্ডারী শক ঃ** উপরের তিন প্রকারের প্রাইমারী শক একসঙ্গে হলে শকের তীব্রতা হয় অতি প্রবল। এই প্রকার শককে বলে সেকেন্ডারী শক।

- **৮.৬.১ স্নায়বিক আঘাতের প্রাথমিক প্রতিবিধান (Treatment of shock)**

(1) রোগীকে উৎসাহ ও সাহস প্রদান করে তার মনোবল বাড়াতে হবে।

(2) জামাকাপড় আলগা করে দিতে হবে। রোগীর মাথা নীচু ও পা একটু উপরে উঁচু করে শুইয়ে দিতে হবে। দেহের তাপমাত্রা কমে যাচ্ছে কিনা লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি তাপমাত্রা কমতে থাকে তাহলে কম্বল ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে।

(3) রোগী জ্ঞান না হারালে গরম কিছু খেতে দেওয়া যেতে পারে যেমন—চা, কফি ইত্যাদি।

(4) মাথা বা পেটে আঘাত না থাকলে, মাথা ও কাঁধ উঁচু করে হেলান দিয়ে বসানো যেতে পারে। শক যদি রক্তপাত জনিত হয় তাহলে কিছু খেতে দেওয়া উচিত নয়।

(5) যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে Anti Shock Solution (ASS) পান করানো যেতে পারে। A = Aqua (জল), S = Salt (লবণ), S = Sodium-bicarbonate (খাবার সোডা)। এক গ্লাস জলে পরিমানমতো লবণ ও চা চামচের ১ চামচ খাবার সোডা মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করলে তাকে ASS বলে। শক হলে এই মিশ্রণ খাওয়ালে রোগী দ্রুত স্বাভাবিক হয়।

(6) যত দ্রুত সম্ভব নিকটবর্তী ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.৭ দাহ (Burning) ঃ

অতিরিক্ত উত্তাপ বা কোনো রাসায়নিকের প্রভাবে যখন চর্ম বা দেহ অভ্যন্তরস্থ গভীর তন্তুগুলি বিনষ্ট হয় এবং ক্ষতের সৃষ্টি হয় তাকে দাহ বলে। দাহ বা পোড়া সাধারণত দুই প্রকারের হয়—

(1) **শুষ্ক দাহ ঃ** আগুন বা উত্তপ্ত বস্তুর সংস্পর্শে চামড়ায় বা তন্তুতে যে দাহ বা পোড়া ক্ষত সৃষ্টি হয় তাকে শুষ্ক দাহ বলে।

(2) **আর্দ্র দাহ ঃ** তীব্র অ্যাসিড বা ক্ষার চর্ম বা দেহ তন্তুতে যে ক্ষতের সৃষ্টি করে তাকে আর্দ্র দাহ বলে।

- **৮.৭.১ দাহের প্রাথমিক প্রতিবিধান (Treatment of Burning) ঃ**

(1) গায়ে আগুন লাগলে জলন্ত ব্যক্তিকে কম্বল বা মোটা চাদর জড়িয়ে দিয়ে দ্রুত আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে মেঝেতে গড়িয়ে গায়ে কোনো আচ্ছাদন দিয়ে আগুন নেভাতে হবে।

(2) দগ্ধ স্থান বেশি নাড়াচাড়া না করা এবং দগ্ধ পোশাক অপসারণের চেষ্টা না করা।

(3) স্নায়বিক আঘাত থাকলে তার প্রতিবিধান করতে হবে।

(4) আর্দ্র দাহের ক্ষেত্রে দগ্ধ অঙ্গ প্রচুর জল দিয়ে ধুতে হবে। প্রয়োজনে জলে ডুবিয়ে দিতে হবে।

(5) অ্যাসিডে পুড়লে ক্ষার লোশনে এবং অ্যালকালিতে পুড়লে লেবুর রস বা ভিনিগার দিয়ে দ্রুত ধুয়ে ফেললে ক্ষত গাঢ় হবার সুযোগ পায় না।

(6) যত শীঘ্র সম্ভব রোগীকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.৮ সর্পদংশন (Snake bite) ঃ

পৃথিবীতে কমবেশি ২০০০ প্রজাতির সাপ আছে যার মধ্যে ৩৫০ প্রজাতির সাপ বিষধর বাকিরা বিষহীন। বিষধর সাপগুলির মধ্যে অন্যতম হল—কোবরা, চন্দ্রচূড়, গোখরো, চন্দ্রবোড়া প্রভৃতি বিষধর সাপে কাটলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সাপে কাটলে বিষক্রিয়ার থেকেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিপদজনক হয় । ভীতজনিত স্নায়বিক আঘাত যা গভীর হলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। সাধারণত সাপে কাটলে দংশনের জায়গায় প্রবল যন্ত্রণা অনুভূত হয় ও দংশন স্থান স্ফীত হয়ে ওঠে।

- **৮.৮.১ সর্প দংশনের প্রাথমিক প্রতিবিধান (Treatment of Snakebite)**

(1) রোগীকে আশ্বাস ও সাহস দিতে হবে।

(2) রোগীকে যথাসম্ভব কম নাড়াচাড়া করা উচিত। বিষ যাতে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তাই দংশন স্থান থেকে উপরে কোনো স্থানে জোড়া বন্ধনের ব্যবস্থা করতে হবে। ২০ মিনিট অন্তর এই বাধন ১ মিনিটের জন্য আলগা করতে হবে।

(3) দংশনের স্থানটি কার্বলিক সাবান অথবা $KMnO_4$ গরম জলে মিশিয়ে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে।

(4) রোগীর শরীর গরম রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

(5) যদি কোনো কারণে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয় তাহলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস চালু রাখার চেষ্টা করতে হবে।

(6) সর্প দংশনের একমাত্র ওষুধ হল অ্যান্টিভেনাম সিরাম যা দংশনের পর যত দ্রুত সম্ভব রোগীর দেহে ইনজেক্ট করানোর জন্য ডাক্তার বা হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

৮.৯ জলে ডোবা (Drowning) ঃ

গভীর জলের মধ্যে হাত ও পা ছুড়ে জল অপসারণ করে দেহের ওজনের থেকে বেশি মানের উর্দ্ধমুখী বল সৃষ্টির দ্বারা জলের উপর ভেসে থাকার কৌশলকেই বলা হয় সাঁতার। যারা এই কৌশল জানে না তারা গভীর জলে ভাসতে না পেরে জলের মধ্যে ডুবে যায়। ফলে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটে। জলে ডুবে যাবার সময় ব্যক্তির দেহে জল ঢোকে যার বেশিরভাগটাই পাকস্থলীতে জমা হয় এবং খুব সামান্য জল ফুসফুসের মধ্যেও প্রবেশ করে। জলে ডোবা ব্যক্তিকে প্রথহেই জল থেকে তুলে আনার পর তার দেহের মধ্যে জমা জল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বের করার ব্যবস্থা করতে হবে।

- **৮.৯.১ জলে ডোবার প্রাথমিক প্রতিবিধান (First Aid of Drowning)**

(1) পাকস্থলী থেকে জল বের করার জন্য রোগীকে উপুড় করে এমনভাবে শোয়াতে হবে যেন মাথাটা শরীরের অন্যান্য অংশের থেকে একটু নীচু থাকে।

(2) জল থেকে তুলে ভিজে পোশাক খুলে শুকনো কাপড় পরিয়ে দিতে হবে।

(3) পেটে ও বুকে চাপ দিলে মুখ দিয়ে বেশিরভাগ জল পাকস্থলী থেকে বেরিয়ে আসে।

(4) কম্বলের উপর শুইয়ে দিতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিকমত চলছে কিনা দেখতে হবে। অজ্ঞান হলে চেতনা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। কৃত্রিমভাবে শ্বাস চালানোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

(5) শক পেলে তার চিকিৎসা করতে হবে। শরীরের তাপমাত্রা অত্যধিক কমে গেলে রোগী হাইপোথারমিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে হাতে পায়ে গরম সেঁক দিতে হবে এবং শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে রোগীকে গরম ঘরে শুইয়ে, গরম দুধ বা গরম জল খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

(6) জলে ডোবা ব্যক্তির অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হলে যত দ্রুত সম্ভব নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি ফুসফুসে জল ঢুকে যায় তবে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। কারণ পেটে বুকে চাপ দিয়ে পাকস্থলীর জমা জল বের করা গেলেও ফুসফুস থেকে সহজে তা বের হয় না ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। ফুসফুসে জমা জল বের করার জন্য দ্রুত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার।

৮.১০ কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর পদ্ধতি (Artificial Respiration)

আহত বা রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর উচিত কৃত্রিমভাবে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর ব্যবস্থা করা। কৃত্রিমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর দুটি পদ্ধতি বহুল প্রচলিত।

৮.১০.১ (1) হলজার নিয়েলসেন পদ্ধতি (Holger Nielsen Method)

(i) আহত ব্যক্তিকে উপুড় করে শোয়াতে হবে। সমতল মেঝেতে উপুড় করা অবস্থায় আহত ব্যক্তির কপালের নীচে তার একটি হাতের উপর অপর হাত স্থাপন করতে হবে এবং মাথা যে কোনো একদিকে ঘুরিয়ে রাখতে হবে যাতে নাক ও মুখে বায়ু চলাচল কোনোভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

(ii) রোগীর উপর এক পায়ের হাঁটু মুড়ে ও অপর পা কে গোড়ালীর উপর রেখে প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীকে বসতে হবে। এখন রোগীর পিঠের উপর প্রতিবিধানকারীর দুই হাতের তালু রাখতে হবে। প্রতিবিধানকারীর হাতের আঙুলগুলো রোগীর পাঁজরের ওপর এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে আঙুলগুলোর অভিমুখ পায়ের দিকে থাকে।

▲ প্রতিবিধানকারী বাহুদ্বয় সোজা ও দৃঢ় অবস্থায় রেখে ধীরে ধীরে সামনের দিকে ঝুকবেন যাতে শরীরের ভার হাতের মাধ্যমে নিম্নাভিমুখী হয়। এইরূপ ভার প্রদান ২ সেকেন্ড করতে হবে।

▲ এরপর প্রতিবিধানকারী পিছনের দিকে হেলবে ও চাপ সামনের দিকে স্থানান্তরিত করবে।

▲ অতপর প্রতিবিধানকারী রোগীর কনুই দুটিকে ধরে রোগীর বাহু দুটিকে টেনে এমনভাবে তোলবার চেষ্টা করবেন যাতে টান টান বোধ হয়। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন রোগীর বুক মাটি থেকে না উঠে পড়ে।

উপরের তিন প্রকার সঞ্চালনের সময় প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী মনে মনে সংখ্যা গণনা করবেন। প্রথমক্ষেত্রে 'এক-দুই' অর্থাৎ দুই সেকেন্ড, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'তিন' অর্থাৎ এক সেকেন্ড এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে 'চার-পাঁচ' অর্থাৎ দুই সেকেন্ড এবং 'ছয়' অর্থাৎ এক সেকেন্ড পরে কনুই আবার মাটিতে রাখতে হবে। অর্থাৎ রোগী আবার আগের অবস্থায় থাকবে। এইরূপ সঞ্চালনে মোট ছয় সেকেন্ড সময় লাগে। সমস্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়াটি ছন্দবদ্ধভাবে মিনিটে দশবার হবে এবং যতক্ষণ না শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হচ্ছে ততক্ষণ চলতে থাকবে।

শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হবার লক্ষণ দেখা দিলে কেবল দ্বিতীয় সঞ্চালন প্রক্রিয়াটি চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া স্বাভাবিক হয়। এইরূপ পদ্ধতিতে সঞ্চালন শ্বাস-প্রশ্বাস কৃত্রিমভাবে চালু করার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী হয়।

৮.১০.২ (2) শেফার পদ্ধতি (Shapher Method)

(i) আহত ব্যক্তিকে উপুড় করে শোয়াতে হবে। সমতল মেঝেতে উপুড় করা অবস্থায় আহত ব্যক্তির কপালের নীচে তার একটি হাতের ওপর আর একটি হাত স্থাপন করতে হবে এবং মাথা একদিকে কাত করে দিতে হবে যাতে নাক ও মুখে বায়ু চলাচল কোনোভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

(ii) প্রতিবিধানকারী হাতের কনুই না ভেঙে, কটিদেশ সোজা রেখে হাতের চাপ, দেহ সামনের দিকে ঝুকিয়ে, এমনভাবে রোগীর উপর প্রয়োগ করবেন যেন রোগীর তলপেট মাটির সংস্পর্শে এসে চাপ পায়। তলপেটের চাপ বাড়লে তা মধ্যচ্ছদায় চাপ স্থানান্তরিত করবে ফলে ফুসফুস থেকে বায়ু বের হয়ে যাবে ও রোগী শ্বাস ত্যাগ করবে। এই সঞ্চালন ২ সেকেন্ড ধরে করতে হবে।

(iii) ২ সেকেন্ড চাপ দেবার পর প্রতিবিধানকারীকে গোড়ালীর উপর বসে চাপ আলগা করতে হবে। চাপ ছাড়া অবস্থা তিন সেকেন্ড রাখতে হবে। চাপ ছাড়লে তলপেট ও মধ্যচ্ছদা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাবে ফলে ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ করবে।

(iv) ধীরে ধীরে ও ছন্দবদ্ধভাবে মিনিটে ১২ বার এই প্রক্রিয়া ৫ মিনিট চালিয়ে গেলে ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ ও নির্গমন হতে থাকবে ও শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হলে এই প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে।

রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হলে বা হবার উপক্রম হলে, কোনো সময় নষ্ট না করে যত দ্রুত সম্ভব উপরের দুটি পদ্ধতির কোনো একটি ব্যবহার করে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে। একজন প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী সঠিক প্রশিক্ষণের দ্বারা কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোর কৌশল সহজেই আয়ত্ব করতে পারেন। একজন দক্ষ প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর এই প্রক্রিয়া দুটি শিখে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী।

৮.১১ খেলাধুলার বিভিন্ন প্রকার চোট আঘাত (Sports Injuries)

খেলাধুলায় একজন ক্রীড়াবিদ বিভিন্ন প্রকার চোট আঘাতের মুখোমুখি হন। সাধারণত যে চোট আঘাতগুলি খেলার মাঠে প্রায়শই ঘটে থাকে সেগুলি হল—

(1) **ত্বকের আঘাত ঃ**

৮.১১.১ (A) **থেঁথলানো** (Contusion)

এটি এক প্রকার ত্বকের আঘাত। এক্ষেত্রে আঘাতের কারণে ত্বকে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। তীব্র ঘর্ষণের কারণেও এটি হতে পারে।

প্রতিবিধানকার ঃ (i) বরফ জলের সেঁক দিতে হবে।

(ii) ক্রেপ ব্যান্ডেজ দিয়ে বাঁধন দিতে হবে।

(iii) ২৪ ঘণ্টা পরে ঠাণ্ডা ও গরম সেঁক দিতে হবে।

(iv) হাতের চাপে হালকা ম্যাসাজ দেওয়া যেতে পারে।

(v) আঘাত খুব বেশি হলে ডাক্তারের কাছে পাঠাতে হবে।

৮.১১.২ (B) **ঘর্ষণ জনিত ক্ষত (Abrasion)**

অনেক সময় মাঠের মধ্যে পড়ে গেলে মাঠের সঙ্গে ত্বকের তীব্র ঘর্ষণের ফলে ত্বকের উপরিভাগ চেঁছে যায় ফলে চামড়া বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার কারণে রক্ত জালকগুলি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ক্ষত খুব গভীর না হলে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়তে থাকে। এই ধরণের ত্বকের আঘাতকে ঘর্ষণজনিত ক্ষত বা Abrasion বলে। খেলার মাঠে প্রায়শই এই আঘাত ঘটতে দেখা যায়।

প্রতিবিধানকার ঃ (i) ডেটল বা কোনো জীবাণুনাশক জলে মিশিয়ে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ধুয়ে দিতে হবে।

(ii) ঠাণ্ডা বরফ জল ও হজ দিয়ে রক্ত বন্ধ করতে হবে।

(iii) অ্যান্টিসেপটিক মলম লাগিয়ে গজ দিয়ে চেপে ব্যান্ডেজ করতে হবে।

(iv) ক্ষত খুব বেশি হলে খেলোয়াড়কে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

৮.১১.৩ (C) **থেঁথলানো** (Iaceration)

কোনো ধারালো বস্তুর (শামুখ খোল) আঘাতে অনেক সময় ত্বকের উপরিভাগ কেটে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে একে ল্যাসারেশন বা কাটা বলে।

প্রতিবিধানকার ঃ (i) জীবাণুনাশক দিয়ে ক্ষত স্থান পরিষ্কার করতে হবে।

(ii) রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে হবে।

(iii) মলম লাগিয়ে গজ-তুলো দিয়ে ব্যান্ডেজ করতে হবে।

(iv) ক্ষত গভীর হলে ডাক্তারের কাছে পাঠাতে হবে। প্রয়োজন হলে ডাক্তারবাবু সেলাই দিতে পারেন।

৮.১১.৪ (D) **ফোসকা পড়া** (Blister)

শক্ত জুতো ব্যবহার করলে বা ব্যাট বা র‍্যাকেটের শক্ত হ্যান্ডেল ধরে দীর্ঘক্ষণ ব্যবহার করলে ঘর্ষণের ফলে ত্বকের নীচে জলীয় পদার্থ (fluid) জমে ব্যথা সৃষ্টি হয় একে ফোসকা বা ব্লিসটার বলে।

প্রতিবিধানকার ঃ (i) কোনো সূঁচালো জীবাণুমুক্ত জিনিস দিয়ে ফোসকা গেলে দেওয়া দরকার।

(ii) তারপর ক্ষতস্থানে বরফ শীতল জলে সেঁক দিতে হবে।

(iii) জীবাণুনাশক দিয়ে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতে হবে।

(iv) ব্যান্ডেজ দিয়ে বাঁধতে হবে।

(v) প্রয়োজনমতো ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

৮.১২ (2) **পেশীর আঘাত ঃ**

৮.১২.১ (A) **পেশীতে টান লাগা** (Muscle Pull)

উপযুক্ত উষ্ণীকরণ (worm-up) না হলে, তীব্র অঙ্গ সঞ্চালনের জন্য পেশী প্রস্তুত থাকে না। তাই হঠাৎ তীব্র বেগে অঙ্গ সঞ্চালনের চেষ্টা করলে পেশীতে টান লাগে কখনও কখনও পেশী তন্তু ছিঁড়ে যায়। পেশীর এই আঘাতকে পেশীতে টান লাগা বা মাস্‌ল পুল বলে।

প্রতিবিধানকার ঃ (i) আঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গ সঞ্চালন বন্ধ রাখতে হবে যাতে পেশীটি পর্যাপ্ত বিশ্রাম পায়।

(ii) আঘাতপ্রাপ্ত স্থানটিতে বরফ জলের সেঁক দিতে হবে।

(iii) আস্তে আস্তে পেশীটির উপর মালিশ করতে হবে।

(iv) একদিন পর গরম ও ঠান্ডা সেঁক দিতে হবে।

(v) আঘাত তীব্র হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

৮.১২.২ (B) **পেশীর খিঁচুনি** (Muscle Cramp)

ঠান্ডা পেশীর হঠাৎ উচ্চ তীব্রতায় সংকোচন প্রসারণের ফলে পেশীতে কষ্টদায়ক কম্পনের সৃষ্টি হয় একে পেশীর খিঁচুনি বলে। দীর্ঘক্ষণ ব্যায়ামের বা খেলার সময় অতিরিক্ত ঘাম বেরিয়ে যাবার ফলেও পেশীর খিঁচুনি বা ক্র্যাম্প হতে পারে।

প্রতিবিধানকার ঃ (i) খিঁচুনি হওয়া পেশীটির স্ট্রেচিং করলে উপশম হয়।

(ii) পেশীটিকে বিশ্রামে রাখতে হবে।

(iii) পেশীটির উপর ম্যাসাজ করলে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

(iv) পেশী খিঁচুনি তীব্র হলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

(v) বেশি পরিমানে লবণযুক্ত জল গ্রহণ করতে হবে।

৮.১২.৩ (C) **পেশীর মোচড়** (Muscle Strain)

তীব্র কম্পাঙ্কের অঙ্গ সঞ্চালনের জন্য প্রস্তুত নয় এমন পেশীকে অতিরিক্ত বলপূর্বক বেশি মাত্রার সংকোচন প্রসারণ করলে পেশীতে তীব্র টানের সৃষ্টি হয় এবং পেশী মচকে যায়। পেশীর এই ধরণের আঘাতকে বলে পেশীর মোচড় বা মচকানো বা াস্‌ল স্ট্রেইন।

প্রতিবিধানকার ঃ (i) মচকানো পেশীর সংকোচন-প্রসারণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে যাতে পেশীটি পর্যাপ্ত বিশ্রাম পায়।

(ii) ঠাণ্ডা বরফ জলের বা বরফের সেঁক দিতে হবে।

(iii) ২৪ ঘণ্টা পরে বারংবার ঠাণ্ডা ও গরম জলের সেঁক দিতে হবে।

(iv) আঘাত তীব্র হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

৮.১২.৪ (D) পেশী তন্তু ছিঁড়ে যাওয়া (Rupture)

পেশীর মোচড় সুতীব্র হলে অনেক সময় পেশীর মধ্যে কিছু পেশী তন্তু ছিঁড়ে যায়। ফলে পেশীতে আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হতে দেখা যায়। পেশীটি অস্বাভাবিক রকম ফুলে ওঠে ও তীব্র যন্ত্রণা ও ব্যথা হতে দেখা যায়।

প্রতিবিধানকার ঃ এই আঘাতের প্রতিবিধান পেশী মোচড়ের মতই হয়। তবে দ্রুত ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া জরুরী।

(1) **অস্থি ও অস্থি সন্ধির আঘাত ঃ**

৮.১২.৪.১ (A) অস্থিসন্ধি স্থলে মোচড় (Sprain)

খেলোয়াড়দের প্রায়শই এই আঘাতটি ঘটতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে সন্ধি বন্ধনী (Ligament) গুলিতে অতিরিক্ত টানের ফলে আঘাত লাগে এবং নিকটবর্তী পেশীতন্তুও ছিঁড়ে যায়। মাত্রাতিরিক্ত টানের ফলেই এই ধরণের আঘাত লাগে। সন্ধিস্থলে যন্ত্রণা শুরু হয়। অতিরিক্ত ফুলে ওঠে ও সন্ধির সঞ্চালন কষ্টকর ও অসুবিধাজনক হয়। সন্ধিস্থলের রং কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়।

প্রতিবিধানকার ঃ (i) মচকানো জায়গাটির নাড়াচাড়া সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।

(ii) মচকানোর সাথে সাথে বরফ-ঠাণ্ডা জল লাগাতে হবে যাতে জায়গাটি অতিরিক্ত ফুলে না যায়।

(iii) ক্রেপ ব্যান্ডেজ জড়িয়ে সন্ধিস্থলে ভালো করে বেঁধে রাখা প্রয়োজন।

(iv) ২৪ ঘণ্টা পর ঠাণ্ডা-গরম বীপরীত সেঁক দিতে হবে।

(v) $MgSO_4$ ও গ্লিসারিন নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে পেষ্ট বানিয়ে মচকানো জায়গায় লাগালে ফোলা ও যন্ত্রণা দ্রুত কমতে থাকে।

(vi) X-Ray করতে হবে এবং প্রয়োজনমত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

৮.১২.৪.২ (B) অস্থিসন্ধি স্থলে মোচড় (Dislocation)

পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

৮.১২.৪.৩ (C) অস্থিসন্ধি স্থলে মোচড় (Fracture)

পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

খেলাধুলায় উপরের চোট আঘাতগুলি ছাড়াও আরও অনেক রকমের চোট আঘাতের শিকার হতে হয় একজন ক্রীড়াবিদকে। নীচে এই সমস্ত চোট আঘাতের নামের একটি তালিকা দেওয়া হল—

(1) মাথার আঘাত— ধাক্কা, হেমারেজ, সংজ্ঞা হারানো ইত্যাদি।

(2) মুখমণ্ডলের আঘাত— হেমারেজ, ক্ষত, ফেটে যাওয়া, দাঁত ভেঙে যাওয়া প্রভৃতি।

(3) গ্রীবা ও ঘাড়ের আঘাত— অস্থির স্থানচ্যুতি, অস্থিভঙ্গ প্রভৃতি।

(4) কাঁধের আঘাত— পেশীটান, অস্থিভঙ্গ, অস্থির স্থানচ্যুতি প্রভৃতি।

(5) বাহুর আঘাত— টেনিস এলবো (Lateral Epicondylitis)

গলফারস এলবো (Medial Epicondylitis)

ম্যালেট ফিঙ্গার (Mallet Finger)

স্কিয়ার্স থাম্ব (Skier's Thumb)

(6) পিঠের আঘাত— স্লিপডিস্ক, লো-ব্যাক পেইন, সাইটিকা প্রভৃতি।

(7) স্পন্ডিলাইটিস, স্পন্ডিলোসিস, মেরুদণ্ডের আঘাত।

(8) হ্যামস্ট্রিং পুল, কোয়াড্রিসেপস পুল

(9) ক্যালকেনিয়াম বার্সাইটিস (Calcanium bursitis)

৮.১৩ ক্রীড়া ক্ষেত্রে চোট-আঘাতে বরফের প্রয়োগ (Application of Icc In Sports Injuries)

ক্রীড়া ক্ষেত্রে যে সমস্ত চোট আঘাতগুলি লাগে তার বেশিরভাগটাই ঘটে শারীরিক সংঘর্ষ বা ধাক্কা লাগার জন্য বা কোনো ক্রীড়া সামগ্রীর আঘাত শরীরে লাগার জন্য। এই সমস্ত চোট আঘাতের ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রতিবিধানের জন্য অন্যতম প্রয়োজনীয় ও প্রধান বস্তু হল বরফ (Ice)। প্রায় সমস্ত ধরণের চোট আঘাতের মোকাবিলা করার জন্য প্রথমেই আঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গে বরফ প্রয়োগ করা হয়। বরফ প্রয়োগের ফলে সংশ্লিষ্ট স্থানের তাপমাত্রা নেমে যায় ফলে আঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গে অতিরিক্ত ফ্লুইড সঞ্চয়ের মাত্রা হ্রাস পায় বলে বেশি ফোলে না। ফুলো কম হয় বলে আঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গটি দ্রুত সেরে ওঠে। তাই বলা যায় ক্রীড়াক্ষেত্রে চোট-আঘাতের সমস্যায় বরফ এক প্রকার মহৌষধ হিসাবে কাজ করে।

P.R.I.C.E

এটি প্রাথমিক প্রতিবিধানের মৌলিক পাঁচটি প্রক্রিয়ার ইংরাজী শব্দের আদ্যক্ষর নিয়ে গঠিত একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। প্রক্রিয়াগুলি হল—

P = Prevention বা প্রতিরোধ করা

R = Rest বা বিশ্রাম গ্রহণ করা

I = Ice বা বরফ লাগানো

C = Compress বা মৃদু বাঁধন লাগানো

E = Elevation বা আঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গের উত্তোলন

যে কোনো ধরণের চোট-আঘাত তা সে খেলার মাঠে ঘটুক বা দৈনন্দিন জীবনে কোনো কাজ করতে গিয়ে ঘটুক এই পদ্ধতি সমস্ত চোট আঘাতের প্রাথমিক প্রতিবিধানের জন্য ভীষণ উপযোগী। আজকাল এর শেষে ‘s’ যোগ করা হচ্ছে যার অর্থ S = Stabilization বা স্থির অবস্থায় চোট পাওয়া অঙ্গকে রাখা। অর্থাৎ সার্বিকভাবে প্রাথমিক প্রতিবিধানের প্রক্রিয়াটিকে সংক্ষেপে বলা যায়—P.R.I.C.E.S.

৮.১৪ ড্রেসিং (Dressing) ঃ

কোনো ক্ষতস্থান বা আহত জায়গা শুশ্রূষা করতে যে বিশেষ ধরণের জীবাণুমুক্ত কাপড়ের টুকরো দিয়ে ক্ষতস্থান ঢেকে রাখা হয় বা ঢাকা হয় তাকে ড্রেসিং বলে। ড্রেসিং ব্যবহারের কারণগুলি হল—(i) ড্রেসিং রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে সাহায্য করে (ii) আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে যাতে পুনরায় আঘাত না লাগে তার থেকে ড্রেসিং রক্ষা করে (iii) ক্ষত-স্থানে যাতে নোংরা না লাগে বা ভাইরাস/ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ না ঘটে তাই ড্রেসিং ব্যবহার করা হয়। (iv) ক্ষতস্থান থেকে নির্গত তরল পুঁজ, রক্ত, রক্তরস প্রভৃতি তরল ড্রেসিং শোষণ করে ক্ষতস্থান শুকনো রাখে ফলে ক্ষতস্থান দ্রুত মেরামত হয়।

৮.১৫ ব্যান্ডেজ (Bandage)

কোনো ক্ষতস্থান বা মচকানো বা ভেঙে যাওয়া স্থান বা ফোলা ও আঘাতপ্রাপ্ত স্থানকে বাঁধার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত যে কাপড় ব্যবহার করা হয় তাকে ব্যান্ডেজ বলে।

ব্যান্ডেজ আবার বিভিন্ন প্রকারের হয়, যেমন—রোলার ব্যান্ডেজ, ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ, ক্রেপ ব্যান্ডেজ, টুর্নিকেট ব্যান্ডেজ, স্লিং ব্যান্ডেজ।

মাথার খুলির ব্যান্ডেজ (Bandage of the Skull)

(i) ত্রিকোণ ব্যান্ডেজের ভূমির দিকটি একটু ভাঁজ করে কপালের উপর ঠিক ভ্রু-এর উপর রাখতে হবে।

(ii) ব্যান্ডেজের শীর্ষটিকে মাথার উপর দিয়ে পিছনে ফেলতে হবে যাতে শীর্ষটি ঘাড়ের কাছে থাকে এবং প্রান্ত দুটিকে দুপাশ দিয়ে পিছনে নিয়ে যেতে হবে।

(iii) প্রান্ত দুটিকে এবার পিছন থেকে ঘুরিয়ে আবার কপালের সামনে এনে গিঁট দিতে হবে।

(iv) এখন মাথায় আস্তে চাপ দিয়ে পিছন থেকে শীর্ষটিকে তুলে এনে প্রান্ত দুটিকে পাকিয়ে শীর্ষের সঙ্গে বেঁধে দিলে পুরো মাথাটি আবৃত হবে।

স্লিং (Sling)

হাতে ব্যান্ডেজ করার পর হাতটিকে ঝুলিয়ে রাখার জন্য দড়ির মতো যে ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয় তাকে স্লিং বলে। এটি ত্রিকোণ বা রোলার ব্যান্ডেজ থেকে তৈরি হয়।

(1) কলার এবং কাফ্ স্লিং (Collar & Calf Sling)

কব্জি ঝুলিয়ে রাখার জন্য কলার এবং কাফ্ স্লিং ব্যবহার করা হয়। এই স্লিং ব্যবহার করতে হলে কনুই এমনভাবে ভাঁঙতে হবে যেন হাতের আঙুল বীপরীত কাঁধ স্পর্শ করতে পারে। এখন এইভাবে কনুই ভেঙে হাতটি বুকের কাছে রাখতে হবে। তারপর হাতের কব্জির উপর ক্লোভ হিচ দিতে হবে। ব্যান্ডেজের প্রান্তদ্বয় গিঁট দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে দিতে হবে। রিফ নট্ যাতে কলারে পাশে থাকে সেদিকে লক্ষ্য দিতে হবে।

(2) আর্ম স্লিং (Arm Sling)

বাহুর অগ্রভাগ আরামে ঝুলিয়ে রাখার জন্য আর্ম স্লিং ব্যবহার করা হয়। একটি ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ নিয়ে একটি প্রান্ত সুস্থ কাঁধের উপর রেখে ঘাড়ের পশ্চাৎদেশ বেষ্টন করে আহত কাঁধের উপর আনতে হবে এবং অপর প্রান্তটি বুকের সামনের দিকে ঝুলিয়ে দিতে হবে। তারপর ব্যান্ডেজের মধ্যস্থলে বাহুখানি রেখে শীর্ষটিকে কনুইয়ের পিছন দিয়ে সামনে আনতে হবে। এবার দ্বিতীয় প্রান্তের সাথে প্রথম প্রান্তটিকে বেঁধে দিতে হবে। শীর্ষটিকে কনুই পর্যন্ত ভাঁজ করে এনে পিন দিয়ে বাহুর উপরের অংশের ব্যান্ডেজের সঙ্গে আটকে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আঙুলের নখগুলি খোলা থাকে। কারণ রক্ত চলাচল হচ্ছে কিনা ওই নখের রক্ত দেখে বুঝতে হবে। ব্যান্ডেজ করার পর যেন বাহুর অগ্রভাগ ঝুলে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৮.১৫.১ রোলার ব্যান্ডেজ (Roller Bandage)

এই প্রকার ব্যান্ডেজ সাধারণত 3-4 ইঞ্চি চওড়া হয়। কিন্তু দৈর্ঘ্য বেশ কয়েক ফুট হয়। এগুলি রোল করে রাখা হয় বলে একে রোলার ব্যান্ডেজ বলে। এই ব্যান্ডেজ দিয়ে ড্রেসিং এর পর আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে ব্যান্ডেজ দেওয়া হয়।

রোলার ব্যান্ডেজের সাধারণত দুটি অংশ থাকে, যথা মাথা বা হেড (Head) এবং টেল (Tail) বা মুক্তপ্রান্ত। রোলার ব্যান্ডেজ করার পদ্ধতি হল—

(i) যে অংশ ব্যান্ডেজ করা হবে তা ভালো করে support দিয়ে রাখা প্রয়োজন।

(ii) রোলার ব্যান্ডেজের টেল অংশটিকে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের উপর রেখে হেড অংশটিকে ধীরে ধীরে চারপাশে ঘুরাতে হবে। ব্যান্ডেজ করা শেষ হলে শেষ অংশটি ক্লিপ দিয়ে বা লিউকোপ্লাস্ট দিয়ে আটকে দিতে হবে।

(iii) ব্যান্ডেজ শুরু করার আগে ক্ষতস্থানে মোটা করে তুলো জুড়িয়ে দিতে হবে।

(iv) ব্যান্ডেজ করার সময় চাপ এমনভাবে রাখতে হবে যেন ব্যান্ডেজ মজবুত হয় অর্থাৎ সহজে খুলে না যায় আবার চাপ এমন না হয় যে রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

৮.১৫.২ ক্রেপ ব্যান্ডেজ (Crepe Bandage)

এই প্রকার ব্যান্ডেজ হল একপ্রকার মোটা কাপড়ে তৈরি বিশেষ ধরণের ব্যান্ডেজ। মূলত অ্যাঙ্কেল, রিস্ট মচকে গেলে বা হাঁটুতে ব্যাথা হলে এই প্রকারের ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয়।

৮.১৫.৩ টুর্নিকেট (Tourniquet)

এটি 5-6 সেমি চওড়া শক্ত প্যাডযুক্ত ব্যান্ডেজ। যখন ধমনী কেটে গিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয় তখন টুর্নিকেট ব্যান্ডেজ

বাঁধার প্রয়োজন হয়। সাপে কাটলে যাতে বিষ সারা দেহে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেই জন্য ও দংশন স্থানের উপরে এই প্রকার ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়। দড়ি বা রবার নল দিয়েও এই প্রকার ব্যান্ডেজ বাঁধা যায়।

ক্ষতস্থানের ঠিক উপরে টুর্নিকেট লাগিয়ে একটি পেনসিল বা কাঠের দণ্ডাকার টুকরো দিয়ে টুর্নিকেটটিকে পাক দাও। যখন বাঁধন শক্ত হয়ে যাবে তখন পেনসিলটিকে বা কাঠের দণ্ডটিকে বাঁধনের সঙ্গে আটকে দাও। কয়েক মিনিট পর বাঁধন আলগা করে কিছুক্ষণে জন্য রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে পুনরায় কিছু উপরে অনুরূপ বাঁধন দিতে হবে।

৮.১৫.৪ স্প্লীন্ট (Splint)

অস্থিভঙ্গ হলে তাকে সাপোর্ট দিয়ে বাঁধার জন্য টুকরো টুকরো সরু কাঠ ব্যবহার করা হয় একে স্প্লীট বলে। যাতে ভগ্নস্থানে অসম চাপ না পড়ে তাই স্প্লীন্ট ব্যবহার করা হয়। এই বাঁধন দেবার সময় সতর্ক থাকতে হয় যাতে রক্ত চলাচল বন্ধ না হয়। সাধারণত অস্থি যখন অনেকগুলো টুকরো হয়ে যায় তখন স্প্লীন্ট ব্যবহার করা হয়। স্প্লীন্ট ব্যবহার করলে অস্থিটি স্থির অবস্থায় রাখা সহজ হয় এবং অন্যান্য চাপ ও আঘাত থেকে অস্থি ভঙ্গের স্থানটিকে রক্ষা করা যায়। হাড়ের মাপ অনুযায়ী স্প্লীন্টও বিভিন্ন মাপের হতে পারে লম্বা অস্থির ক্ষেত্রে বড় স্প্লীন্ট ও ছোটো অস্থির ক্ষেত্রে ছোটো স্প্লীণ্ট ব্যবহার করা হয়।

৮.১৬ বাৎসরিক স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা প্রদর্শনী (Annual exhibition on health & hygene)

বিদ্যালয়ে বাৎসরিক স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে। যেখানে স্বাস্থ্য সচেতনতার বিভিন্ন বিষয়, চার্ট ও মডেলের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে। প্রদর্শনীতে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা কিভাবে নিতে হবে তা হাতে কলমে ছাত্র-ছাত্রীদের করে দেখানো যেতে পারে। অর্থাৎ চোখ, কান, দাঁত, নখ ও ত্বকের যত্ন কিভাবে নিতে হবে সে সম্পর্কে তাদের অবগত করানো যেতে পারে। First Aid বা প্রাথমিক প্রতিবিধানের প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে এই একজিবিশনের একটি অংশ হিসাবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের BMI নির্ধারণ করা শেখানো এবং প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর BMI নির্ধারণ করে দেহের ওজন ও চর্বির অনুপাতের উপর তাদের ধারণা প্রদান করা যেতে পারে।

৮.১৬.১ স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা প্রদর্শনীর গুরুত্ব ঃ

1. স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ে।
2. ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষায় উদ্যোমী হয়।
3. সংক্রামক রোগের বিস্তার ও সংক্রমণের মাধ্যমে পদ্ধতি প্রভৃতি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের ধারণা দান করা যায়।
4. ছাত্র-ছাত্রীরা সংক্রামক রোগের প্রতিরোধে উদ্যোমী হয় ফলে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা যায়।
5. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা লাভ করে ছাত্র-ছাত্রীরা।
6. পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের ধারণা প্রদান করা যায় ফলে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ছাত্র-ছাত্রী ও সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের সচেতনতা বাড়ানো যায়।
7. ছাত্রছাত্রীদের সুঅভ্যাস গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত করা যায়।
8. রোগ প্রতিরোধে শরীরচর্চা ও ব্যায়ামের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন করা যায়।
9. সমাজসেবা ও অন্যান্য সেবামূলক কর্মসূচীতে ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করা যায়।

অধ্যায়

৯

অ্যাথলেটিক্স, যোগাসন, জিমনাস্টিকস্ এবং আনন্দদায়ক ও ছন্দমূলক খেলা

৯. Fundamental Skill of Running, jumping, Throwing, Walking

৯.১ হাঁটা, দৌড়ানো, ঝাঁপানো ও কোন কিছু ছোড়া-সংক্রান্ত শৈলী ঃ

হাঁটা — Heel, Ball and Toe –

দৌড়ানো — On Toes (with Touching heel)

হাঁটা ও দৌড়ানোর মধ্যে মূল পার্থক্য হল- হাঁটার সময় কোন নির্দিষ্ট সময়ে Heel, Ball বা Toe -এর যে কোন একটি অংশ মাটির (Surface) সঙ্গে সংযোগ থাকবে। কিন্তু দৌড়ানোর ক্ষেত্রে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে দুটি পা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মাটি ছাড়তে হয় (Off in surface)।

ঝাঁপানো ক্ষেত্রে দৌড়ের (Speed) গতি অংশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। যদিও Standing Jump-এর ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটির প্রয়োগ দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে শরীরের হাতের Swing এবং Flexing of the knee শরীরের মধ্যে গতি সৃষ্টি করে। তার সঙ্গে ব্যক্তির পেশীর শক্তি (Power) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কোন কিছু ছোড়ার ক্ষেত্রে হাতের শক্তির (Strength of the muscle along with power component) সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ সর্বোচ্চ শক্তি ব্যবহার ক্ষমতা থাকা দরকার (certain explosion)-যা মূলত নির্ভর করে ব্যক্তির ক্রীড়া প্রশিক্ষণের মাত্রার উপর। সাধারণতঃ Advance Training এর মাধ্যমে শক্তি ও গতির সংমিশ্রণ (Power = strength × speed) ঘটানো সম্ভব। তার সঙ্গে লোহার বল (Shot-put), বর্শা (Javelin) ইত্যাদি সঠিকভাবে ধরার (holding the apparatur) কৌশল রপ্ত করা প্রাথমিকভাবে জরুরি শর্ত।

৯.২ ফুটবল ঃ ফুটবল খেলতে হলে সাধারণত বল ধরা-ছাড়া (Ball receiving, Passing) এই কৌশলগুলি প্রাথমিকভাবে রপ্ত করা উচিত। কৌশলগুলি সাধারণভাবে ক্রীড়া কুশলতাকে একটি বিশেষ মাত্রা দেয়। সাধারণত আমরা বলি সেই ভালো খেলোয়াড় যে সঠিকভাবে বলটি ধরতে (receiving) পারে ও সঠিক সময়ে বলটি ছাড়তে (passing) পারে। বল ধরার বিভিন্ন কৌশল আছে যেমন- Inside receiving, Chest Trapping/receiving, Thigh trapping, Instep trapping, Toe trapping ইত্যাদি তেমনিই বল ছাড়ার ক্ষেত্রে Push-Pass (Inside Pass), Instep Passing (very difficult to control), Chest Passing, Heading Pass ইত্যাদি। তাছাড়াও High drive, low drive, Dribbling, Tracking, Throw-in ও কর্নার কিক, পেনাল্টি কিক ইত্যাদিও আছে।

সকল কৌশলগুলি রপ্ত করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ drill এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য – বল সহ ও বল ছাড়া।

Drill কে 4 টি পর্যায়ে ভাগ করা যায় :

(i) Approach / Approach Run → সবসময় বলের লাইনের দিকে হবে

(ii) Stanee / Body position → অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

(iii) Execution → সঠিক অংশ দিয়ে বলকে আঘাত করা

(iv) Follow through → অন্তিম পর্বে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

৯.২.১ 1. Push-Pass (পায়ের ভিতরের অংশ দিয়ে বল ছাড়া) ঃ

(i) Approach Run ঃ বলের পিছনের দিক থেকে দুই-তিন পা ছুটে এসে বলের পাশে Non-kicking foot কে রাখা।

(ii) Stanee : Non-kicking foot বলের পাশে রাখা পাশাপাশি knee flexed অবস্থায় রাখতে হবে, চোখ বলের উপর ও দেহের উপরিভাগে বলের উপর আনতে হবে। হাত দুটি শরীরের পাশে থাকবে। kicking foot শরীরের পেছনে নিয়ে গিয়ে পায়ের ভিতরের অংশ খোলে করে শূন্যে তুলে রাখতে হবে।

(iii) Execution : এই অংশে kicking foot পেছন থেকে সামনে এনে বলের পেছনে আঘাত করে skill টি execute করতে হবে। এক্ষেত্রে যাকে বলটি দেওয়া হবে তার সরলরৈখিক দূরত্বের উপর নির্ভর করবে কতটা জোড়ে বলটিকে আঘাত করতে হবে।

(iv) Follow Through : Execution সম্পূর্ণ হলে kicking foot টিকে যার দিকে বল পাঠাবো তার দিকে নির্দেশ করে kicking foot রাখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গী খেলোয়াড়ের দিকে নজর দিতে হবে।

৯.১.২ 2. Trapping/Receiving : কোন খেলোয়াড়ের দিকে ধেয়ে আসা বলকে সঠিকভাবে আয়ত্ব করাকে trapping বলা হয়। এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর শেখার প্রথম থেকেই নজর দেওয়া উচিত। সেটি হলো receiving বা trapping এর পর বল যেন থেমে না যায় (Dead Stop)। Receiving -এর পরও বল যেন গতির মধ্যে থাকে এবং নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে।

৯.১.৩ 3. Dribbling : দুই পায়ের যে কোন অংশ দিয়ে বলকে গড়িয়ে বা মাটির উপর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াকে dribbling বলে। এর মাধ্যমে বিপক্ষের খেলোয়াড়দের সহজেই বোকা বানিয়ে গোলের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। এই সময় মনে রাখা উচিত বল যেন নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে কৌশলটি ব্যবহার করতে পারা।

৯.১.৪ 4. Tackling : এটি একটি বিশেষ কৌশল যার মাধ্যমে একজন খেলোয়াড় বিপক্ষের কাছ থেকে বল কেড়ে নিতে পারে। খুব উচ্চ পর্য্যায়ের শারীরিক সক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়ের প্রয়োজন সময়জ্ঞান, সাহস ও বুদ্ধিমত্তা সঙ্গে সঙ্গে আইনের দিকগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট ধারণা থাকা।

৯.২ ভলিবল : ভলিবল খেলা ব্যক্তিগত ক্রীড়া নৈপুণ্য ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দলগত নৈপুণ্যের মিলিত ফল। সাধারণভাবে হাত দিয়ে এই খেলা হয়। বলের ওজন ও আকৃতি কম ও ছোট হয়। ভলিবল খেলার কৌশলগুলি হল ঃ

(i) Service : সার্ভিস করা

(ii) Receiving / Passing / First Pass / Under-hand Pass : বল পাশ দেওয়া

(iii) Upper-hand pass / Set up : বল মারার জন্য সঠিকভাবে ও সঠিক জায়গায় রাখা

(iv) Spiking : বলকে সজোড়ে মারা

(v) Blocking : বলকে বাধা দেওয়া

(vi) Defence / Fielding : বলকে মাটিতে পড়তে না দেওয়া

(vii) Drop Shot

(i) Service : সার্ভিস বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে : (a) Under-hand Service (b) Tennis Service (c) Jump and Tennis Service (d) Round arm Service (e) Floating Service (f) Side arm Spin Service.

(ii) Passing : Passটি সঠিকভাবে Set করে অন্য খেলোয়াড়ের কাছে পাঠানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(iii) upper-hand pass / set up : বলটি Fore-header উপর থেকে নেটের একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় সাজিয়ে দেওয়া।

(iv) Spiking : Long / high Ball, Short Ball, Pole Play etc.

(v) Blocking : Single Block, Double Block

(vi) Defense : Short angle defense, Long angle defense, one-handed drive, Double handed drive ইত্যাদি।

৯.৩ Kabaddi (কবাডি) ঃ কবাডি আমাদের দেশের প্রাচীন খেলাগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রথমে ইহা হা-ডু-ডু হিসাবে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে অতিরিক্ত কিছু নিয়মকানুন যুক্ত করা হয়। এই খেলায় দুই ধরনের কৌশল আছে।

(i) Attacking Technique : Raid, Squat Leg thrust, Toe-Touch, Round Leg Kick, Side Kick, Aero-fly kick, Mule kick এবং বিপক্ষের কোন খেলোয়াড়কে স্পর্শ করার Lobby ব্যবহার করা যাতে বিচারকরা নিশ্চিত হতে পারে যে একজনকে আউট করতে পেরেছে।

(ii) Defensive Technique: Single Chain, Double Chain, Thigh hold, Toe hold and turting, ankle hold ইত্যাদি। সাধারণভাবে 7 জন খেলোয়াড় দলের হয়ে মাঠে নামেন। মাঠে 6 বা 7 জন খেলোয়াড় থাকলে বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড় Raid করার সময় নির্দিষ্ট Bonus line অতিক্রম করতে পারলে বোনাস পয়েন্ট পায়। কোন দল বিপক্ষের ৭ জনকে আউট করলে ২ পয়েন্ট লোন হিসাবে পায়।

৯.৪ সামনে গড়ানো (Forward Roll) ঃ পা জোড়া করে কাঁধের চওড়া অনুযায়ী পায়ের দুই ফুট আগে দু-হাত মাটিতে রেখে বসতে হবে এবং আঙুলগুলি সামনের দিকে থাকবে। আস্তে আস্তে শরীরের নীচের অংশটিকে ওপরে তুলতে হবে এবং চিবুক বুকে ঠেকাতে হবে। দুই হাত ভাঙতে হবে যাতে গলা ও কাঁধের পিছনের অংশ জমিতে স্পর্শ করে; পা দুইটি মাটি থেকে তুলে শরীর গুটিয়ে নিয়ে সামনের দিকে গড়াতে হবে। পা মাটিতে রেখে দেহের ওজন পায়ের উপর আনতে হবে এবং ভারসাম্য বজায় রেকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।

পিছনে গড়ানো (Backward Roll) ঃ পা জোড়া করে হাঁটু ভেঙে যেদিকে গড়াতে হবে সেদিকে পিছন করে দাঁড়াতে হবে। তারপর squat position-এ বসে দু হাত দেহের পাশে জমিতে রাখতে হবে। ধীরে ধীরে দেহের ওজন পেছন দিকে রেখে গড়াতে হবে, যখনই পিঠের মাঝখান জমি স্পর্শ করবে তখন দু হাতের তালু কানের পাশে মাটিতে রাখতে হবে। দেহ গুটিয়ে হাতের উপর চাপ দিয়ে পিছনে গড়াতে হবে যাতে পা মাটি স্পর্শ করে। তারপর দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।

গোরুর গাড়ির চাকা (Cart Wheel) ঃ বাঁ অথবা ডান পা সামনে রেখে দাঁড়াতে হবে। হাত দুটো কাঁধের সমান্তরাল করে দেহের সামনে তুলতে হবে (হাতের তালু মাটির দিকে থাকবে)। তারপর বাম বা ডান কাঁধ কোনাকুনি রেখে কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ ভেঙে দ্রুত হাত দুটিকে পায়ের প্রা এক ফুট সামনে কাঁধ ব্যবধান দূরত্বে এক লাইনে মাটিতে রাখতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সামে পায়ের হাঁটু একটু ভেঙে সজোরে মাটিতে ধাক্কা দিয়ে পা দুটিকে উপরে তুলে সোজা করতে হবে। হাতের উপর ভর দিয়ে, পা কে যতদূর সম্ভব ফাঁক করতে হবে এবং একটি পায়ের ওপর নেমে, অন্য পাটি মাটিতে রাখতে হবে। তারপর হাত দিয়ে মাটিকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে সোজা অবস্থায় দাঁড়াতে হবে।

হাতের উপর দাঁড়ানো (Hand Stand) ঃ বাঁ অথবা ডান পা সামনে রেখে দাঁড়াতে হবে। হাত দুটি কানের পাশে মাথার উপর সোজা করে রাখতে হবে। হাতের তালু সামনের দিকে থাকবে। কোমর থেকে শরীরের উপরের ভেঙে হাত সামনের পায়ের প্রায় এক ফুট সামনে রাখতে হবে। একই সাথে সামনের পায়ের হাঁটু ভেঙে সজোরে মাটিতে ধাক্কা দিয়ে, হাতের উপর ভর দিয়ে গোটা শরীরকে উপরে তুলে হাতের উপর দাঁড়াতে হবে। পা জোড়া, শরীর সোজা এবং মাথা একটু সামনের দিকে থাকবে।

শরীর পিছনে বাঁকানো (Arching or Bridge) ঃ পা দুটি কাঁধ সমান ফাঁক করে হাতের দুটি কানের পাশে সোজা করে, হাতের তালু সামনের দিকে রেখে, মাথার উপর তুলে দাঁড়াতে হবে। আস্তে আস্তে শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে কোমর ভেঙে শরীরের উপরের অংশটিকে পিছনের দিকে বাঁকাতে হবে। হাত দুটি আস্তে আস্তে মাটিতে স্পর্শ করাতে হবে এবং হাতের আঙুল ভিতর দিকে থাকবে। হাত দিয়ে মাটিতে চাপ দিয়ে শরীরকে উপরে ঠেলে সেতুর মতন উঁচু করতে হবে এবং পুরো পায়ের পাতা মাটিতে লাগানো থাকবে। মাথাটি দুটি পায়ের মাঝখানে থাকবে।

৯.৫ Recreational Games and Rhythmic Games : আনন্দদায়ক খেলা : শরীর চর্চার বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্যে প্রথমতঃ তার উদ্দেশ্য যদি হয় শারীরিক বিকাশ তেমনই অন্যদিকটি হল আনন্দলাভ ও আনন্দদান করা। খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রপ্ত করতে পারে শৃঙ্খলাবোধ, সহযোগিতা, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, মনোবল, Self control, Self realization যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে বিভিন্ন সামাজিক ও মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হওয়া এবং তার থেকে চাপমুক্ত অবস্থায় তার সুরাহ করার ব্যবস্থা করতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক খেলায় অংশগ্রহণের জন্য যে ক্রীড়া প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেখানে অংশগ্রহণকারী ছাত্র বা ছাত্রীকে সাময়িকভাবে মূল প্রশিক্ষণ থেকে সরিয়ে রেখে আনন্দদায়ক খেলাগুলি ব্যবহার করা হয়। মূল উদ্দেশ্য হল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অবসাদ, চাপ ইত্যাদি প্রকাশ যেন না পায়।

৯.৬ Yoga : যোগ : Patanjali মতে, Yoga is the concentration of mind with abstract meditation. অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনই হল যোগ। যোগ ভারতের একটি প্রাচীন ক্রীড়া অভ্যাস। ইহার প্রাথমিক উদ্দেশ্য শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ তৈরী করা। প্রাচীনকালে মুনী ঋষিরা যোগাসনের মাধ্যমে সাধনার পথ প্রশস্ত করতেন।

সাধারণতঃ যোগের প্রকারভেদকে বিভিন্ন শারীরিক Posture অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হয়।

(i) Meditation Posture : পদ্মাসন, বজ্রাসন, পবন মুক্তাসন

(ii) Forward Bending Posture : পশ্চিমোত্তনাসন, পদ্‌হস্তাসন

(iii) Backward Bending Posture : ধনুরাসন, ভুজঙ্গাসন

(iv) Sideward Bending Posture : অর্ধচন্দ্রাসন

(v) Standing Posture : বৃক্ষাসন

(vi) Mixed Posture : সূর্য নমস্কার

(vii) Relax above Posture : সবাসন

ইহা ছাড়াও প্রাণায়াম বর্তমানে বহুল প্রচলিত একটি যোগাভ্যাস। প্রাণায়ামের দ্বারা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের Cleaning বা Purity of the organs or system সম্ভব। তাছাড়াও কপালভাতি, অনুলোম-বিলোম ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য।

অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করি একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়রা ফুটবল বা ভলিবল খেলছে। এতে দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সাময়িকভাবে খেলোয়াড়দের মধ্যে যে চাপ, অবসাদ, অমনোযোগ ইত্যাদি মানসিক বিষয়গুলি কাজ করে তার থেকে সরিয়ে রেখে আনন্দদায়ক খেলার মধ্যে যুক্ত করা যায় তার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক সক্ষমতার মাত্রাটি ধরে রাখা সম্ভব হয়।

রুমাল চুরি, Dodge Ball, Zig Zag running ইত্যাদি। সাধারণতঃ এই খেলাগুলি সংগঠিত করার জন্য বিশেষ কোন সরঞ্জামেরও প্রয়োজন হয় না এবং নির্দিষ্ট কোন নিয়ম কানুনের বাধা না থাকায় সকলেই এতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৯.৭ Rhythmic Games : ছন্দমূলক খেলা : এর প্রাথমিক উপাদান হিসাবে ইহাকে দলবদ্ধ ছন্দমূলক ক্রীড়া বলা হয়। যেখানে ক্রীড়াশৈলী উপস্থাপন ছাড়াও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। যেমন : Callisthenics (খালি হাতে সৌন্দর্যমূলক ব্যায়াম), লেজিম, ওয়ান্ড (wand), ডামবেল, নাচ ও ব্রতচারী ইত্যাদি।

এই ধরনের ছন্দমূলক খেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

সাধারণ উদ্দেশ্য হল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্নায়ু-পেশীর সমন্বয় গড়ে তোলা এবং বিশেষ উদ্দেশ্য হল অংশগ্রহণকারী ছাত্র বা ছাত্রীদের মধ্যে ছন্দময় অভ্যাস গড়ে তোলা– দলবদ্ধতা, followership quality, শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিশেষ গুণগুলি রপ্ত করানো এবং সকল ছাত্র বা ছাত্রীকেই অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। যার মূল তত্ত্ব নিহিত আছে শারীরশিক্ষার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নীতির উপর। Not to win but to take Part.

Project Work : —১০ Unit - 10 **অধ্যায় — ১০**

১০.১.১ (১) বিভিন্ন ধরনের সংক্রামিত রোগের একটি শ্রেণী বিন্যাস কর ও তার প্রতিকার লেখ।

১০.১.২ (২) বিদ্যালয় সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী মানুষের দেহে রোগ জীবাণুর সমস্যা সম্পর্কে চার্ট তৈরী করো

তিনি কোথায় কাজ করেন	কী কারণে রোগটি হয়ে থাকতে পারে	সমস্যাটি কী	প্রতিকার কী
1. অ্যাসবেস্টসের কারখানা	অ্যাসবেস্টাস	ফুসফুসের সমস্যা	ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া

১০.১.৩ (৩) 400 mt এর একটি ট্র্যাকের পরিমাপের গাণিতিক রূপের ব্যাখ্যা দাও।

১০.২ (ii) Social Service around the locality of the institution Pertaining to health, visit to the to Surrounding of the locality with students :

বিভিন্ন রোগের ঝুঁকির জন্য কী কী অসাবধানতা ও অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস দায়ী তার সম্বন্ধে Survey করা ও শিক্ষামূলক প্রচার

	কারণ	কোন্ অসাবধানতা / অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস দায়ী	প্রতিকার
1. হেপাটাইটিস	পানীয় জলে ভাইরাসের সংক্রমণ	দূষিত জল পান করা	জল ফুটিয়ে খাওয়া

১০.৩ (i) Debate & Discussion : স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অবসর সময়ে বিভিন্ন বিষয়— যেমন স্বাস্থ্যচর্চা, চিকিৎসা, সমাজসেবা ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত এক্সপার্টদের নিয়ে আলোচনাসভা ও সভার শেষে বিশেষ প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখার ব্যবস্থা করা। যেমন :

(i) শারীরিক সক্ষমতার লক্ষ্যে শরীরচর্চার ভূমিকা

(ii) রক্তদানের গুরুত্ব—সামাজিক তাৎপর্য

(iii) দেশ সেবায় NSS / NCC গুরুত্ব

(iv) সেনা বা পুলিশের চাকুরীতে শারীরশিক্ষার বা NCC-র প্রভাব বা গুরুত্ব

১০.৪ Practical :

১০.৪.১ (i) Group Activity : Calisthenics, Dumbbell, Wand, Marching, Ribbon drill, Lezim ইত্যাদি।

১০.৪.২ (ii) Project Activities : শহরের বিভিন্ন স্কুলে (Boys/Girls) শারীরশিক্ষার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সার্ভে।

(i) খেলার মাঠ — আয়তন — সহযোগে আঁকা—

(ii) ফুটবল — ক্রিকেট — ভলিবল, কাবাডি, খো-খো ইত্যাদি

(iii) আন্ত-বিদ্যালয় (ব্লক/জেলা স্তরের) বিভিন্ন খেলায় বিদ্যালয়ের অবস্থান

(iv) মাধ্যমিক পরীক্ষায় – শারীরশিক্ষা ঐচ্ছিক হিসাবে নেওয়া ছাত্র বা ছাত্রীর সংখ্যা

১০.৪.৩ Performance :

(i) ব্লক বা জেলাভিত্তিক খেলায় অংশগ্রহণ (Event ভিত্তিক)

(ii) জেলা দলে প্রতিনিধিত্বকারী ছাত্র বা ছাত্রীর সংখ্যা

(iii) রাজ্য দলের প্রতিনিধিত্ব

(iv) জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় (স্কুল ভিত্তিক) অংশগ্রহণ ও Open merit-এ অংশগ্রহণ

(v) Medal & Awards

(vi) সরকারি সাহায্য পাওয়া ছাত্রের্ সংখ্যা – রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে।

পুস্তক সমূহ :

(i) Man and Movement : H.M. Barrow

(ii) Psychology – Applied to General Education and Physical Education : Sushil Chandra Gupta

(iii) Psychology and Physical Activity : B . J . (Crathy)

(iv) G . T . M . T : Hardyal Singh